ISSN 2229-7537

THE PRISM

A Peer-Reviewed Journal

Vol. 13 October, 2021

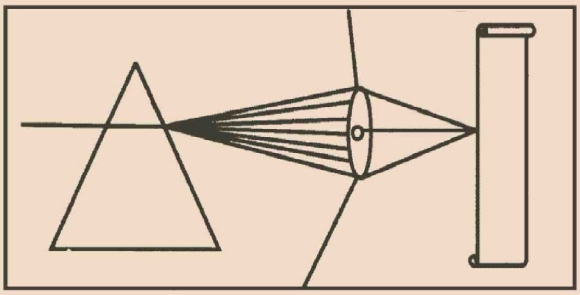

Annual Bilingual Journal

of

Mahatma Gandhi College

Lalpur, Purulia, West Bengal

THE PRISM

ISSN 2229-7537

A Peer-Reviewed Journal

Volume 13 October, 2021

Annual Bilingual (English & Bengali) Journal
of

Mahatma Gandhi College

Lalpur, Purulia

THE PRISM

Vol. 13, October, 2021

Journal of Mahatma Gandhi College
Lalpur, Daldali, Purulia- 723 130
West Bengal, India
Contact : + 91 94342 46198
E-mail : prismmgc@gmail.com

Editors

Sri Thakurdas Mahato Assistant Professor in Bengali
Smt. Soma Lohar Assistant Professor in English
Dr. Abhijit Ghosh Assistant Professor in Economics
Dr. Apurba Gorai Assistant Professor in Sanskrit
Dr. Kalyan Senapati Assistant Professor in Chemistry

Cover Design : Prof. Rahul Chakrabarti

Date of Publication : 2nd October 2021

Publisher : Teachers' Council
Mahatma Gandhi College, Lalpur, Purulia

Printed at : Kabitika, Midnapore. Mob : +91 98321 30048

Price : 250.00 $ 12

Editorial

On the eve of publication of the 13th Volume of our 'The Prism' the editorial board seeks the apportunity to thanks all concerned especially our Peer-reviewers for the onus they have born in reviewing the articles.

It is also the occasion to thank all subscriber from outside our institution who have entrusted us with the task of scattering their thought to wherever interests would coincide. We are really happy to find scholars waiting avidly for the publication of our journal and a flurry of articles pouring into the inbox of our e-mail id.

The proclamation of our journal *The Prism* (ISSN 2229-7537) being of a multi disciplinary and bilingual disposition suggest that an aversion to the homogeneity of theme and approach is innate in it. This is exactly what makes it potpowrri of academic endeavour. Predominantly our journal thrives on diversities rather than nuances.

We find it to be the right occasion to thank the college authority for its persistent support towards the college journal. We hope that we shall continue to have this patronage in future.

Thank you all
Members of Editorial Board

2nd October, 2021
Mahatma Gandhi College, Purulia

THE PRISM

Vol. 13, October, 2021

Our Contributors

Dr. Milan Kanti Satpathi	Associate Prof., Dept. of Bengali S.K.B. University, Purulia.
Dr. Dhrubajyoti Pal	Associate Prof., Dept of Bengali, S.K.B University, Purulia.
Dr. Ramsankar Pradhan	Assistant Prof., Dept. of Bengali, R.C. College, Loulara, Purulia.
Dr. Manas Kr. Das	Assistant Prof., Dept. of Education, M.G. College, Lalpur, Purulia.
Dr. Sumanta Mandal	Assistant Prof., Dept. of Bengali, Manbhum Mahavidyalay, Manbazr.
Dr. Sibani De	Associate Prof., Dept. of History, M.G. College, Lalpur, Purulia.
Sri Asit Ranjan Santra	Associate Prof., Dept. of Bengali, Raghunathpur College, Purulia.
Sri Thakurdas Mahato	Assistant Prof., Dept. of Bengali, M.G. College, Lalpur, Purulia.
Sri Dilip Kumar Goswami	Retired Teacher & Researcher.
Dr. Sangram Mahato	SACT- 1, Dept. of Bengali, Nistarini College, Purulia.
Dr. Kalyan Senapati	Assistant Prof., Dept. of Chemistry, M.G. College, Lalpur, Purulia.
Sri Sasikanta Majhi	Assistant Prof., Dept. of Political Science, M.G. College, Lalpur, Prulia.

Sri Bapi Mondal	Assistant Prof., Dept. of Philosophy, M.G. College, Lalpur, Purulia.
Dr. Partha Pratim Roy	Assistant Prof., Dept. of Economics, Raja Narendralal Khan Women's College, Midnapore.
Dr. Abhijit Ghosh	Assistant Prof., Dept. of Economics, M.G. College, Lalpur, Purulia.
Mozahid Ansary	SACT- 1, Dept. of Political Science, M.G. College, Lalpur, Purulia.
Ballari Mukherjee	Research Scholar, Dept. of Bengali, S.K.B. University, Purulia.
Sk. Musatafa Md.	
N.E. Hoque	Assistant Prof., Dept. of English, M.G. College, Lalpur, Purulia.
Sabina Khatua	SACT-1, Dept. of Bengali, M.G. College, Lalpur, Purulia.
Sri Shyamapada Mahato	Research Scholar, Dept. of Bengali, S.K.B. University, Purulia.
Mrs. Sumana Patra	Assistant Teacher, Kamala Vidyamandir Girls High School (H.S.), Beleghata, Kolkata.
Sri Buddhadeb Das	Assistant Prof., Dept. of Philosophy, Balarampur College, Purulia.
Subham Chatterjee	Research Scholar, Dept. of Bengali, S.K.B. University, Purulia.
Santwana Deoghoria	Research Scholar, Dept. of Bengali, S.K.B. University, Purulia.
Jagannath Dalal	Research Scholar, Dept. of History, S.K.B. University, Purulia.
Shyamal Mahato	Ex. Student, Dept. of Political Science, M.G. College, Lalpur, Purulia.

THE PRISM

ISSN 2229-7537

A Peer-Reviewed Journal

Volume 13 October, 2021

Contents

মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলন	দিলীপকুমার গোস্বামী	13
ঝুমুর গান ও প্রকৃতি : ব্যবহারে ও ভাবনায়	ঠাকুরদাস মাহাতো	31
জাওয়া-করম উৎসবে নারীর অবদান ও আত্মপরিচয়	সংগ্রাম মাহাত	48
পুরুলিয়ার টুসু পরব : একটি পর্যালোচনা	সাবিনা খাতুন	58
লোকশিল্পে 'Singing Bowls' (সাদা বাটি) প্রসঙ্গ বাঁকুড়া জেলা	সুমন্ত মন্ডল	63
তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে লোক-উপাদানের প্রায়োগিক বৈচিত্র্য	শ্যামাপদ মাহাত	71
সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও একটি নদীর মৃত্যু : প্রসঙ্গ তিতাস একটি নদীর নাম	সুমনা পাত্র	81
মনের মানুষের খোঁজে রবীন্দ্রবাউল	বুদ্ধদেব দাস	90
শামসুর রাহমানের কবি মানসের নিরিখে 'পান্থজন'	মিলনকান্তি সৎপথী	96
প্রেমাংশুর রক্ত চাই' কাব্যে কবি নির্মলেন্দু গুণের সমাজভাবনা	শুভম চ্যাটার্জী	106

লক্ষ্মণ দোসাদ : দলিতের মানবাধিকারের অঙ্গীকার	অসিতরঞ্জন সাঁতরা	121
বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটক	ধ্রুবজ্যোতি পাল	128
কালের দ্বন্দ্বে—চাঁদ সদাগর ও চাঁদ বণিক—একটি পাঠ প্রতিক্রিয়া	রামশঙ্কর প্রধান	145
প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্প : দেশভাগের আলেখ্যদর্শন	বল্লরী মুখার্জ্জী	152
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী' : প্রসঙ্গ ভাষা	সান্ত্বনা দেওঘরিয়া	160
ভারতের সংবিধানে নারীর অবস্থান	শ্যামল মাহাত মোজাহিদ আনসারী	168
ঔপনিবেশিক আমলে কার্জনের শিক্ষানীতি ও বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত : বাঙালী মানসে প্রতিক্রিয়া	ড. শিবানী দে	181
A Suitable Boy : A Class Study in Secularism	Sk Mustafa Md N Ehsanul Hoque	187
Role Of The Journal(Patham) In The Development Of Modern Santali Literature	Sasi Kanta Majhi	194
Cholera in Colonial Bankura : Experience in Nineteenth Century	Jagannath Dalal	199

IBX- A Versatile Oxidizing Agent in Multicomponent Reactions	Dr. Kalyan Senapati	213
Three Generations of Environmental Issues	Mozahid Ansary	219
Relevance Of Swami Vivekananda In Education	Dr. Manas Kumar Das	223
Sustainable Agriculture, Marketing Management & Education Context Of Indian Horticulture	Dr. Partha Pratim Roy	232
Pancha kanya in Indian literature: in the perspective of contemporary Indian society	Bapi Mondal	273
Towards Achieving Open Defecation Free Status in Bihar: Observations from the Field	Rajeev K. Kumar Abhijit Ghosh	280

মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলন

দিলীপকুমার গোস্বামী

ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে মানভূম-পুরুলিয়া ব্রাত্য হয়ে আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের আলোচনাতেও মানভূমের জন্য একটি পৃষ্ঠাও বরাদ্দ হয় না। সমস্ত আলোচনা এসে থেমে যায় মেদিনীপুরের সীমানায়। কখনও কখনও বাঁকুড়া পর্যন্ত আলোচনা হয়, কিন্তু পুরুলিয়া নৈব নৈব চ। অথচ মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপ্তি, বিস্তৃতি, গভীরতা ভারতবর্ষের যে কোন জেলার চেয়ে কম নয়। বরং বেশিই। ব্যাপ্তির কথায় প্রথমে আসি। মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলন বিংশশতাব্দীর প্রথম দশকে শুরু হয় নি— হয়েছে আরোও অনেক আগে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে, ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানী পেয়েছিল ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে। দেওয়ানী পেয়ে তাঁরা দু'বছর জরিপ করিয়েছিল সুবা-বাংলা অর্থাৎ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা। তারপর ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রত্যেকের কাছে তারা হাত পেতেছিল 'খাজনা দাও' বলে। কারণ দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তাঁরা 'দেওয়ানি অর্থাৎ খাজনা আদায়ের ক্ষমতা পেয়েছিল। সেই টাকার বহুগুণ বেশি তারা সুবা বাংলায় আদায় করবে তবেই তো কোম্পানির লাভ। আমরা শুনিনি, অন্তত পড়িনি কোথাও যে গঙ্গাবিধৌত সমভূমির কোথাও কোম্পানির খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নিদেনপক্ষে ক্ষোভ বিক্ষোভ হয়েছিল। অর্থাৎ সমতলবঙ্গ কোম্পানির খাজনা আদায়ের অধিকার মেনে নিয়েছিল। কিন্তু মানেনি মানভূম-ধলভূম-বরাভূম-পঞ্চকোট-কুইলাপাল-সুপুর-অম্বিকানগর সহ বিস্তৃত জঙ্গলপাহাড় বেষ্টিত দুর্গম ভূমিখন্ড। অর্থাৎ বাংলা বিহার উড়িষ্যা সীমান্তের ভূম-অঞ্চল গুলি। ১৭৬৭ থেকে ১৮৩২ দীর্ঘ ৬৬ বৎসর ধরে তারা সংগ্রাম করেছে নিজেদের স্বাধীনতা-স্বকীয়তা-আদিমতা বজায় রাখার জন্য। এই বিদ্রোহের নাম চুয়াড় বিদ্রোহ— প্রথম কৃষক বিদ্রোহ। সারা ভারতে এই বিদ্রোহের পূর্বে আর কোথাও কোন বিদ্রোহ হয়নি। আমরা একে স্বাধীনতা যুদ্ধই বলব। ইতিহাসের ছাত্রদের জন্য প্রশ্ন রাখা হয় 'প্রথম কোন শহীদের

ফাঁসি হয়েছিল ?' উত্তর সবাই জানেন। শুধু এটুকু খবর জানেন না ১৯১১ সালের বহু আগে পুরুলিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে, বেড়াদায় ফাঁসির মঞ্চে বহু মানুষ প্রাণ দিয়েছিলেন। সেইসব ফাঁসির মঞ্চগুলো এখন আবিষ্কৃত হয়েছে। স্বাধীনতার বার্তা কোন তারিখ, সন, ক্ষণ মেনে আসে না। স্বাধীনতা একটি বিশিষ্ট প্রবণতার চর্চা— মানভূম পুরুলিয়া ভূমিখণ্ডের মানুষ বাইরের কাউকেই কখনই খাজনা দেয়নি। নিজেদের জমিদার, যাদের তারা রাজা বলত তাদের সাথে বনের ফল, মূল, গাছ, উৎপাদিত চিনা ঘাস ভাগ করে নিত। ভাষা-সংস্কৃতি-উৎসব রাজা প্রজা একসাথে মিলে পালন করত। আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা বজায় ছিল সমাজে। তাই স্বাধীনচেতা মানুষগুলোর কাছে বাইরের কেউ খাজনা চাইতেই তারা ক্ষেপে ওঠে। তাদের 'অহং' বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এরজন্য রাজনৈতিক দল তৈরির দরকার হয় নি। প্রকৃতিতে যারা স্বাধীন তারাই স্বাধীনতা চায়। স্বাধীন প্রকৃতিই স্বাধীনতার লালন করে। এইভাবেই পঞ্চকোটের নিলামের বিরুদ্ধে পঞ্চকোটের প্রজারা বিদ্রোহ করেছিল। সেটা ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে। নির্দিষ্ট দিনে খাজনা দিতে না পারায় পঞ্চকোটের বেশ কিছু মৌজা নিলাম হয়ে যায়।[১] কলকাতার নীলাম্বর মিত্র, ভগবতীচরণ মিত্র, হরিশ্চন্দ্র, ভৈরব মিত্রের পিতৃদেব শ্যামসুন্দর মিত্র জমিদারীগুলি নিলামে কিনেছিলেন। পঞ্চকোটের প্রজারা ঘোষণা করেছিলেন 'পঞ্চকোট ছাড়া কাউকে খাজনা দেব না।'[২] সারা পঞ্চকোট জুড়ে যে বিদ্রোহ হল তা নিয়ন্ত্রণ করার সাধ্য কোম্পানির হয় নি। তারা নীলাম রদ করতে বাধ্য হয়। এ ঘটনা মানভূমে ঘটেছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত না নীলাম রদ হয়েছিল ততক্ষণ গ্রামের বিদ্রোহীরা এসে জনপদে/রাজধানীতে বিদ্রোহের ধ্বজা উঁচিয়ে অবস্থান করেছিলেন। এরই নাম স্বাধীনতার প্রতি আস্থা, বিশ্বাস। একথা লিখেছেন ইংরেজ ঐতিহাসিক ডালটন "In the year 1798 when the Pachet State was sold for Arrears of revenue they rose and violently disturbed The Peace of the Country till the Sale was cancelled."[৩] বিদ্রোহের প্রকৃতি দেখে পাঁচেট জেলার কালেক্টর রঘুনাথপুরে বসে সখেদে মন্তব্য করলেন 'The Whole district is on the brink of ruin.' পূর্ববর্ণিত ঘটনা গুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর— ১৭৬৭ থেকে ১৭৯৮ কোম্পানির শাসনের প্রথম ত্রিশ বছরের।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ১৮৩২ সালে চুয়াড় বিদ্রোহের চরম পরিণতিতে গোটা জঙ্গলমহল কেঁপে উঠল— গঙ্গানারায়ণের বিদ্রোহের কোম্পানির প্রশাসকদের হাড় হিম হয়ে গেল। বিদ্রোহের সমাপ্তি হল গঙ্গানারায়ণের মৃত্যুতে।[৪] কোম্পানির শাসকরা বিশ্বাস করতে পারেন নি গঙ্গানারায়ণের মৃত্যু হতে পারে। তাই তাঁরা বরাভূম রাজপরিবারের আত্মীয় স্বজন শতাধিক মানুষের সাক্ষ্য নিয়েছিলেন মৃতদেহ সনাক্ত করার জন্য। সিংহাসুর নামে কথিত গঙ্গানারায়ণের মৃত্যু হয়েছে একথা কোম্পানিরও বিশ্বাস করতে সময় লেগেছিল।

প্রকৃতপক্ষে গঙ্গানারায়ণের মত বীরের মৃত্যু হতে পারে একথা বরাভূমের বহু মানুষ আজও বিশ্বাস করেন না। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে এই প্রবন্ধের লেখক বরাবাজারের রাজবাটীতে ক্ষেত্রসমীক্ষায় গিয়ে একটি অত্যাশ্চর্য কাহিনি শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধের পাঠকদের নিকট সেই শোনা কাহিনির বিবরণ দিতে গিয়ে রোমাঞ্চ হচ্ছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু রহস্যের মতই এই কাহিনি। পাঠকদের কাছে কাহিনিটি তুলে দিলাম। বরাভূমের মানুষরা বিশ্বাস করতেন গঙ্গানারায়ণের মৃত্যু হয়নি— উনি সন্ন্যাসী হয়ে বরাভূম ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। বরাভূমের রাজপরিবারের কুলদেবতার সুসজ্জিত মন্দিরক্ষেত্রে, ১৯০৫ সালে— ১৮৩২-এর সেই ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের ৭৩ বৎসর পর, এক জটাজূটধারী সন্ন্যাসী, আজানুলম্বিত তাঁর হস্তযুগল, উন্নত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু, সৌম্য মূর্তি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখেছিলেন রাজ পরিবারের মন্দির ক্ষেত্রটি। প্রসাদ ভিক্ষা করেছিলেন; তৃপ্তি করে প্রসাদ খেয়েছিলেন, তারপর মহানিষ্ক্রমণের পথে উধাও হয়েছিলেন। বরাভূমবাসী ভীড় করেছিলেন তাঁকে দেখতে, সবাই বলেছিলেন ‘ইনিই সিংহাসুর’। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। তবু মনে হয় এমনটা যদি সত্যি হত।[৫]

১৮৩২ সালের ‘গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামার’ ফলশ্রুতিতে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে এতদ্ এলাকায় তৈরি হয়েছিল মানভূম জেলা।[৬]

এরপর ১৮৫৫-৫৭ সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটল মানভূম জেলা থেকে বহু দূরে দামিন-ই-কো তে। মানভূমে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়নি। শুধু জয়পুরের রাজবাড়ীতে তাঁরা হানা দিয়েছিলেন। রাজপুরোহিতকে খুন করেছিলেন।[৭]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর মানভূমের সাঁওতালদের বিক্ষোভ কত গভীর ছিল তা বোঝা গেল ১৮৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দে। মানভূমের সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ৫ই আগস্ট। রামগড় বেটেলিয়ানের ৬৪জন সেপাই ও ১২ জন শোওয়ার পুরুলিয়ায় কর্মে নিযুক্ত ছিল। তারা বিদ্রোহ করে। তাদের সাথে যোগ দেয় অসংখ্য সাঁওতাল। পুরুলিয়ার জেলে সেইসময় দুই থেকে তিনশজন কয়েদি ছিল। বিদ্রোহীরা জেল ভেঙে দেয়— কয়েদিরা জেল থেকে পালিয়ে যায়। ট্রেজারিতে এক লক্ষ টাকা লুঠ হয়। সরকারি ভবনের কাগজপত্র ভস্মীভূত হয়। নীলকুঠিডাঙ্গার ও তেলকলপাড়ার নীলকুঠি ভস্মীভূত হয়। পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংদেওয়ের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছিলেন কোম্পানির শাসকরা। রাজা সাহায্য দিতে অস্বীকার করেন। যুক্তি হিসাবে বলেন নিজের প্রাসাদ রক্ষা করাই তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ-অবস্থায় কোম্পানিকে সাহায্য করা যাবে না। বিদ্রোহের সময় পুরুলিয়ায় ১২ জন ইউরোপীয়ান অফিসার ছিলেন। তাঁরা সকলে থানায় আশ্রয় নেয়। রঘুনাথপুরের পথে রাণীগঞ্জ পালিয়ে যান তাঁরা। ৫ আগস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুরুলিয়া স্বাধীন

ছিল। ১১ সেপ্টেম্বর সামরিক অভিযান চালিয়ে পুনরায় কোম্পানির দখলে আসে পুরুলিয়া। নীলমণি সিংহদেওকে বন্দী করে আলিপুরে পাঠানো হয়— ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত তাঁকে অন্তরীণ করে রাখা হয়। বাংলাদেশের অনেকগুলি জেলাতেই সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল; কিন্তু একজন মাত্র রাজাকেই কোম্পানি বন্দী করেছিলেন, যদিও নীলমণি সিংদেওয়ের প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহে অংশ নেওয়ার কোন প্রমাণ নেই তবুও এক বছর দশমাস তাঁকে জেলে অন্তরীণ রাখার কারণ ছিল পার্শ্ববর্তী রাঁচীর জগন্নাথপুর, সিংভূমের পোড়াহাট, আরা-র জগদীশপুরের রাজারাও বিদ্রোহ জারি রেখেছিলেন, নীলমণি সিংহদেওকে মুক্তি দিলে তাঁরা উৎসাহিত হবেন। কোম্পানি শাসকরা এই ধারণা করেছিলেন। বাংলাদেশের বেশিরভাগ রাজা জমিদার বিদ্রোহের সময় কোম্পানিকে অর্থ, সৈন্য, হাতি, ঘোড়া, রসদ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। পঞ্চকোট-রাজ তা করেননি। সেজন্য বাংলাদেশের একজন মাত্র রাজাই বন্দী হয়েছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কিত আলোচনায় বাংলাদেশের ভূমিকা কম আলোচিত হয়, মানভূমের আলোচনা আরো কম হয়। ইদানীং কিছু গবেষক বাংলাদেশের সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কিত আলোচনার সূচনা করেছেন, তাঁরাও মানভূমের নীলমণি সিং দেওকেই একমাত্র রাজা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যিনি সিপাহী বিদ্রোহে কোম্পানি দ্বারা এক বছর দশ মাস বন্দী জীবন কাটিয়েছিলেন।[৯] কংগ্রেস পূর্ব যুগের স্বাধীনতা আন্দোলনে মানভূমের ভূমিকা আলোচিত হল। এরপর কংগ্রেস-যুগের সূচনা হবে।

আমরা জানিমানভূম জেলা ১৯১২ সালের ১ এপ্রিল বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতএব স্বাধীনতা আন্দোলনে মানভূমের ভূমিকা বিহার রাজ্যের সাথে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা হয়ে গেল।[১০] এই কারণেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে মানভূমের ভূমিকা আলোচনা কম হয়। যদিও বাংলাদেশের প্রান্তীয় এই জেলাটির সাথে বাংলাদেশের বিপ্লবীদের এবং কংগ্রেস-নেতাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

বিহার রাজ্য কংগ্রেস তৈরি হয় ১৯০৮ সালে। মানভূমে কংগ্রেসের কাজ শুরু হয় ১৯২১ সালে। বিহারের কংগ্রেস নেতা রাজেন্দ্রপ্রসাদ পুরুলিয়া কোর্টের উকিলদের সাথে আলোচনায় বসেন। একগুচ্ছ উকিল-মোক্তার ওকালতি ত্যাগ করে কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন অতুলচন্দ্র ঘোষ, কংগ্রেসের অস্থায়ী জেলা কমিটি তৈরি হয়— জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত পুরুলিয়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ ত্যাগ করেন। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হলেন নিবারণচন্দ্র; সম্পাদক হলেন অতুলচন্দ্র ঘোষ। এসময় সর্বভারতীয় কংগ্রেস রাজনীতিতে গান্ধীজির আবির্ভাব ঘটল। অসহযোগ আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। ১৯২১ সালের ১৭ নভেম্বর

ইংল্যান্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌ ভারতবর্ষে এলেন। ১৭ নভেম্বর পুরুলিয়ায় ধর্মঘট হল। ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর যুবরাজ পাটনায় এলে সারা বিহারের সাথে মানভূমে ধর্মঘট হল। পুলিশ পুরুলিয়ায় ধর্মঘট নিষিদ্ধ করলেন। পিকেটিং করাও বন্ধ করলেন। ১৯২২ সালের ৪ জানুয়ারি থেকে ৭ জানুয়ারি ১৪জন স্বেচ্ছাসেবক কারারুদ্ধ হলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের অগ্নিক্ষরা দিনে অনেকেই স্ব স্ব বৃত্তি ত্যাগ করে জাতীয় কংগ্রেসের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এর মধ্যে দুজন ব্যক্তিত্ব শুধু নিজ বৃত্তি নয়, সংসার ত্যাগ করে সপরিবারে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। এঁদের একজন অতুলচন্দ্র ঘোষ, অন্যজন নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত। দুটি পরিবারের মিলনে তৈরি হল শিল্পাশ্রম। ঐ আশ্রমই ছিল মানভূম কংগ্রেসের আঁতুড়ঘর। মানভূমের রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে ওখান থেকেই।

১৯২৫ সালের ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর বিহার রাজ্য কংগ্রেসের ষোড়শ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল পুরুলিয়া শহরে। সভাপতিত্ব করলেন গয়ার ব্যারিষ্টার মৌলবী শাহ মহম্মদ, জুবেদার, উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান প্রধান নেতৃত্ব— মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সতীশ দাশগুপ্ত, ক্ষিতিশ চন্দ্র বসু, মথুরা প্রসাদ, কৃষ্ণবল্লভ সহায়, দীপনারায়ণ সিংহ। সম্মেলন উপলক্ষে একটি প্রদর্শনী হয়েছিল তৎকালীন জেল গ্রাউন্ডে। সম্মেলন স্থল ছিল জেলা স্কুলের পেছনে শরৎ সেন কম্পাউন্ডে। এই উপলক্ষে গান্ধীজি সাতদিন পুরুলিয়ায় ছিলেন। গান্ধীজি পুরুলিয়ায় এসে উঠেছিলেন প্রয়াত চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ি 'The Retreat'-এ— বর্তমান নিস্তারিণী কলেজের অফিস ঘরটিই হল সেই বাড়ি।

উল্লেখ্য রাজ্য সম্মেলনের সাথে মানভূম জেলা সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিহার রাজ্য সংগ্রেসের অধিবেশন মানভূমের রাজনৈতিক জীবনে গভীর প্রভাব রেখে গেল। এরই প্রভাবে ১৯২৫ সালের ২১ ডিসেম্বর নিবারণচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল মানভূম কংগ্রেসের মুখপত্র 'মুক্তি' পত্রিকা। জেলার রাজনীতির ইতিহাসে মুক্তির প্রভাব অবিস্মরণীয়।

১৯২৫ সালের পরবর্তীকালে প্রতিবৎসর মানভূম কংগ্রেসের অধিবেশন বসত নিয়ম করে— নেতৃত্ব নির্বাচিত হতেন। প্রতিবৎসর রাজ্য কংগ্রেস এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে মানভূম কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা যোগদান করতেন।

১৯২৭ সালে মানভূমে সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল। ১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সাইমন কমিশনের সদস্যগণ বোম্বাই বন্দরে এসে নামলেন। সেদিন সারা ভারতের সাথে মানভূমের ঝরিয়া, পুরুলিয়া, চান্ডিল, ধানবাদ, মানবাজার, রঘুনাথপুর, ঝালদা, তোপচাঁচি, বরাবাজার প্রভৃতি স্থানে সফল ধর্মঘট হল।[১১]

ইতিমধ্যে জেলা নেতৃত্ব কংগ্রেসের সংগঠন গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করলেন। থানায় থানায় কংগ্রেস কমিটিগুলি গড়ে উঠল— বহু স্বেচ্ছাসেবক— কর্মীবাহিনী কংগ্রেসের পতাকাতলে এসে সংগঠনকে শক্তিশালী করলেন। অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে রঘুনাথপুরে কংগ্রেস অফিস খোলা হল। ঝরিয়া, ধানবাদ, তোপচাচি, বরাভূম, চান্ডিল, ঝালদা, আদ্রায় কংগ্রেস কমিটিগুলি গড়ে উঠল।

১৯২৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে তে ধর্মঘট হল। মানভূমের স্টেশনগুলিতে এই ধর্মঘট প্রবল হয়ে উঠল। শালিমার রেল ইয়ার্ড, সাঁতরাগাছি, মেচেদা, আদ্রা, ভাগা, টাটানগর, চক্রধরপুর, ভজুড়ি, বিলাসপুর, নাগপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় ধর্মঘট হল। বি.এন.আর শ্রমিক সংঘের সভাপতি ভি.ভি.গিরি, এবং মুকুন্দলাল সরকার আদ্রায় এসে শ্রমিকদের প্রতি সংহতি জানান। ২৫ ফেব্রুয়ারি পুরুলিয়া চকবাজারে শ্রমিকদের জন্য চাঁদা তোলা হয় এবং একটি মহতী সভায় ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রতি সহমর্মিতা জানান হয়। মানভূম জেলায় ছিল দুটি মহকুমা— পুরুলিয়া সদর ও গোবিন্দপুর মহকুমা। পরবর্তীকালে গোবিন্দপুর মহকুমা ধানবাদে উঠে যায়। নামকরণ হয় ধানবাদ মহকুমা। পুরুলিয়া সদর মহকুমা ছিল কৃষিপ্রধান— ধানবাদ মহকুমায় ছিল প্রচুর কয়লাখনি। স্বাভাবিকভাবেই ধানবাদ এলাকায় শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠার সমস্ত উপাদান মজুত ছিল। ১৯২০ সালের ২১শে ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে AITUC নামে সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠন গড়েউঠেছিল। এর পরের বৎসরই ১৯২১ সালে মানভূমের ঝরিয়া শহরে AITUC-র ২য় সম্মেলন হয়। লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে ঝরিয়ার ঐ সম্মেলনে যে শ্রমিক সমাবেশ হয় তাতে প্রশাসন ও সরকারিস্তরে হাড়কাঁপ ধরে গেছিল। মালিকপক্ষ দিল্লির বড়লাটের কাছে দরবার করে বলেছিলেন এ ধরনের শ্রমিক সম্মেলন করার অনুমতি যেন আর না দেওয়া হয়। তবুও ১৯২৮ সালে AITUC-র নবম বার্ষিক সম্মেলন পুনরায় ঝরিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দেশবিদেশের বহু শ্রমিক নেতার সাথে জহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, প্রমুখ নেতৃত্ব ঐ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। প্রভাত চন্দ্র বসু ছিলেন ধানবাদ এলাকার শ্রমিক নেতা। জেলা কংগ্রেসেরও তিনি অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন।

১৯২৮ সালে ৬ ও ৭ মার্চ সাঁতুড়ি থানার রামচন্দ্রপুরে অনুষ্ঠিত হল মানভূম জেলা প্রথম রাজনৈতিক সম্মেলন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। দুদিনের এই সম্মেলনে হাজার হাজার মানুষ হাজির হয়েছিলেন। বাংলাদেশ ও বিহারের বহু নেতা ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। রামচন্দ্রপুর সম্মেলনের পর ১৯২৯ সালে ঝালদায়, ১৯৩০ সালে ধানবাদে, ১৯৩১ সালে হুটমুড়ায়, ১৯৩৬ সালে ঝরিয়ায়, ১৯৩৭ সালে ভূতাম গ্রামে যথাক্রমে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও

ষষ্ঠ রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় ঝালদার কংগ্রেসের যুবকর্মী সত্যকিংকর দত্তের হত্যাজনিত পরিস্থিতিতে সারা মানভূম, সারা বিহারে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সত্যকিংকর দত্ত ছিলেন তরুণ কংগ্রেসকর্মী। ছাত্রজীবন শেষ করে তিনি যুবদের নিয়ে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, ব্যায়াম, কুস্তি প্রভৃতি শরীরচর্চার আখড়া করেছিলেন। বয়কট, পিকেটিং, খাজনা বন্ধ প্রভৃতি কর্মসূচিতে ঝালদা সর্বদাই কর্মচঞ্চল থাকত। ঝালদার কংগ্রেস সংগঠনটি ছিল খুবই শক্তিশালী। শিবশরণলাল জয়সোয়াল, মোহনদাস সাধু, সেবাদাস ডোম, কালিপদ হালদার প্রেমচাঁদ মোদক, সত্যকিংকর দত্ত প্রমুখ ছিলেন ঝালদার নেতৃত্ব। সত্যকিংকর এদের মধ্যে তরুণতম কর্মী ছিলেন। ১০ ডিসেম্বর ১৯২৯ ঝালদা হাটের পাশে রাঁচী রোডের উপর একজন সত্যকিংকরকে বিষ মাখানো কুঠার দিয়ে পায়ে চোট দেয়। প্রথমে ঝালদা পরে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। ১৩ ডিসেম্বর সত্যকিংকর প্রয়াত হন। প্রথমে পুরুলিয়া চকবাজার পরে ঝালদায় শবদেহ নিয়ে শোকমিছিল হয়। সহস্র সহস্র মানুষ সেই শোকমিছিল নিয়ে ৪ ঘন্টা ধরে ঝালদা সহর প্রদক্ষিণ করেন। আর্মেনিয়ান সাহেবরাও স্ত্রীপুত্র নিয়ে টুপি খুলে মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন। গভীর রাত্রে গুর্জর নদীর তীরে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

৩রা জানুয়ারি ঝালদায় অনুষ্ঠিত হয় স্মৃতিসভা। ৫/৬ হাজার মানুষ সভায় উপস্থিত হন। সিদ্ধান্ত হয় প্রতি বৎসর ১লা মাঘ (১৫ জানুয়ারি) সত্যমেলা বসবে গুর্জর নদীর তীরে। সেই মোতাবেক ১৫ জানুয়ারি ১৯৩০ তিনদিনব্যাপী মেলার উদ্বোধন হয়— ৪০ হাজার মানুষের সমাবেশ হয়।

১৫ জানুয়ারি ১৯৩১ সত্যমেলার প্রথমবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঘটে গেল চূড়ান্ত বিপর্যয়। সরকার মেলা প্রাঙ্গণে ১৪৪ ধারা জারি করলেন। ত্রিশজন পুলিশসহ মহকুমা অফিসার, পুলিশসুপার, গোর্খা সিপাই মজুত ছিল। ঢোলধামসা নিয়ে নাচ করতে করতে মানুষ সমাবেশে আসছিল, গোর্খা সিপাইরা বাজনা থামাতে বলায় একজন গ্রামবাসী তাদের একজনের গালে চড় বসিয়ে দেয়। গুলি বর্ষণ শুরু হয। পাঁচজন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়। আহতের সংখ্যা হয় বহু। শহীদরা হলেন শীতল মাহাত, গণেশ মাহাত, গোকুল মাহাত, মোহন মাহাত, সহদেব মাহাত। ১৯২৯ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৯৩১ সালের ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ঝালদার স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্ত শুধু মানভূম জেলা নয়, ছোটনাগপুর সহ সমস্ত বিহারে গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

ঝালদার ঘটনার মত পুলিশী নির্যাতনের আরেকটি ঘটনায় সারা জেলায় এসময় আলোড়ন সৃষ্টি হল। রামচন্দ্রপুর গ্রামের আর্যআশ্রম'টি ছিল জেলার অন্যতম প্রধান কর্মকেন্দ্র।

অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ছিলেন ঐ কেন্দ্রের প্রধান নেতা। জেলা কংগ্রেসেরও একজন স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন তিনি। ব্রিটিশ রাজশক্তির চক্ষুশূল ছিলেন তিনি। ইতিমধ্যে তাঁর 'তরুণশক্তি' নামক পত্রিকার কেসে অন্নদাপ্রসাদ একবৎসর জেল খেটে এসেছেন। ১৯৩০ সালের বয়কট আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ, খাদির প্রচার, চরকার প্রচার, লোকমান্য তিলকের স্মৃতিসভা, মাদকবর্জন কর্মসূচীতে মদভাটিতে পিকেটিং, খাজনা বয়কট প্রভৃতি কর্মসূচীতে রামচন্দ্রপুর সর্বদা সরগরম থাকত। ১৯২৮ সালে রামচন্দ্রপুরে অনুষ্ঠিত জেলার প্রথম রাজনৈতিক সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। এ সব কারণে জেলা প্রশাসন অন্নদাপ্রসাদের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। নতুন পুলিশ সুপার চার্চার এবং জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট টেলারের নেতৃত্বে একদল অশ্বারোহী পাঠান সেনা ১৪ আগস্ট ১৯৩০, ভোরে রামচন্দ্রপুর আশ্রম তছনছ করে, অন্নদাপ্রসাদকে হান্টার দিয়ে মারতে থাকে, আঙুলে আলপিন ফুটিয়ে, মাথায়, পিঠে, বগলে সাঙিনের খোঁচা দিয়ে আঘাত করতে থাকে। যশপুর গ্রামে এসে মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ি খানাতল্লাসী করা হয়। অন্নদাপ্রসাদকে বলা হয় 'আর কখনও রাজনীতি করব না' একথা লিখে দিতে। অন্নদাপ্রসাদ তা অস্বীকার করেন। চার্চার লাথি দিয়ে মেরে অন্নদাপ্রসাদকে মাটিতে ফেলে দিলেন। টেলার বুট পরে অন্নদাপ্রসাদের বুকের উপর নাচতে লাগলেন। মুখ দিয়ে রক্তবমি হতে থাকল। অন্নদাপ্রসাদকে দড়িতে বেঁধে দড়ির অন্যপ্রান্ত ঘোড়ার লেজের সাথে বেঁধে ঘোড়া ছুটিয়ে দেওয়া হল। অন্নদাপ্রসাদ মাটিতে লুটাতে লুটাতে ঘোড়ার দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। এসময় সাঁওতালরা টেলারকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল। টেলারের ঘোড়ার পায়ে তীর লাগল। টেলারের ঘোড়া অন্নদাপ্রসাদকে নিয়ে একটি পুকুরে নেমে পড়ল। অন্নদাপ্রসাদকে ফেলে পুলিশবাহিনী পালিয়ে গেল। সাঁওতালরা ধরাধরি করে অন্নদাপ্রসাদকে যশপুরে মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়িতে নিয়ে গেল। পুলিশের ভয়ে মুরাড়ি গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক অন্নদাপ্রসাদকে দেখতে এলেন না। শরীরে ৫০টি হান্টারের দাগ। গায়ে অসংখ্য কাঁটা। চিমটা দিয়ে কাঁটা তোলা হল। সাঁওতালরা বহড়া ছালের ক্বাথ সিদ্ধ করে খাওয়াতে লাগলেন। সারা গায়ে গাঁদা পাতার রস মাখাতে লাগলেন। তিনদিন অজ্ঞান অবস্থায় থাকলেন অন্নদাপ্রসাদ। এ অবস্থায় তাঁকে হাজারিবাগ নিয়ে যাওয়া হয়। একমাস হাজারিবাগে থেকে তিনি সুস্থ হন।

১৯২৭ সালে কংগ্রেসের গৌহাটি সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় কংগ্রেস সমস্ত সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্বাচনে অংশ নেবে। প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরুলিয়া পৌরসভার প্রথম বেসরকারি চেয়ারম্যান হলেন জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়। ভাইস চেয়ারম্যান হলেন জীমূতবাহন সেন। লোকাল বোর্ডও কংগ্রেস দখল করল— বেড়োর জগন্নাথ আচার্য গোস্বামী হলেন চেয়ারম্যান, ভাইসচেয়ারম্যান হলেন শ্রীবাস চট্টরাজ।

১৯২৭ সালে মোহনদাস গান্ধী ঝরিয়া, ধানবাদ ভ্রমণ করেন— দেশবন্ধু ভান্ডারে অর্থ সংগ্রহ করার জন্য তাঁর এই ভ্রমণ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের শেষাংশে পুরুলিয়া, হুটমুড়া, গোলকুন্ডা, ঝরিয়া ভ্রমণ করলেন। পুরুলিয়ায় তিনি সমবায় সমিতির বাৎসরিক সভায় ভাষণ দেন। ঝরিয়ায় তিনি বিহার-উড়িষ্যা শিক্ষক সংগঠনের উদ্বোধন করেন।

১৯২৯ সালে মানভূমের দুটি পত্রিকা মুক্তি ও তরুণশক্তি-র বিরুদ্ধে সরকার দেশদ্রোহিতার মামলা রজু করেন। 'মুক্তি'তে প্রকাশিত 'বিপ্লব' নামক সম্পাদকীয় ও 'তরুণশক্তি'তে প্রকাশিত 'পরাধীনতার অভিশাপ' নামক প্রবন্ধ লেখার জন্য কেস রজু হল। দুটি পত্রিকার সম্পাদক নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত ও অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী'র একবৎসর জেল হয়। সাথে মুদ্রাকর নীলকণ্ঠ বিশ্বাস, কুমুদবিকাশ রায়, সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগীও তিন মাস কারাগারে বন্দী হন। দুটি পত্রিকার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তের জন্য জেল ও জরিমানা হওয়ায় প্রমাণিত হল মানভূম জেলা পথে নেমে শুধু আন্দোলনই করত না, রক্তাক্ষরে বিপ্লবের বাণী প্রচার করে ব্রিটিশের চোখের ঘুমও কেড়ে নিয়েছিল।

১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাস জুড়ে রঘুনাথপুর থানার চেলিয়ামার দক্ষিণ-পশ্চিমে দামোদর নদী তীরের করগালি গ্রামে কংগ্রেসের একটি শিক্ষাশিবির চলছিল। জেলা বোর্ডের ইন্সপেকসন বাংলোটিও ৯০ জন কর্মী নিয়ে এই শিবির পরিচালনা করছিলেন নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, অতুলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশ ব্যানার্জী, বীররাঘব আচারিয়া ও কলকাতা থেকে আগত আত্মগোপনকারী নেতা কালিবাবু। এসময় লন্ডনে ২য় গোলটেবিল বৈঠক চলছিল। শাসকশ্রেণির দমনপীড়ণ কমার কোন সম্ভাবনা নেই দেখে গোলটেবিল বৈঠক প্রায় ভেস্তে যাওয়ার অবস্থা হল। সারা দেশে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। বিহার রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাজ্য কমিটির বৈঠক ডাকলেন। নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন বিহার রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি, অতুলচন্দ্র ঘোষ ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। তাঁরা করগালি থেকেই পাটনার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন। এর দুদিন পরই জেলা বোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান জীমূতবাহন সেন সন্ধ্যায় করগালি এসে জানালেন আজ রাত্রেই পুলিশ করগালি শিবিরে হানা দেবে। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। গান্ধীজি ও সর্দার প্যাটেলকে বন্দী করা হয়েছে। গান্ধীজি আইন অমান্যের ডাক দিয়েছেন। কংগ্রেস কর্মীরা হাঁটায় এবং আত্মগোপনে দক্ষ ছিলেন। গ্রামবাসীদের ঘরগুলি ছিল আত্মীয়ের মত— 'ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়'। চোখের নিমেষে শিবির ফাঁকা হয়ে গেল। গরুরগাড়ির গাড়োয়ান সেজে পুরুলিয়া নামোপাড়ায় রামচন্দ্র অধিকারী ভোরেই পুরুলিয়া পৌঁছে গেলেন। শোনা যায় পরদিনভোরে পুলিশ এসে শিবির থেকে কয়েকটি ঘুঁটে ও কিছু পাঁশ পেয়েছিলেন।

১৯২১ সাল থেকে ১৯৩১ সাল— মানভূম কংগ্রেসের একদশক পূর্ণ হল। পরের দশক হয়ে উঠল আরো আকর্ষণীয়— আইন অমান্য, লবণ আইন ভাঙা সহ বৃহত্তর আন্দোলনে জেলার রাজনৈতিক বাতাবরণ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ১৯৩০ সালে গান্ধীজি সরবমতী আশ্রম থেকে হেঁটে ডান্ডি সমুদ্রোপকূলে গিয়ে লবণ তৈরি করে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। মানভূমের ১৩জন কর্মী কাঁথি গিয়ে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। ২৪ পরগনার মহিযাদলে গিয়ে লবণ আইন ভঙ্গ করেন নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, কংগ্রেস পার্টির মূল কর্মকেন্দ্র ছিল শিল্পাশ্রম। তেলকলপাড়ায় অবস্থিত এই কেন্দ্রটি থেকে জেলা কংগ্রেসের সমস্ত কাজ পরিচালিত হত। সারা জেলায় এমনি অনেক আশ্রমে কংগ্রেসকর্মীরা থাকতেন। রামচন্দ্রপুর আশ্রম, রাজনোয়াগড় আনন্দ আশ্রম, একঞ্জা ফণীন্দ্রমোহন দত্তের আশ্রম, জাহানাবাদের অতুলাশ্রম, মাঝিহিড়া আশ্রম, ভূতাম আশ্রম প্রভৃতি কর্মকেন্দ্রগুলি ছিল জেলা কংগ্রেসের প্রধান প্রধান কর্মস্থল।

১৯৩২ সালের সূচনাতেই আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন ভাঙার জন্য দমনপীড়ণ শুরু করলেন। কংগ্রেসের সমস্ত আশ্রমগুলি বাজেয়াপ্ত হল। বহু মহিলা আশ্রমগুলিতে থাকতেন। পুলিশকে প্রশ্ন করা হল 'আমরা যাব কোথায় ?' সমস্ত আশ্রমের দখল নিল পুলিশ। ৪ জানুয়ারি ১৯৩২ মানভূমের প্রথমসারির নেতারা আইন অমান্য করলেন। নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, অতুলচন্দ্র ঘোষ, স্বামী শঙ্করানন্দ, শশধর গঙ্গোপাধ্যায় সেদিন জেলে বন্দী হলেন। রামচন্দ্রপুর আশ্রম বাজেয়াপ্ত হল। আশ্রম থেকে দু ট্রাক জিনিস নিয়ে এল পুলিশ। অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তীকে এ্যারেস্ট করে মুরাডি স্টেশনের উত্তরে অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে একটি কুটিরে অন্তরীণ করে রাখা হল। রঘুনাথপুরে ফণীন্দ্রনাথ দত্ত, নান্টু সরকার, রাধানাথ পাটার, ফণীন্দ্রনাথ শেখরবাবু, বীররাঘব আচারিয়া এ্যারেস্ট হলেন। ফণীন্দ্রনাথ দত্তের জেল হল ২ বছর দশ মাস, তবে ২ বছর ৩ দিন জেলে বন্দী থেকে তিনি ছাড়া পান। সরকার ১৪৪ ধার জারি করলেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেই আন্দোলন চলতে লাগল। হুটমূড়া, চাষ, বরাবাজার, রাজনোয়াগড়, কেন্দা, পুরুলিয়া, মানবাজার, পুঞ্চা, বোরো— সর্বত্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। শতাধিক নেতা বন্দী হলেন। রাজনোয়াগড়ের হাটে ভাষণদানকালে পুলিশ বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত সহ ১৬ জনকে বন্দী করে পুরুলিয়া নিয়ে আসে। বিভূতিবাবু বন্দী হওয়ায় জেলের বাইরে কোন নেতৃত্ব থাকলেন না। কর্মীরা নেতৃত্বহীন হয়ে পড়লেন। আন্দোলন ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ল। ১৯৩৪ সালে উত্তর বিহারেরর ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হল। সরকার সমস্ত নেতাদের জেল থেকে মুক্তি দিলেন জানুয়ারি মাসে। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ঋষি নিবারণচন্দ্র যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৩৫ সালে ১৭ জুলাই , বাংলার ১ শ্রাবণ প্রয়াত হলেন। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি

হলেন অতুলচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক হলেন বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত।

১৯৩৭ সালে বিহারে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯৩৭ সালের বিহার বিধানসভায় মানভূম জেলা থেকে তিনজন বিধায়ক জয়ী হন। বিহারের কংগ্রেস সরকার বহু ভাল কাজ করেছিলেন। খাজনা কমিয়ে দেওয়া, অস্পৃশ্যতা নিবারণ, শিক্ষা, পরিচ্ছন্নতা, হরিজনদের অবস্থার উন্নতি, মাদক বর্জন প্রভৃতি। তবে কংগ্রেস সরকারের ত্রুটিও ছিল অনেক। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বহু কাজ করা যায় নি। ডোমিসাইল সার্টিফিকেট চালু করে রাজ্যে কতদিন পূর্ব থেকে বসবাস করছেন তা দেখতে চাওয়া বাঙালিদের কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছিল।

১৯৩৬ সালে উড়িষ্যা রাজ্য তৈরি হল। তখন বিহারের নেতারা বুঝলেন একসময় মানভূমও বিহার থেকে আলাদা হয়ে যাবে, তৈরি হল 'মানভূম বিহারী সমিতি'। সভাপতি হলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

অহিন্দী ভাষীদের উপর হিন্দী চাপানোর প্রবণতা দেখা গেল। মানভূমে তৈরি হল পাল্টা সংগঠন। মানভূম বাঙালি সমিতির অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী এই সংগঠনের নেতা ছিলেন। কংগ্রেস-এর বিরোধী ছিল।

এসময় ১৯৩৮ সালে রঘুনাথপুরের পণ্ডিতবাগানে হল মানভূম জেলা সপ্তম রাজনৈতিক সম্মেলন। ড: প্রফুল্ল ঘোষের সভাপতিত্বে এই সম্মেলন গোষ্ঠীতন্ত্রের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল। সরকারের ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখলেন অন্নদাপ্রসাদ। হিন্দী ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধেও প্রস্তাব এল। মানভূমকে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে প্রস্তাব আনার বিরুদ্ধে ছিলেন ড: প্রফুল্ল ঘোষ। এ প্রস্তাব সম্মেলনে আনতে দেওয়া হল না। ১৯৩৭ সালে অন্নদাপ্রসাদের সম্পাদনায় 'সংগঠন' নামক পত্রিকা প্রকাশিত হল। ঐ পত্রিকায় রঘুনাথপুর সম্মেলনের খবর বিস্তৃতভাবে ছাপা হল। এতে জেলা কংগ্রেস নেতারা ক্ষুব্ধ হলেন।

এসময় সর্বভারতীয় কংগ্রেস পার্টিতেও সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে দেখা গেল। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এলেন— ফরোয়ার্ড ব্লক তৈরি করলে ১৯৩৯ সালের ৯ ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র শেষবারের মত পুরুলিয়া এলেন ফরোয়ার্ড ব্লকের সংগঠন ও রামগড় সম্মেলনকে সফল করার জন্য প্রচারের কাজে। সেসময় তিনি আনাড়া, রঘুনাথপুর, পলাশকোলা, কাশীপুর, লক্ষ্মণপুর, লধুড়কা, হুটমুড়া সহ জয়পুর, ঝালদা, তুলিন, পুরুলিয়া ভ্রমণ করেন। ফরোয়ার্ড ব্লক পার্টির সভাপতি ও সম্পাদক হন সন্তোষ মিত্র ও মিহির চট্টরাজ। অন্নদাপ্রসাদ সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে সারা জেলা ঘুরলেন। রামগড়ে জাতীয় কংগ্রেস সম্মেলন করলেন। ১৯৪০ সালের ১৯, ২০, ২১ মার্চ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন

চলছে। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ড যখন ব্যতিব্যস্ত তখন দেশে গণ আন্দোলনে ব্রিটিশদের নাস্তানাবুদ করবেন। গান্ধীজি তা চাইছিলেন না। তিনি বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ডকে সহযোগিতা করতে চাইছিলেন। ব্রিটিশের সাথে কংগ্রেসের আপোষ হোক এটা দেশের জনগণও চাইছিলেন না। তাই সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন কংগ্রেস যেখানেই সম্মেলন করবে সেইখানেই তিনিও 'আপোষবিরোধী' সম্মেলন করবেন। মানভূমের পাশেই রামগড়। সেখানে দু পক্ষের সমাবেশ হল। কংগ্রেসের সমাবেশ জলে-ঝড়ে-দুর্যোগে পণ্ড হয়ে গেল। নেতারা হাজারিবাগ পালিয়ে গেলেন। বিকালে সুভাষচন্দ্রের 'আপোষবিরোধী' সমাবেশের সময় আকাশে মেঘ ছিন্ন করে সূর্যের উদয় হল। সমাবেশ সফল হল। মানভূম জেলার ভূমিকা এই সম্মেলনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্যানিটেশন ও জল সরবরাহের দায়িত্ব ছিল পুরুলিয়ার স্বেচ্ছাসেবকদের। তাঁরা সে দায়িত্ব সফলতার সাথে প্রতিপালন করেছিলেন। পুরুলিয়ার একটি বইয়ের দোকান 'ছাত্রভাণ্ডার' সম্মেলনে চায়ের স্টল দিয়েছিলেন। দোকানের মালিক রাধাবিনোদ সরকার সমাজকর্মী ছিলেন। ওখান থেকেই সুভাষচন্দ্রের জন্য চা যেত। দোকানের একটি ছেলে 'চা' নিয়ে সুভাষচন্দ্রের ক্যাম্পে গেছে। সুভাষচন্দ্র চায়ের কাপটি রেখে কাজে মন দিলেন। ছেলেটি দাঁড়িয়েই আছে দেখে সুভাষচন্দ্র তাকে জিজ্ঞাসা করলেন— 'তুমি কি কিছু বলবে ?' ছেলেটি বলল 'তোমার এঁটো কাপ আমি ছোঁব না। ওটা ধুয়ে দাও'। সুভাষচন্দ্র উঠে সেই কাপ ধুয়ে দিয়েছিলেন।

ব্রিটিশসিংহ যাঁর ভয়ে তটস্থ থাকত সেই সুভাষচন্দ্রকে মানভূমের একটি ছেলে কাপ ধুতে বাধ্য করেছিল— সুভাষচন্দ্র কিন্তু ঐ ছেলেটির প্রতি অসন্তুষ্ট হননি। বরং তার সাহসিকতার প্রশংসাই করেছিলেন।

রামগড় কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হয় সারা দেশ জুড়ে সত্যাগ্রহ করার। কংগ্রেস কমিটি গুলিকে সত্যাগ্রহ কমিটিতে রূপান্তরিত করার আহ্বান জানানো হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস হিসাবে ১৩ এপ্রিল পালন করার সিদ্ধান্ত হয়। সেই মোতাবেক মানভূমের কোনায় কোনায় সত্যাগ্রহ ছড়িয়ে পড়ল। পুরুলিয়া, পটমদা, চাষ, কাতরাস, রঘুনাথপুর, ঝরিয়া, চান্ডিল, কেন্দুয়াড়ি, তোপচাঁচি, বরাবাজার, সর্বত্র সত্যাগ্রহে উত্তাল হল। কারাগারগুলি কংগ্রেসের নেতা কর্মীতে ভর্তি হয়ে গেল। পুরুষদের সাথে তিনজন মহিলা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, ভাবিনী মাহাত, মোহিনী দেবী ও যথাক্রমে ভুতাম, মাঝিহিড়া, ও পুনুড়া গ্রামে যুদ্ধ বিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে অগ্রহসর হন। পুলিশ তৎক্ষণাৎ তাঁদের কারাগারে নিয়ে যায়। কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ছিল নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য অথবা আইনসভার সদস্য ছাড়া কোন মহিলা সত্যাগ্রহ করবেন না। গান্ধীজির বিশেষ অনুমতি নিয়ে মানভূমের তিনজন মহিলা ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে অংশ নিয়েছিলেন।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি সিদ্ধান্ত নেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি অতুল চন্দ্র ঘোষ ও সম্পাদক বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত একবৎসর কারাগারে আবদ্ধ থাকবেন সেজন্য ঐ সময় কালে সভাপতি ও সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন ঝরিয়ার কংগ্রেস নেতা প্রভাতচন্দ্র বসু ও পূর্ণেন্দু মুখার্জী।

১৯৪০-৪১ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ সমাপ্ত হলে সমস্ত অধৃত সত্যাগ্রহীদের নিয়ে সাঁতুড়ি থানার গড়সিকা গ্রামে দুদিনের একটি সম্মেলন হয়। বান্দোয়ান, বরাবাজার, মানবাজার এই তিনটি থানায় সত্যাগ্রহীর সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। তাঁদের সাথে পুঞ্চা, হুড়া, পুরুলিয়া সত্যাগ্রহীরাও পদব্রজে ধ্বনি দিতে দিতে গড়শিকা সম্মেলনে হাজির হয়। অরুণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র ব্যানার্জী, অতুলচন্দ্র ঘোষ, সাগরচন্দ্র মাহাত, বীররাঘব আচারিয়া প্রমুখ নেতৃত্ব সত্যাগ্রহীদের সামনে কংগ্রেসের তৎকালীন নীতি ও তাঁদের ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এক পয়সার কর্মতালিকা নিয়ে জনমত তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। প্রতি পরিবারের একজনকে সই করাবার জন্য একটি ছাপানো তালিকা দেওয়া হয় তাতে ৬৪টি ঘর ছিল— ১ পয়সা দিয়ে একজনকে সই করাতে হবে এই নির্দেশিকা গৃহীত হয়। সম্মেলনের সমাপ্তি হয় বিশাল সমাবেশের মধ্য দিয়ে।

১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে ঘটনাবহুল। ৮-আগস্ট বোম্বাই নগরীতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে ভারত ছাড় আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ সময় মানভূমের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি অতুলচন্দ্র ঘোষ। ৯ আগস্ট ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয়। অতুলবাবু তখন পুরুলিয়াগামী ট্রেনে উঠে বসেছেন। ১০ আগস্ট ভোর রাত্রে পুরুলিয়ার শিল্পাশ্রম পুলিশ ঘেরাও করল— তিনজনের গ্রেপ্তারী পরওয়ানা নিয়ে তারা হাজির হল— জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, দুজন সম্পাদক বীররাঘব আচারিয়া ও পূর্ণেন্দু ভূষণ মুখোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দুবাবু না থাকায় বাকি দুজন গ্রেপ্তার হলেন। আশ্রম বাজেয়াপ্ত হল। আশ্রমের বাসিন্দারা আশ্রম ছেড়ে যেতে চাইলেন না। সেজন্য তাদেরও 'অনধিকার প্রবেশকারী' হিসাবে গ্রেপ্তার করা হল— আশ্রমমাতা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, শ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ দত্ত, অরুণচন্দ্র ঘোষ, রামকিংকর মাহাত ও কমলা ঘোষকে।

বোম্বাই ফেরৎ অতুলচন্দ্র ১৩ আগস্ট জেলা কমিটির একটি মিটিং ডাকার নোটিশ দিলেন। সেদিনই তিনি কারাবন্দী হলেন। জেলার নেতারা যারা কারাগারের বাইরে ছিলেন তারা প্রচারপত্র বিলি, পিকেটিং, সত্যাগ্রহ, সভাসমিতি করতে থাকেন। কংগ্রেসের সমস্ত

অফিস ও আশ্রম বাজেয়াপ্ত হল। মাজিহিড়া আশ্রম, একঞ্জা আশ্রম, জাহানাবাদ অতুলাশ্রম, ভুতাম আশ্রম, চাষ কংগ্রেস অফিস, মুক্তি প্রেস, নিবারণচন্দ্র পল্লী শিল্প সংঘ, ঝরিয়া তিলক ভবন বাজেয়াপ্ত হল। ১০ আগস্ট ঝরিয়া, কাতরাসে হরতাল, ছাত্র ধর্মঘট হল। ঝরিয়ায় লাঠি চার্জ হল। কাতরাসে গুলি চলল। ঝরিয়ার কংগ্রেস নেতা প্রভাতচন্দ্র বসু বন্দী হলেন। পরে ছাড়াও পেলেন। অতুলচন্দ্র ঘোষের কারাবন্দীত্বকালীন তিনি জেলা সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হলেন। জেলা স্কুল ও মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্ররা বিদ্যালয়ের বাইরে এসে মিছিল করল।

এসময় ছড়রায় এরোড্রাম তৈরির জন্য জমি নেওয়া হচ্ছিল। জমিদাতারা প্রতিরোধ করলেন। ঐ আন্দোলনের নেতা ছিলন গিরিশচন্দ্র মজুমদার। গিরিশচন্দ্রও পুলিশের হাতে বন্দী হলেন। মানভূমের প্রথম সারির সব নেতারা জেলে বন্দী হলেন। দ্বিতীয় সারির নেতাদের দায়িত্ব পড়ল আন্দোলনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। এসময় চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত, বাসন্তীরায়, ও অমল রায় কলকাতা থেকে ট্রেনযোগে ফিরলেন। পুরুলিয়া আসা বিপজ্জনক ভেবে তাঁরা আদ্রায় নেমে গেলেন। আদ্রা থেকে সাইকেলে লক্ষ্মণপুর এসে কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করলেন। দুজনে সাইকেলে পুরুলিয়া আসছিলেন পথে একটি পুলিশের জীপ পার হয়ে গেল। সাইকেল আরোহীদের পুলিশ চিনতে পারে নি। পুরুলিয়া ঢোকার আগেই তাঁরা শুনলেন গিরিশচন্দ্র ও রামচন্দ্র অধিকারী গ্রেপ্তার হয়েছেন। কৃষ্ণপ্রসাদের সন্ধানে পুলিশ বের হয়েছে। রাতে দুজন হুটমুড়ায় এসে স্কুলের বারান্দায় আরো কয়েকজন ছাত্রের সাথে শুয়ে পড়লেন। পুলিশ রাত্রে এসে একজনকে জিজ্ঞাসা করল কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী হুটমুড়া এসেছে কিনা। একজন বললেন ওকে পুরুলিয়া যেতে দেখেছি। পুলিশ চলে গেলে চিত্তভূষণ ও কৃষ্ণপ্রসাদ ওখান থেকে সরে পড়লেন। ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রস্তুতি ও কৌশল নেওয়ার জন্য প্রথমে পুনুড়া গ্রামে, আদ্রায় এবং অবশেষে বান্দোয়ানের জিতান গ্রামে বৈঠক হয়। পুনুড়া গ্রামে উপস্থিত ছিলেন চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত, ভীমচন্দ্র মাহাত, মথনচন্দ্র মাহাত, ধনঞ্জয় মাহাত, সত্যকিংকর মাহাত, গিরিশচন্দ্র মাহাত, চুনারাম মাহাত। স্থির হয় যে যতদিন পর্যন্ত প্রশাসনকে চূড়ান্ত আঘাত দেওয়া যাচ্ছে না ততদিন মিছিল, মিটিং, সত্যাগ্রহ, শোভাযাত্রা করে যেতে হবে। সকলে আদ্রায় মিটিং-এর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে থাকলেন।

আদ্রায় বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়— ১. থানাগুলি অধিকার করতে হবে, ২. টেলিগ্রাফের তার কাটা হবে, ৩. গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার পুলগুলি ভাঙতে হবে। কোরাং গ্রামের রুটু মুদিকে ডিনামাইট কেনার দায়িত্ব এবং বাসন্তীদেবীকে টেলিগ্রাফ তার কাটার যন্ত্র কেনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

জিতান গ্রামে ২৩ সেপ্টেম্বর রাত ১টায় ১৯৪২-এর আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিকল্পনার জন্য বৈঠক বসে। বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলি ছিল নিম্নরূপ—

১. ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ ১৩-ই আশ্বিন মঙ্গলবার পুরুলিয়া থেকে সমস্ত থানার যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে হবে। টেলিফোনের তার কেটে, রাস্তার পুল ভেঙে, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দিতে হবে,

২. রাত ৩টা/৪টার মধ্যে থানার মধ্যে পুলিশদের আটকে বেঁধে ফেলতে হবে।

৩. থানার সমস্ত রেকর্ডপত্র ও সরকারি কাগজপত্র, মদভাটি জ্বালিয়ে দিতে হবে।

৪. ১ অক্টোবর ১৯৪২ সকল কর্মীকে পুরুলিয়া পৌঁছে কোর্ট কাছারিতে সত্যাগ্রহ করে কাজ বন্ধ করে দিতে হবে।

জিতানে মিটিং করে সকলে ফিরে এলেন। দ্রুত সকলে কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করলেন। সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজ করতে হবে। সেপ্টেম্বরের ২৯ ভোর রাত্রে অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বর থানাগুলি দখল করতে হবে, আগুন দিতে হবে, বন্দুক লুঠ করতে হবে। জেলার বান্দোয়ান বরাবাজার ও মানবাজারে এই কর্মসূচী চূড়ান্ত সফল হল। মানবাজারে পুলিশের গুলিতে দুজন শহীদ হলেন— প্রায় সত্তরজন আহত হলেন। অন্যান্য থানাতেও কর্মসূচী সফল হল।

২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বান্দোয়ান থানার মধুপুর গ্রামে ২০০ জন কংগ্রেস কর্মী জড়ো হলেন। মধুপুর-লিকির পুল ভেঙ্গে দেওয়া হল। চটকা ব্রীজ ভাঙা গেল না। পটমদার কর্মীরাও বান্দোয়ানে এসেছিলেন। রাত ৩টা-৪টার সময় দলবদ্ধভাবে থানায় ঢুকে পাঁচজন পুলিশকে বেঁধে ফেলা হল। থানার ঘরের চাবি খুলে সমস্ত কাগজপত্রে আগুন জ্বেলে দেওয়া হল। একটি দুনলা বন্দুক, একটি পিস্তল আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হল। মদভাটি ও হালট্যাক্স অফিসের খাতাপত্রও জ্বালিয়ে দেওয়া হল। সেদিন দুপুরে বাজারে চাল ডাল আদায় করে সম্মিলিতভাবে একজায়গায় খাওয়াদাওয়া করে সন্ধ্যার পর মধুপুর ডাকবাংলো থেকে সকলে পুরুলিয়ার উদ্দেশ্যে হাঁটা দিলেন। ভোরে বরাবাজার থানার সিন্দরী গ্রামে এসে খবর পেলেন মানবাজারে গুলি চলেছে। কয়েকজন শহীদ হয়েছেন। পুরুলিয়ার কর্মসূচী বন্ধ হয়ে গেছে। পরিশ্রান্ত কর্মীরা জলখাবার খেয়ে আবার বান্দোয়ানে ফেরৎ গেলেন।

বরাবাজার থানা পোড়ানোর দায়িত্বে ছিলেন সাগরচন্দ্র মাহাত, আনন্দ সিংহদেব, অমূল্য সিং মোদক, হীরু সিং সর্দার, মথন চন্দ্র মাহাত, ধনঞ্জয় মাহাত প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃত্ব। ঐ থানায় কংগ্রেসের কাজ করতেন রেবতীকান্ত চ্যাটার্জী। তিনি ছিলেন জাহানাবাদ অতুলাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। ২৯ সেপ্টেম্বর রাত্রিতে সকলে জাহানাবাদ আশ্রমে হাজির হলেন।

চিড়া দৈ খেয়ে সকলে গভীর রাত্রিতে বরাবাজারের উদ্দেশ্যে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলেন। নেংসাই নদীর পুলের কাছে সকলে পৌঁছালেন। শিবমন্দিরে লোক রাখা হল পাহারার উদ্দেশ্যে। প্রথমে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাটা হল। দলবদ্ধ ভাবে সকলে থানার গেটে হাজির হলেন। একজন পুলিশ জিজ্ঞাসা করলেন থানায় ঢুকে কি করবে ? দৃঢ় পদক্ষেপে ভীম মাহাত থানায় প্রবেশ করলেন। থানার সমস্ত পুলিশকে বেঁধে ফেলা হল। থানার কাগজপত্র একজায়গায় জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল। সিপাহীদের বন্দুকগুলি আগুনে ফেলে দেওয়া হল। একজন বন্দুকধারী সিপাহী ছুটে পালাচ্ছিলেন। তাঁকে ধরে এনে বন্দুকটি আগুনে ফেলে কেরোসিন ঢেলে দেওয়া হল। সামনে বেলগাছের বেলগুলি খুব শব্দ করে ফাটতে লাগল। থানার পর পোস্টাপিস পোড়ানো হল। তহশিলদারের অফিসে আগুন লাগানো হল। গাঁজার দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হল। এইভাবে বরাবাজারের থানা আক্রমণের কর্মসূচি পালিত হল।

মানবাজার থানা আক্রমণ জেলার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সত্যকিংকর মাহাত, গিরীশচন্দ্র মাহাত, মোহিনী মাহাত ও আঘনী মাহাত জিতান গ্রামের বৈঠকে হাজির ছিলেন। তাঁরা বিষ্ণু মাহাত ও হেমচন্দ্র মাহাতকে কুমারী নদীর দক্ষিণ দিকের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব দেন। বোরোর মদভাটী এবং খড়িদুয়ারার চৌকিদারী অফিস পোড়াবার দায়িত্ব তাদের দেওয়া হয়। ঠিক হয় বাসুদেব মন্ডল দিঘি/তামাখুন গ্রামে খবর দেবেন।

২৮শে সেপ্টেম্বর সোমবার ১১ আশ্বিন বোরোগ্রামে হাট ছিল। সেদিন সকলে দলবলসহ মদভাটিতে হাজির হন। কর্মীদের জামাকাপড়, ব্যবহার্য জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে আসতে বলা হয়। ভাটিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এরপর গাঁজার দোকানের সমস্ত গাঁজায় আগুন দেওয়া হয়। প্রবল বর্ষণের সাথে সকলে খড়িদুয়ারা পৌঁছায় সেই রাত্রেই। খড়িদুয়ারার তহশিলদারের অফিসের সব কাগজপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর সকলে কুমারী নদীরতীরে সমবেত হলেন। তখন আঘনী মাহাত বললেন ১২ আশ্বিন নয়। ১৩ আশ্বিন সকালে আমাদের সমবেত হওয়ার কথা ছিল। সকলের মাথায় বজ্রাঘাত, নেতারা চেপুরায় গিয়ে সত্যকিংকর বাবুকে একথা বলায় উনি সেদিন সকলকে আত্মগোপন করার নির্দেশ দেন। পুলিশ খবর পেয়েছে। অতএব যারা দ্বিধাগ্রস্ত তাদের ফিরে যেতে বলা হল। বাকিরা ২৯ সেপ্টেম্বর ভোররাত্রে মানবাজারের দিকে প্রশেসন করে হাঁটতে থাকলেন। কর্মীরা দলবদ্ধভাবে হাঁটতে থাকলেন। প্রথম সারিতে ছিলেন চুনারাম মাহাত, গোবিন্দ মাহাত ও গিরিশ মাহাত। এঁদের প্রথম দুজন সেদিন শহীদ হয়েছিলেন, তৃতীয়জন গুলি খেয়ে আজীবন Handicaft হয়ে গেছিলেন। দ্বিতীয় সারিতে ছিলেন হেমচন্দ্র মাহাত ও বিষ্ণুপদ মাহাত।

হেমবাবু ও বিষ্ণুপদবাবুরও গুলি লেগেছিল। থানায় পৌঁছেই দেখা গেল দারোগা ভগবান সহায় রাইফেলধারী পুলিশদের নিয়ে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। সত্যাগ্রহীরা তাঁদের বললেন আপনাদের উপর আমাদের কোনও আক্রোশ নাই। আপনারা সরে যান। আমরা সরকারী কাগজ সব পুড়িয়ে দেব। দারোগা হুমকি দিয়ে বলেন সরে না গেলে গুলি চালাব। এই বলে গুলি চালাতে থাকেন। গোবিন্দ মাহাত, চুনারাম মাহাত, গিরীশ মাহাত থানা প্রাঙ্গণেই পড়ে যান। হেম মাহাত ও বিষ্ণুপদ মাহাতও গুলিতে গুরুতর আহত হন। স্থানীয় মানুষ উত্তেজিত হয়ে ইট পাটকেল ছুঁড়তে থাকেন। সত্যকিংকর বাবু পরিস্থিতি হিংস্র হয়ে যাচ্ছে দেখে সত্যাগ্রহ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। চুনারাম মাহাত ঘটনাস্থলেই মারা যান। গোবিন্দ মাহাতকে হাসপাতাল পাঠান হয়। তার মৃত্যু হল হাসপাতালে। গিরীশ মাহাতর পা দুটোই জখম হয়। তাঁকেও হাসপাতালে পাঠান হল। হেমবাবু, বিষ্ণুবাবুকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। বাকি সকলকে বন্দী করা হল।

আন্দোলনের পরে বান্দোয়ান, বরাবাজার ও মানবাজারে ব্যাপক পুলিশী সন্ত্রাস শুরু হয়। বান্দোয়ানে ৮২ জন, বরাবাজারে ৩৭ জন, মানবাজারে ৫৪ জন কারাবন্দী হন। বিচারে ছয়মাস থেকে ১২ বছর পর্যন্ত জেল হয়। দুজন শহীন হন— চুনারাম মাহাত ও গোবিন্দ মাহাত। ১৯৪৪ সালে শেষাশেষি বন্দীরা সব মুক্তি পেতে থাকেন। পুরুলিয়া জেল, হাজারিবাগ জেল, ভাগলপুর জেল ও পাটনা ক্যাম্প জেলে বন্দীরা ছিলেন। নেতারা আগে থেকেই জেলে ছিলেন। জেলে বসে তাঁরা শুনলেন মানভূমের আন্দোলনের কাহিনি। গৌর মাহাত ভাগলপুর জেলে বসন্ত রোগে, মুকুন্দ মাহাত ও মাহু শবর (ঘোলহুড়া) পাটনা ক্যাম্প জেলে মারা যান। কাশীপুর, হুড়া, রঘুনাথপুর, জয়পুর, পাড়া প্রভৃতি থানায় রাস্তা কেটে, ট্রেনের তার কেটে, চাল লুঠ করে, মদভাটি পুড়িয়ে আন্দোলন হয়। জেলা নেতৃত্ব হাজারিবাগ জেলে বসে আন্দোলন বন্ধ করার নির্দেশ দেন। ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত জেলায় কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছিলনা।

মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল বহু ঘটনাবহুল ও ব্যাপক। সঠিক গবেষণার অভাবে, প্রচারের অভাবে এই আন্দোলনের কাহিনি জনগণের নজরে আসেনি। ২৯ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের মাতঙ্গিনী হাজরা শহীদ হয়েছিলেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর পুরুলিয়ার মানবাজারে দুজন শহীদ হয়েছিলেন। মাতঙ্গিনীর কথা সকলে জানেন। চুনারাম. গোবিন্দ-র শহীদ হওয়ার কাহিনি কেউ জানে না। মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনিও অনেকেই জানেন না।

এ কাহিনি জানা এবং জানানোর দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. পঞ্চকোট ইতিহাস, রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী, বজ্রভূমি প্রকাশনী।

২. পঞ্চকোট ও মানভূমের ইতিহাস, দিলীপকুমার গোস্বামী, বজ্রভূমি প্রকাশনী, পুরুলিয়া, পৃ. ৭৮-৭৯।

৩. Dalton.

৪. Chuar Rebelian, Jagadish Jha.

৫. এ কথা লেখককে বলেছিলেন বরাবাজার রাজপরিবারের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ সিংহদেও।

৬. পুরুলিয়া, তরুণদেব ভট্টাচার্য, ফার্মা কে.এল. প্রা.লি.।

৭. পার্বত্য কাহিনী, বাংলার মুখ প্রকাশন।

৮. মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলন, দিলীপকুমার গোস্বামী, বজ্রভূমি প্রকাশনী।

৯. পঞ্চকোট ও মানভূমের সভ্যতা, দিলীপ কুমার গোস্বামী, বজ্রভূমি প্রকাশনী।

১০. মানভূমের ভাষা আন্দোলন ও পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি, দিলীপকুমার গোস্বামী, বজ্রভূমি প্রকাশনী।

১১. মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলন, দিলীপকুমার গোস্বামী, বজ্রভূমি প্রকাশনী, পুরুলিয়া।

১২. সদর মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলন, অধ্যাপিকা সুমিত্রা মিত্র।

১৩. স্বাধীনতা আন্দোলনে রক্তে রাঙা মানভূম, ভজহরি মাহাত ও পদকচন্দ্র মাহাত।

১৪. ধানবাদ ইতিবৃত্ত, অজিত রায়।

ঝুমুর গান ও প্রকৃতি : ব্যবহারে ও ভাবনায়

ঠাকুরদাস মাহাতো

ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক ও সাংগীতিক সম্পদ হল ঝুমুর। বিশেষ করে পশ্চিম সীমান্ত বাংলা সংলগ্ন অঞ্চল— মানভূম, সিংভূম, হাজারিবাগ, বোকারো, রাঁচী, পালামৌ, বীরভূম, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, ধলভূমগড়, ময়ুরভঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল হল ঝুমুরের সৃজন ও লীলাভূমি। শাল-পিয়াল-মহুল-পলাশে ঢাকা বিস্তীর্ণ বনভূমি আচ্ছাদিত ঢেউ খেলানো উঁচু-নীচু বিস্তীর্ণ মালভূমি অঞ্চলের জনজাতি মানুষের মধ্যে প্রচলিত জনপ্রিয়তম গানটি হল ঝুমুর। ‘‘‘হড় মিতান’ সংস্কৃতির ধারক-বাহক এই সকল জনগোষ্ঠীর জীবন সংগীতই হল ঝুমুর। ঘরে বাইরে, টাঁইড়ে ঠিকরে, বনে জঙ্গলে, ডুংরি-পাহাড়ে, খেত খামারে, পথে ঘাটে, আখড়া এবং আসরে, পরব-উৎসবে ঝুমুর তাদের চিরসঙ্গী। নির্ধনের ধন, ধনীর বিনোদন, শিল্প রসিকের শিল্পকলা, প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম-বিরহ, হৃদয় নিবেদনের সংগীত ঝুমুর।”[১] (বীনাপাণি মাহাত) ঝুমুর এই অঞ্চলের প্রাচীনতম সংগীতও বটে। বনভূমিতে বনবাসী মনে সৃষ্ট ঝুমুর গানে স্বাভাবিক ভাবেই প্রকৃতি একটা বড় স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

ঝুমুরের গায়কী পদ্ধতি, শ্রেণিবিভাগ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও আমরা এই অঞ্চলের প্রকৃতির প্রভাব লক্ষ করি। ভূ-প্রকৃতির দিক থেকে ঝুমুর দেশ ঢেউ খেলানো উঁচু-নীচু হলেও এক-একটি জলবিভাজিকা থেকে তা কোনো এক দিকে ক্রমশ নীচু হয়েছে। ঝুমুরের গায়ন পদ্ধতিও ঠিক এরকমই— অবরোহীধর্মী। সুর সপ্তকের যেকোন সুর থেকে ঝুমুর গাওয়া হয়ে থাকে। এক স্বর থেকে অন্য স্বরে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রবণতা ঝুমুরে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ঝুমুর শিল্পী মিহিরলাল সিং দেও এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য— “ঝুমুরের গায়ন আরোহ-অবরোহ বক্রগতিতে হয়ে থাকে। এখানে ভূ-প্রকৃতির মতই ঝুমুরের গায়কী বা বিস্তার পদ্ধতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে।”[২] প্রকৃতির সঙ্গে ঝুমুরের আত্মিক যোগটি

ফুটে উঠেছে বিশিষ্ট ঝুমুর কবি ও শিল্পী হারাধন মাহাতর কথাতেও— "ঝুমুর, ঝুমুর দেশে আদিম জীবনধারার প্রাণ সংগীত। মাতৃভূমির উঁচু-নীচু মাটির গভীরে গোপনে এর সুরের শিকড় প্রোথিত। আদিম জনজাতি সমূহের সূতিকাগার হতে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ঝুমুর পরিমণ্ডলের নদী-পাহাড়, খাল-বিল, ডাংরা-ডুংরি, টিলহা টাঁইড় বাইদের সাথে মিলেমিশে ঝুমুর একাকার হয়ে গেছে। ঝুমুর, ঝুমুর দেশের মানুষের হৃদপিণ্ড, দেহের শোণিত, নাড়ির স্পন্দন। সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানব-মানবীর মুখে ভাষা পেয়েছে এই ঝুমুর। হাটে মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সৃজনশীল চিরন্তন এই সুর।"[৩] বৈচিত্র্যে ভরা ঝুমুরের নানা শ্রেণিবিভাগ ও তার নামকরণের মধ্যেও প্রকৃতির প্রভাব অস্বীকার করা যায়নি। তাই ঝুমুরের নামকরণে দেখি— টাঁইড়, ঝিঙাফুল্যা, ভাদরিয়া, চৈতালি, আষাঢ়িয়া, বারমাস্যা প্রভৃতি।

ঝুমুরের জন্মদাতা মালভূমি অঞ্চলের পল্লীপ্রকৃতির সহজ-সরল সাধারণ মানুষ। সবুজে ঘেরা ঢেউ খেলানো উঁচু-নীচু ডুংরি পাহাড়ে ঘেরা বনভূমি, পাহাড়ি ঝর্ণা-নদী-ঋতুবৈচিত্র্যে ভরা পরিবর্তনশীল প্রতিবেশ পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে করতে তারা তাদের ভাব প্রকাশ করেছে ঝুমুরের কথায় ও সুরে। তাই দেখা যায় ঝুমুরের আদিরূপ 'টাঁইড়' ঝুমুর থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে ঝুমুরের নিবিড় যোগ। ঝুমুরের জন্ম প্রকৃতির মাঝে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। লক্ষ করলে দেখা যাবে টাঁইড় ঝুমুরের উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষাদি অলংকারগুলি গৃহীত হয়েছে একেবারে এখানের প্রকৃতির থেকে, দৈনন্দিন দেখা পাশের পশুপাখি, ফল-ফুল-গাছ-গাছালি থেকে। কয়েকটি টাঁইড় ঝুমুরের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

১. ই গাঁয়ে কি মরদ আছে হে—
জড়া ডালিম হাঁক পাড়ে যাছে হে।

২. দেখ্যে বাঢ়ালি তকে তুই না দিলি আমাকে।
বুকের মাঝে শিমল কড়ি দ'ল্‌কে, সেই দেখে মন ললকে।

৩. বঁধুর বাড়িএ পাক্যে আছে বারমাস্যা বেল রে
সেই বেল তুলতে বুকে মারে শেল রে।

৪. যখন বেলা তালগাছের আড়ে লুকলুকানি খেলতে ছিলম এক গলা জলে।
অ-তুই ভাবিস কি লো অন্তরে, কাড়া বাগাল আ'সছ্যে ডহরে।

৫. যখন ছিলি মা বাপের ঘরে, লুকলুকানি খেল'তে ছিলি এক গলা জলে।
যেমন শোল মাছে উফাল মারে ঢররা সিম'ল ডাল ভাঙ্যে পড়ে।

আদি রসাত্মক 'টাঁইড়' ঝুমুরের আদিতম রূপের উপমা-রূপক গুলি লক্ষণীয়। এ জাতীয় শব্দ পরে ব্যবহৃত হয়নি।

টাঁইড় ঝুমুরের পরবর্তীস্তর কাঁইড় বা দাঁইড় ঝুমুর। এই স্তরে ঝুমুর মাঠ থেকে গ্রামে, গৃহাঙ্গনে প্রবেশ করেছে। ঝুমুর 'হাঁকা' হয়েছে ঝুমুর গাওয়া। একক থেকে সমবেত গানে পরিণতি পেয়েছে। গঠিত হয়েছে 'আখড়া'। এই পর্যায়ে ঝুমুরের সুরে ও কথায় প্রকৃতি আরো নিবিড়ভাবে ফুটে উঠেছে। চারপাশে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার কথা ও জীবন সংগ্রামের কথা। আর তা প্রকাশ করতে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে অভিজ্ঞতালব্ধ প্রকৃতির দৃশ্যের।

দাঁইড় ঝুমুর গুলি আকারে ছোট ছোট। এক বা আধ কলির। এক টুকরো মনের ভাব প্রকাশ করেই শেষ হয়। এ যেন "স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল ক্ষণকালের ছন্দ"। এই ক্ষণকালের স্ফুলিঙ্গের মধ্যেই প্রকৃতি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। একটি বাক্যে ভেসে ওঠে দিগন্ত বিস্তারি দৃশ্য— 'ই ডুংরি, উ ডুংরি পিয়াল পাকেছে'। মনোরম হয়ে ওঠে বাইরের জগৎ। আড়াই চালের এক পা মাটিতে, এক পা শূন্যে রেখে যখন গেয়ে ওঠে— 'জ'ড় গাছের আড়ে রে ভাই/আড়হাইয়ার চাঁদ' তখন অশত্থ গাছের মাথার উপরে ওঠা একফালি চাঁদের সঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠা মানুষের মন নিবিড় ভাবে যুক্ত হয়ে যায়। বনের মাঝে পাহাড়ি ঝর্ণার চঞ্চলতার সঙ্গে জল আনতে কিংবা স্নান করতে যাওয়া কিশোরীর হৃদয় চঞ্চলতা যুক্ত হয়। ঝিরি ঝিরি শব্দের সঙ্গে কিশোরীর গোপন প্রেম গুনগুন করে ওঠে—

"ঝিরি ঝিরি নদীয়া, পাতাল শীতল পানিয়া
ঝিটি ঝিটি শামের ভরত সাগরিয়া।"[৩ক]

প্রকৃতির মাঝে মনে জাগে রোমান্স। নদীর তীরে ফুটে আছে হরেক রকম ফুল। দেখলেই ইচ্ছে করে প্রেমিকার খোঁপায় গুঁজে দিতে—

"দাঁড়ি করে মহমহ, নদীঘাটে কিয়াফুল
তহর খঁপায় গুঁজে দিব লাল গ্যান্দাফুল।"

নিত্যদিনের রঙ্গ-ব্যঙ্গেও অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রকৃতি। লাল গামছা কাঁধে দিয়ে রাস্তায় চলেছে গ্রাম্য নাগর। দূর থেকে মনে হয়েছে— যেন কচি শাল গাছ, মাথাটি কদম ফুলের কুঁড়ির মত। বন্ধুর কান্ড দেখে হাসি থামে না—

"শাল গাছের শাল পংড়া কদম গাছের কঁড়ি হে।
বঁধুর কাঁধে লাল গামছা চটক দেখে মরি হে।।"

জাওয়া-করম গানের মধ্যে যে প্রকৃতি প্রেম দেখা যায় তা শিষ্ট সাহিত্যের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। নিরক্ষর গ্রাম্য কৃষক রমণীর কৃষিক্ষেত দেখে তাৎক্ষণিক যে অভিব্যক্তি তাতে অবাক হতে হয়—

"এক মুঠা সুর গুঁজা বুনল মর গটা গড়া
সুর গুঁজা ফুটে লালে লাল রে।"

নির্জন মাঠে গাছের নীচে বসে বোন ভাবছে বাপের বাড়ির কথা। মন খারাপ হচ্ছে ভাইয়ের জন্য। ঠিক সেই সময়ে গাছের নীচু ডালে বসে ডেকে ওঠে কাক। বোন সেই কাককেই জিজ্ঞেস করে—

"কাও কাও কইল্লি কওয়া, বসলি নাম ডালেরে।
সত্যি করে বলবি কাওয়া দাদা কেমন আছে রে।"

আমাদের বিরহী যক্ষের কথা মনে করিয়ে দেয়। ঢেউ খেলানো উঁচু-নীচু ধান জমির আল্যে ফুটে আছে কাশফুল, রাখাল বাঁশি বাজাচ্ছে। সেই বাঁশির সুরে আকুল হয়ে ওঠে মন—

"বাইদে বহালে বাঁশি, বাগাল্যায় বাজায় বাঁশি
বিটি ছেল্যার কুল রাখা হ'ল দায়
পাছে কাশি ফুল, ফুটে রায়।"

প্রকৃতি এখানে অত্যন্ত বাস্তব, প্রত্যক্ষ। কেবল রোমান্স বা অলংকরণের বস্তু নয়, মানুষের মনে তার প্রতিঘাত তীব্র। পাহাড়ের নীচে পুকুর। সন্ধ্যার অন্ধকারে সেখানে যেতে বুক কাঁপে—

"উপরে ডুঙ্গুরিয়া নীচে পুখুরিয়া
ডর লাগে মকে সাঝেঁক বেরিয়া।"

করুণ রসের প্রসঙ্গও আছে। আমাদের মনে করিয়ে দেয় ক্রৌঞ্চ বধের করুণ দৃশ্যটি—

"ছুটুমুটু পাখটি বাঁধগড়ায় চরে রে
কন শালায় বিঁধে দিল কঁহর কঁহর করে রে।"

ঝুমুরের তৃতীয় স্তরে এল আধুনিক লৌকিক ঝুমুরের পাশাপাশি দরবারি ঝুমুর বা উচ্চাঙ্গের ঝুমুর। এই সময়কালের পরিচয় দিতে গিয়ে দরবারি ঝুমুরের বিশিষ্ট শিল্পী মিহির লাল সিংহ দেও বলেছেন—"এই সময়কালে আমরা দেখতে পাই সমাজ জীবনে স্থিরতা। এই সময়েই এখানে সামন্ত রাজা জমিদার তথা বিত্তবান মানুষের প্রগাঢ় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে ঝুমুর। তাই সমস্ত সঙ্গীত কলারই এই সময়ে চরম উন্নতি লক্ষ করা যায়। বিশেষ

করে মানভূম তথা সমস্ত জঙ্গলমহলের সামন্ত রাজা জমিদার তথা মানকি, মুন্ডা, ঘাটোয়াল প্রভৃতি গোষ্ঠীর মানুষজন উচ্চাঙ্গ ঝুমুর ও অন্যান্য লোকসঙ্গীতগুলির তন-মন-ধন দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। আবার এই সময়কালেই জঙ্গলমহলে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাবধারায় ভাবিত হয়ে এই অঞ্চলের অধিকাংশ ভূস্বামী ও প্রজাবর্গ অনুপ্রাণিত হন। ফলে লৌকিক ঝুমুরের পাশাপাশি উচ্চাঙ্গ দরবারি ঝুমুরের আবির্ভাব ও প্রসারে ঝুমুরের এক নতুন ধারার জন্ম হয়।"[৪] এর ফলে লৌকিক ঝুমুরের নায়ক-নায়িকার জায়গায় আবির্ভাব ঘটল রাধা-কৃষ্ণের। দরবারি ঝুমুর হয়ে উঠল 'অভিনব রাধা কৃষ্ণ পদাবলী'। ঝুমুর গীত পরিণত হল ঝুমুর সঙ্গীতে। লৌকিক জগৎ থেকে ঝুমুরের উত্তরণ ঘটল আধ্যাত্মিক জগতে। কোন কোন ঝুমুর কবি শিল্পী হয়ে উঠলেন এক একজন সাধক তুল্য। তবে এই রাধাকৃষ্ণ অন্তরে বৃন্দাবনের হলেও তাঁদের লীলাভূমি রচিত হয়েছে বৃন্দাবনের প্রকৃতিতে নয়, কদম তলাতেও নয়, রচিত হয়েছে এই জঙ্গলমহলের টাঁইড়-টিকরে, বনে জঙ্গলে, শাল পলাশ শিমুলে আচ্ছাদিত সুশোভিত প্রকৃতি মাঝে। দরবারি ঝুমুরের কিছু নিদর্শন তুলে ধরে এই প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

পদাবলী সাহিত্যের প্রধান আকর্ষণের বিষয় হল রাধা কৃষ্ণের মিলন বিরহের কথা। ঝুমুর পদাবলীর এ জাতীয় দু-একটি ঝুমুর নেওয়া যেতে পারে। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে জঙ্গলমহলের প্রকৃতি সেজে ওঠে অপরূপ সাজে— 'ঋতু বসন্ত ভুবন মাঝে,/সুন্দরী প্রকৃতি কত রূপে সাজে'। জঙ্গলমহলের রাধা সে রূপ দেখে পুলকিত হয়ে ওঠে। সে নিজেকেও সাজিয়ে নেয়— 'বনের ফুল হয়ে কানের দুল/দোলে শ্রবণে'। কিন্তু এতে সুখ কোথায় ? রয়েছে হৃদয়ে ব্যথা— 'দুঃখ দিলে বঁধু মধু ফাগুনে'। কারণ—

"শিমূলে পলাশে ফাগুনে খেলা।
মনে পড়ে হরি পুরানো সে লীলা।।[৫]

রাধার মনে মিলনের ইচ্ছা তীব্র হয়। সে-কথা সখির কাছে ব্যক্ত করে—

"ফাগুনা মলয় বহলো গো সই
আর কি বাঁচিব বঁধু বিনে (রং)
শিমুলে পলাশে কত না আবেশে
রাঙাইল মন ধরা সনে।
মুঞ্জরিল কলি গুঞ্জরিল অলি
সঞ্চরিল প্রেম দেহ মনে।।
ফাগুনে দ্বিগুন জ্বালালো আগুন
খুন ধরাইল যৌবনে।

যমুনা বহিল ময়ূরী নাচিল
জ্বারিল জীবন কুহু তানে।"[৬] (হারাধন মাহাত)

ফাগুনের জঙ্গলমহলে আগুন রাঙা শিমূল পলাশের রঙ যিনি দেখেছেন তিনি রাধার এই মর্মজ্বালা অনুভব করবেন। জঙ্গলমহলের প্রকৃতি আর জঙ্গলমহলের রাধার একাত্মতা অনুভব করবেন। বিভিন্ন ঝুমুর কবি-শিল্পীর কথায় ও সুরে একাত্মতার কথা উঠে এসেছে। তারই দু-চারটি ঝুমুরের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

১. বঁধূয়া না দিল দরশন।
বসন্তের ঐ সমাগমে, শাল পিয়াল কুড়চি বনে
মহুয়া বনে মত্ত আজ পবন।
মধু মত্ত অলিকুল, হয়েছে বড় আকুল
ব্যাকুল আমার এ নব যৌবন
বঁধুয়া না দিল দরশন।।
হু হু সমীরণে, জোছনায় আমের বনে
কুহু কুহু কোকিলার কূজন।" (কবি বিপিনা)[৭]

২. সখি গো বসন্তকাল আমার হইল কাল
না আইল সেই কাল বরণ।
জ্বালাতে গো জ্বলে জীবন।
তাখে বাদী হইল মদন।। (রং)
কিংশুক পলাশের ফুলো/চারিদিকে করে আলো
জলেতে যেমন অনলে তেমন/বিরহিণীর দহে মন
তাথে বাদী হইল মদন।। (দীনা তাঁতি)[৮]

ঝুমুরে ব্যবহৃত অলংকারের মধ্যেও ঝুমুর দেশের প্রকৃতিই হয়েছে প্রধান অবলম্বন। রাধা কীভাবে কৃষ্ণকে আগলে রাখে দেখা যাক—

"ধানের খেতে সোনালী শিস্ দেখে
চাষা যেমন রাখে চোখে চোখে,
তমন করে রেখেছিনু কালা।"[৯] (হারাধন মাহাত)

শুধু তাই নয়, বিরহিণী রাধার আক্ষেপোক্তিটিও শোনা যাক—

"জলের দোষে ডাল সিঝে না জ্বালে
তোমার সঙ্গে প্রেম করা বিফলে।" (হারাধন মাহাত)[১০]

ঝুমুর দেশের সাধারণ মানুষকে সারাটা দিন ব্যস্ত থাকতে হয় তার জীবন জীবিকার জন্য নিরন্তর জীবন সংগ্রামে। তাই সন্ধ্যাকালীন আখড়াই হল তার আনন্দ-বিনোদনের একমাত্র জায়গা। এখানে এলেই যেন তার সমস্ত দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। কখনো বা পালা-পার্বণকে উপলক্ষ করে সারারাত ধরে চলতে থাকে নাচ গান। আর এই গান হয় মূলত ঝুমুর। এই রাত্রিকালীন ঝুমুরগুলি নিশি প্রকৃতির সাজুয্যেই রচিত ও গাওয়া হয়। নামগুলিও দেওয়া হয়েছে রাতের তিনটি ভাগকে সামনে রেখে— ১. সাঁঝবেরিআ, ২. আধরাতিআ ও ৩. ভিনসরিআ। সন্ধ্যাকালীন ঝুমুর হল সাঁঝবেরিআ। এই সময়ের ঝুমুরের অন্যতম 'রেগ' বা সুর হল— জিগাঁফুল্যা, ছলকউআ, রসরসিয়া। মাঝরাতের ঝমুর হল আধরাতিআ। রাত যত বাড়ে, নিশীথ প্রকৃতি ততই ধীর স্থির শান্ত হয়। তাই এই সময়ে গাওয়া ঝুমুরের— "রেগগুলির প্রকৃতি ধীর, গম্ভীর এবং অন্তর্মুখী, গভীর ভাবাপন্ন। এই সময়কার ঝুমুরে পাওয়া যায় মূলত আধ্যাত্মিক, করুণ বা বিরহ বস্তুর প্রাচুর্য। লয়ে ছন্দে ঘটে পরিবর্তন। দ্রুত থেকে হয়ে যায় ঢিমা লয়। নিঝুম রাতের অন্ধকারের ও পরিবেশের গাম্ভীর্যের সঙ্গে গভীর বিষয়বস্তু, ঢিমা লয়ের গানে, সুরে ও নাচের মধ্যে এক অপূর্ব মিলন ঘটে যা বিশেষভাবে মনকে প্রভাবিত করে।"[১১]

এক সময় মোরগের ডাকে গভীর রাতের নিস্তব্ধতা কাটে। শুরু হয় পাখির কলরব। জানান দেয় নিশা অবসানের। এই সময় যে ঝুমুর গাওয়া হয় তাই হল 'ভিনসরিয়া'। এক বা দুই পদের হালকা চঞ্চল গতির ভিনসরিয়া ঝুমুরে ভোরবেলার প্রকৃতি চিত্রণ, সকাল বেলার মানসিক অবস্থা ও পুনরায় জীবন সংগ্রামের কাজে নেমে পড়ার কথা উচ্চারিত হয়—

"খুখড়া মাঞ ডাকি গেল, ভাঁগলউ বিহান
উঠা পুতা কানহুরে গেইআ ছাঁদা খলে কদমা তরে।

এইভাবেই ভূ-প্রকৃতি আর কালপ্রকৃতি মিলেমিশে একাকার হয়েছে ঝুমুরে।

ঝুমুর গানে মানভূম পুরুলিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা উঠে এসেছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঝুমুর কবির লেখায়। মানভূমের নদী, বনভূমি ও সাংস্কৃতিক সম্পদে ভরা সৌন্দর্য দেখার আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট ঝুমুর কবি ও শিল্পী সুনীল মাহাত—

"মানভূম কেইসন সুন্দর
আওয়া দেখা ভাই
মানভূম কেইসন সুন্দর।
কাঁসাই শিলাই সবন্নখা
নাচই কুঁদই আঁকা বাঁকা

কুমারী গুয়াই দামুদর গো।
শাল পিয়াল মহুল বন
উড়ু উড়ু করই মন
তালপাতে বনাওল ঘর গো।
টুসু ভাদু করম গান
ঝুমইরে বহই বান
ছো নাচে নাচই অন্তর গো।"[১২]

—গানটিতে প্রকৃতির সঙ্গে ঝুমুর ও তার অধিবাসীদের মনের একাত্মতা ফুটে উঠেছে।

ঝুমুর কবি ও শিল্পী সলাবত মাহাত পুরুলিয়ার মাটি-বন-পাহাড়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন ঝুমুরের মাধ্যমে—

"পুরুলিয়া জেলার লাল মাটি
ফুলে ফলে পরিপাটি
বন পাহাড় কত শোভা পায়
পুরুলিয়ার মাটিকে ভাই প্রণাম জানাই।
আমি পুরুলিয়া বাসী
এই মাটিকে ভালোবাসি
হেথা পলাশে শিমুলে রং ধরায়।
পুরুলিয়ার কঠিন মাটি
মাটিকেই করেছি খাঁটি
মাটি কাটি ফসল ফলাই।
পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য
সারাবিশ্বে সুবিখ্যাত
অমর হয়ে রইল ধরায়
এই মাটিরই মুখোশ তৈরী
কি সুন্দর বলিহারি
এই মাটিতেই শলাবতের ঠাঁই।"[১৩]

কবি ও শিল্পী কৃত্তিবাস কর্মকার পুরুলিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্যের কথা বলে জন্মভূমি পুরুলিয়ার মাটির প্রতি জানিয়েছেন অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা—

"ধন্য পুরুলিয়ার মাটি, যেটা জন্মায় সেটা খাঁটি হে
এই মাটি কাঁকর পলি চিটা,

কোথাও গিরি কোথাও বন, আছে অমূল্য রতন
বিজলি জন্মেছে সে, দেখেছি আমি।
পুরুলিয়ার মাটিতে মোর জন্মভূমি।"[১৪] (রং)

মানভূম-পুরুলিয়ার শস্যশ্যামল সবুজ বনভূমি আচ্ছাদিত মনোরম রূপ যেমন রয়েছে তেমনি প্রকৃতির ঋতু পর্যায়ে অপর একটি রুক্ষ তাপ দগ্ধ খরা প্রবণ রূপও রয়েছে। ঝুমুর কবির কথায় সেই রূপটিও ধরা পড়েছে। গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ রুদ্র রূপ তো আছেই, অনেক সময় বর্ষা-শরতেও অনাবৃষ্টির ফলে খরার মুখে পড়ে পুরুলিয়া। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে মা শারদার আরাধনায় যখন আপামর বাঙালি উৎসবে মাতে তখন কোন কোন বছর পুরুলিয়ার চাষীকে চালাতে হয় ফসল বাঁচাবার লড়াই—

"যে পুরুল্যার, ডাঙ্গা-টিপি;পাথর ভরা ভুঁই।
ভাদর মাসে, গাছ ঝামুরে; মরে আলগপুঁই।।
সেই পুরুল্যার, টাঁড়-টিকরে; গাহে ঝুমুর গান।। (রং)
যে পুরুল্যার, উষট মাটি; জ্যুসনায় মরে ধান।।
বর্ষাকালে, মেঘকে ভালে; ফাটে মাঠের মাটি;
শুখাঞ শুখাঞ শুখাঞ মরে; উপড়া তলার আঁটি।
সেই পুরুল্যার, কংসাবতির; হঠাৎ আসে বান।। (রং)
... ...
পাহাড় আছে পর্বত আছে আছে নদী নালা
বারো মাসেই লাগ্যে আছে, পেটে ভোখের জ্বালা।
সেই পুরুল্যার কাদায় ধুলায়, নাইরে ব্যবধান। (শেখ রুস্তম আনসারী)[১৫]

ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের বারো মাসের প্রকৃতি, আবহাওয়া ও সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের চিত্র ফুটে উঠেছে ঝুমুরে। বৈশাখের তীব্র তাপদাহ, জ্যৈষ্ঠের অসহ্য রোদ ঘাম আর মিষ্টি আম, ভাদ্রের বিরহ কিংবা পৌষের হাড় কাঁপানো শীত সহ বারো মাসের কাহিনি ফুটে উঠেছে কৃত্তিবাস কর্মকার রচিত এই ঝুমুরে—

"শুভ নববর্ষ বৈশাখ মাস,
তপ্ত মেদিনী পড়ে দীর্ঘশ্বাস
মিটে না পিয়াসা জলে,
আমার অন্তরের আশা, নব ভালবাসা
কোথা রইলে সভা ভুলে হে—
(রং) ওহে বঁধুমম, প্রাণ প্রিয়তম ভুলে রইলে কোন ফুলে।।

জৈষ্ঠেতে অনিষ্ট ঝর ঝর ঘাম
বন উপবনে শিষ্ট মিষ্ট আম
আষাঢ়ে বিজলি খেলে—
শরাবনের জলে, উছলে উছলে
বান ডাকে নদীর কুলে হে।।
ভাদর বিরহ আদরে প্রকাশি
কোন রাখালিয়া কোথায় বাজায় বাঁশি
আশ্বিনের কাশি ফুলে,
কার্তিক, আঘনে, রাঁধে নব অন্নে,
আশা রাখি শিঁকাই তুলে হে।।
পোষ, মাঘ মাসে প্রাণী খুজে তাপ,
আমার অন্তরে বিরহ উত্তাপ
যৌবন সদা উথলে—
ফাল্গুন চৈত্র মাস, হয় মধুমাস
ভাবে কৃত্তিবাসে বলে হে।।[১৬]

দরবারি ঝুমুরের ঋতু বিরহ বিষয়ক ঝুমুরের মধ্যেও বারোমাস্যার বিবরণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন ঋতু প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে রাধার অন্তরের বিরহ ব্যথাকে ব্যক্ত করেছেন ঝুমুর কবি—

(রং) "না হেরিয়া কালা দু'নয়নে ধারা
ঝরো ঝরো যায় ঝরিয়া।
ফাগুন-চৈত্র এই দুই মাস
আমায় ভুলে বঁধু হলো পরবাস
বইবো কত জ্বালা সহিয়া।
শুনো ওগো বৃন্দে প্রাণেরি গোবিন্দে
যতনে মিলাও আনিয়া।।
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ গরম ভীষণ
শ্যাম বিনে পাগল হইগো মন
যেমন গঙ্গা যায় গো পুড়িয়া।
ঐ নিঠুর বিনে বাঁচিব কেমনে
দিবানিশি যায় গো কাঁদিয়া।।

শ্রাবণ পড়িল নয়ন ঝরিল
আচল ভিজিল বহিয়া।।
কার্তিক মাসেতে শুন ওহে শ্যাম
ঘন ঘন জাগে যৌবন কাম
তোমার আশায় থাকি বসিয়া
আশ্বিন মাসেতে (সবে) অন্ন খাই সুখেতে
সাগরের উপোসে যায় দিন কাটিয়া।।"[১৭]

ফাল্গুন চৈত্রের বসন্ত ঋতুতে রাধার প্রিয় 'বঁধু'র পরবাসে থাকাটা অবশ্যই হৃদয়ের দহন সৃষ্টিকারী অবস্থা। কিন্তু গ্রীষ্মের বহির্প্রকৃতির তাপদগ্ধতার সঙ্গে বিরহ কাতর রাধার হৃদয়ের দহনকে এক করে দেখানো সত্যিই অভিনব। ঝুমুর কবি শ্রাবণের ধারার সঙ্গে রাধার অশ্রুধারাকে এক করে দেখেছেন। বসন্ত নয়, ধূসর হেমন্তে 'ঘন ঘন যৌবন কাম' জাগার কথা বলায় এই অঞ্চলের বিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণের রাধা নয়, লৌকিক রাধার হৃদয় প্রকৃতির মাঝে কীভাবে স্পন্দিত হয় শোনা যাক—

১. "শাল বন মহুল বন কাঁসাই নদীর কূলে
থেকে থেকে মনের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলে।"[১৮]

২. মহুল ফুলে/হায় হায় মহুল ফুলে,/মন মাতালি তুই মহুল ফুলে।

ঝুমুর দেশের প্রকৃতির সঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপনের নিবিড় যোগ ঝুমুরের কথায় ও সুরে প্রকাশ পেয়েছে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

অরণ্য প্রকৃতি এই অঞ্চলের মানুষের প্রাণের লীলাভূমি। যা-কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সব কিছুতেই বৃক্ষ কিংবা বৃক্ষের ডাল আবশ্যিকভাবে পূজিত হয়। বনের সঙ্গে সেই সাংস্কৃতিক নিবিড় যোগটিও ঝুমুর গানে ফুটে উঠেছে—

১. অরুণ বনে— গাড়বঅ করম ডারওআ।
(রং) বিজু বনে— হামরা খেলবঅ ঝুমরিয়া।।

২. রাকাব বন রণ বনে— গাহবঅ উধওয়া।
(রং) রেগে-রেগে - খঁচ আর সমাধানওআ।।

৩. উঁড়অ বনে— জাহালি-গুরওআ।
(রং) আমাবসআঁই— রাতি গেইআ - জাগাওআ।।

৪. বাধা-বনে-টুসু রেগ কহআ।
উপেন দাদাক-সংগে ঝুমুরঅ নাচওআ।[১৯]

এখানের আদিবাসীর কাছে সুখে দুঃখে জঙ্গলই ছিল স্বর্গভূমি। শাল-পিয়াল মহুল পলাশের স্নিগ্ধ ছায়া ও পরশে সে পেয়েছে বাঁচার রসদ, প্রাণের আবেগ—

"আমি আদিবাসী—
ঐ জঙ্গলে দেখেছি আমি
জংলি ফুলের হাসি গো। (সুনীল মাহাত)

নাম না জানা কিংবা নিজের মতো নাম দেওয়া গাছ-গাছালি, ফুল-ফলের মদিরতায় ভ্রমর-ভ্রমরির মতোই মেতে থাকত এখানকার বনবাসী অধিবাসীরা।

ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের মানুষের জীবন সংগ্রাম বড়ো কঠিন। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য তাকে বন-জঙ্গল থেকে লতা-পাতা কাঠ ফলমূল সংগ্রহ করতে যেতে হত—

"চালা ভাই বনে যাব—
বনেক ফর পাড়ি খাব গঅ।
হরেক রকমেক ফর খাব
বনেক ফর খাঁইএ রহলঅ—
এক দুপহর।"[২০]

কিন্তু অরণ্য নির্ভর মানুষ গুলোর অন্নদাতা সেই বন এখন আর নেই। ফরেস্টারের হাতে পড়ে সেই বনের শাল পিয়াল কেঁদ মহুলের সংখ্যা দ্রুত হারে কমেছে, তার জায়গায় রোপিত হয়েছে নানা 'বিদেশি' গাছ। তাই তাদের আক্ষেপোক্তি ঝুমুরের সুরে দীর্ঘশ্বাস হয়ে প্রকাশ পেয়েছে—

"সেহ বন আজ কাঁহা গেলি
নিহি-পাওব আর।।
দিন দুনিয়া বদলি গেল—
ফরেষ্টারে চলি গেল গঅ।
সেহঅ দিনেই বন গেল।
প্রকৃতি বন দেলবেচি—
লেগলঅ ঠিকাদার।।
হামরাক বন সিরাঁই দেল—
বিদেশী গাছ ঢুকাই দেল গঅ।
তাহে পানি টানি লেল।
কাঁহা ফর পাওবঅ ইবার

বনে কি ভিতর।।
কহতঅ উপেনে—
কাঁধে টাংগা বনে বনে গঅ।
করম ডাইর না মিলই।
কেইসে গাড়বঅ ডাইর আজ—
আখড়া ভিতর।।"[২০] (উপেন্দ্রনাথ মাহাত)

এই অঞ্চলের মানুষের কাছে 'করমের' জন্য 'করম ডাল' বা জিহুড়ের 'কেঁদ' ডালই যদি দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে তবে তার চেয়ে দুর্ভাবনা আর কী হতে পারে!

সভ্যতার বিকাশের অনিবার্য ধারায় কিংবা পুঁজিবাদীদের শ্যেন দৃষ্টিতে, কখনো বা সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলে জঙ্গলমহল তথা ঝুমুর দেশে প্রকৃতি ক্রমশ বিনষ্ট হয়েছে, হয়ে চলেছে। এ দৃশ্য ঝুমুর কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই ঝুমুর কবি আর্তস্বরে গেয়ে ওঠেন—

"অরণ্য কাঁদিছে এখন কুঠারের ঘায়
শাল মহুলের বংশে বাতি দিতে কেউ নাই।
আজ নিজেরি ভূমিতে আমি
হয়েছি পরদেশী গো।
ঐ পাহাড়ে জঙ্গলে থাকে আমার ভগবান
রোজ পাহাড়ি ঝর্ণাতে আমি করিগো সিনান
আমার মাদল আর বাঁসুরিকে
আমি ভালবাসি গো
আমি আদিবাসী।।[২১] (সুনীল মাহাত)

অরণ্যবাসীর অন্নদাতা বৃক্ষ শাল-পিয়াল মহুল পলাশ ইত্যাদি ক্রমশ বিলুপ্তির পথে। মানুষের লোভ আর অপরিণামদর্শিতায় অরণ্য আজ শ্রীহীন। এখনো ধামসা মাদল বাঁশির আওয়াজে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। মনে পড়ে রসিক নাগরে—

"শাল পিয়ালের বনে মাদল বাজে রে
ঘুরে ফিরে মনে পড়ে রসিক নাগরে।।"[২২]

কিন্তু সেই আবেগ, সেই আবেশ যেন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ—

"মনলোভা মনশোভা হারাই গেল রে
জোসনা রাতে ঝুমুর আসর মরে গুমরে।
সবুজ সবুজ ভালবাসা— কোথায় পাব রে।।

বনের ফুল বনের ফল— বনে আর নাইরে
ময়না টিয়া গান গায় না— সুরের লহরে।
ময়ূর হরিণ আর নাচে না— বনের মাঝারে।"[২২]

তাই— এই অঞ্চলের সমস্ত মানুষের হয়ে ঝুমুর কবির প্রার্থনা—

"শুন শুন ও বাবুরা, দে ফিরায়ে, বন
সবুজ পাতার বাতাসেতে, জুড়াক এ জীবন
বন আমাদের ধন যৌবন, তাই যাব না তো শহরে।।"[২২] (তুলসীচরণ দাস)

বাবুরা ফিরিয়ে দিচ্ছেন, তবে শাল পিয়াল কেঁদ পলাশের বন নয়, পরিবর্তে জলাধার, বিদ্যুৎকেন্দ্র, পাথর খাদান আর শহুরে বাবুদের বিনোদনের জন্য হোটেল রিসর্ট সমৃদ্ধ পর্যটন কেন্দ্র। আর শাল মহুলকে উৎখাত করে তারই ভূমিতে রোপন করছেন সোনাঝুরি, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি গাছ। ঝুমুর দেশের মানুষ এটা মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি। কারণ এই অনাচার অরণ্যের মানুষ ও তার চিরসঙ্গী বনের পশু পক্ষীর বিনাশকেও ত্বরান্বিত করেছে। তাই ঝুমুর কবি ক্ষোভে, দুঃখে, প্রতিবাদে গেয়ে ওঠেন—

"শাল কাঁদে পিয়াল কাঁদে
কাঁদে মহুল বন
অযোধ্যা পাহাড়ে বস্যে কাঁদে আমার মন
এই তিরিং রিঙা গাছ গিলা
কথালে যে আল্য
দেখাল্য দেখাল্য খেইল বাবুরা দেখাল্য
কওআ কাঁদে কুইলি কাঁদে
কাঁদে ঢেবচু পেঁচা
এই বনেতে ফুচিলুচির হল্য নাই আর বাঁচা
ভালবাসার খঁধা আমার ঝড়ে উড়্যে গেল।
বাঘ কাঁদে ভালুক কাঁদে
কাঁদে হরিণ খেড়া
বনের ভিতর কুড়া দেখে মরণের গাড়হা
হাথির পাল ভখে চাষার ধান খাঁয়ে গেল।
কোল কাঁদে কুড়মি কাঁদে
কাঁদে ভূমিজ কোড়া

আদিবাসী মূলবাসী সাঁওতাল লোধারা
ঝুড়ি ঝাঁটি ফলমূল সবই আশা গেল।।"[২৩] (সুনীল মাহাত)

অরণ্য প্রকৃতির বিনাশ জঙ্গল পাশ্ববর্তী মানুষের জীবনে নামিয়ে এনেছে ভয়ানক বিপদ। প্রায় দিনই কৃষকের ফসল কিংবা সাধারণ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে হাতির হানায়। বনভূমি সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে চিরাচরিত আরণ্যক গাছের পরিবর্তে যে সমস্ত গাছ লাগানো হচ্ছে তাতে হাতির খাদ্য সমস্যা বাড়ছে। নিরুপায় হাতি হানা দিচ্ছে লোকালয়ে। বাড়ছে সাধারণ মানুষের দুর্দশা। ঝুমুরে এই সমস্যা ও দুর্দশার কথাও উঠে এসেছে—

"মীনার মাই সেই ভাল, পিঁদাড়ে হাতির পাল,
দেখ্যে হামার জীবন গেল উড়্যে
(রং) মীনার মাই কথা যাব ঘর দুয়ার ছাড়্যে
দিবেক ইবার ঘর দুয়ার তাড়্যে
কুটুম আল্য হাতির গুষ্টি, করে দিল অনাসৃষ্টি
শাক সবজি সবই দিল গুঁড়্যে।।
ধাথ ধাৎ করতে বস্যে, দাঁতা হাতিটা ইঁড়কে আসে
দঁড়ত্যে যাঁয়ে হামার হাঁটু গেল লড়্যে।। (রং)
ধান ধুইল সবই গেল, থাস্যে গাঁজ্যে দিল
ঘর দুয়ার সকলই দিল তাড়্যে।। (রং)
বন জঙ্গল উজাড় করে, মানুষেই দিল সাবাইড় করে
এখন মিহির বুঝুক হাড়ে হাড়ে।।[২৪] (রং) (মিহিরলাল সিং দেও)

শিল্পায়ন, নগরায়ন ও ভোগবাদী সভ্যতাই পরিবেশ দূষণের মূল কারণ। পরিবেশ দূষণের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম জলবায়ু পরিবর্তন। যার ফল খরা-বন্যা-ঝড়। ঝুমুর কবি এই পরিবেশ দূষণ, তার পরিণাম ও মানুষের আশু কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—

"করি নিবেদন শুন শুন গ্রামবাসীগণ
কি ঘটনা ঘটিছে এখন।
শহর সভ্যতার রাক্ষস যারা, প্রকৃতিকে চুষে খাল্য তারা
তাইত আজ খরা বন্যা সাথের সাথি হল।। (রং)
কলকারখানা বাড়ার ফলে, গরম ধুঁয়ায় বরফ গলে,
সাগরের জল বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ।। (রং)
জল বাতাস মাটি কোন না রহিল খাঁটি,
পরিবেশে ধরিল ভাঙন।।

ভূমি সন্তান তোমারই পার, প্রকৃতিকে রক্ষা কর
মিহির বলে সবাই মিলে সাজাও মনেরি মতন।।[১৫] মিহির লাল সিং দেও)

এইভাবেই দেখা যায় ঝুমুর তার জন্মলগ্ন থেকেই অঙ্গে ধারণ করেছে তার জন্মভূমির প্রকৃতিকে। প্রকৃতি থেকেই উপমা-রূপকাদি অলংকার আহরণ করে হয়ে উঠেছে সুসজ্জিত। ভাবে ও ভাষায় এসেছে অনুপম সৌন্দর্য। ঝুমুর কবি শিল্পীরা তাঁদের পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির বন্দনায় যেমন ব্রতী হয়েছেন তেমনি প্রকৃতির বিনাশে হয়ে উঠেছেন ব্যাথাতুর। ঝুমুর গানেই ধ্বনিত হয়েছে তাঁদের ব্যথা-বেদনা ও প্রতিবাদ। তাঁরা আপামর মানুষকে সচেতন করে আহ্বান জানিয়েছেন অরণ্য প্রকৃতির বিনাশ ও পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে।

তথ্যসূত্র

১. নাড়ুগোপাল দে, কিরীটি মাহাত সম্পাদিত : ঝুমুর লোক জীবনের সন্ধান, সিধো কানহো বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ— ২০১৪, পৃ. ৩৭

২. মিহিরলাল সিং দেও, পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের ঝুমুর, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃ. ২৪

৩. হারাধন মাহাত (বিরচিত ও সম্পাদিত) : আদি রসকলা ঝুমুর পদাবলী, প্রথম প্রকাশ : ১৪১৩, পৃ. ৬৩।

৩.ক. সুবোধ বসু রায়, 'এক কলি আধকলির ঝুমুর', ছত্রাক, ২৬ তম বর্ষ, ২-য় সংখ্যা, ১৪০২।

৪. মিহিরলাল সিং দেও, পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের ঝুমুর, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃ. ২০।

৫. হারাধন মাহাত (বিরচিত ও সম্পাদিত) : আদি রসকলা ঝুমুর পদাবলী, প্রথম প্রকাশ : ১৪১৩, পৃ. ৫২০।

৬. তদেব, পৃ. ৫২১।

৭. তদেব, পৃ. ৫১৭।

৮. তদেব, পৃ. ৫১৭।

৯. তদেব, পৃ. ৫৯৬।

১০. তদেব, পৃ. ৫৯৬।

১১. বীণাপাণি মাহাত : 'ঝুমুরের আদিযুগ : রূপ ও বৈশিষ্ট্য', ঝুমুর লোকজীবনের সন্ধানে, তদেব, পৃ. ৪২

১২. ঝুমুর কথা (ঝুমুর গীতি সংগ্রহ), বাংলা ডট কম, ২য় সংস্করণ ২০০৮, কোলকাতা, পৃ. ২৬৯।

১৩. তদেব, পৃ. ২১৯

১৪. তদেব, পৃ. ২৩৪
১৫. তদেব, পৃ. ২৬৮
১৬. তদেব, পৃ. ২৩৮
১৭. হারাধন মাহাত (বিরচিত ও সম্পাদিত) : আদি রসকলা ঝুমুর পদাবলী, প্রথম প্রকাশ : ১৪১৩, পৃ. ৫২৩।
১৮. ঝুমুর কথা (ঝুমুর গীতি সংগ্রহ), বাংলা ডট কম, ২য় সংস্করণ ২০০৮, কোলকাতা, পৃ. ২৫৮।
১৯. উপেন্দ্রনাথ মাহাত : ঝুমুইর লহরি, প্রথম প্রকাশ— ২০১৯, পৃ. ২২
২০. তদেব, পৃ. ২৫।
২১. ঝুমুর কথা (ঝুমুর গীতি সংগ্রহ), বাংলা ডট কম, ২য় সংস্করণ ২০০৮, কোলকাতা, পৃ. ২৭৭
২২. তদেব, পৃ. ২৫৮
২৩. তদেব, পৃ. ২৭৮।
২৪. তদেব, পৃ. ২৫১।
২৫. তদেব, পৃ. ২৫২।

জাওয়া-করম উৎসবে নারীর অবদান ও আত্মপরিচয়

সংগ্রাম মাহাত

ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের অরণ্য ঘেরা বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি সমন্বিত জনজীবনের একটি জনপ্রিয় কৃষিকেন্দ্রিক লোকউৎসব হল 'জাওয়া-করম'। ভাদ্র মাসের শুক্ল একাদশী তিথি হল এই উৎসবের প্রধান সময়। তবে এর প্রস্তুতি চলে প্রায় দশ-পনেরো দিন পূর্ব থেকে আর তার রেশ থাকে প্রায় একমাস জুড়ে। উৎসবটি এলাকার প্রতিটি কৃষি পরিবারের অবিবাহিত মহিলাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানত কুড়মি, ভূমিজ, ভুঁইয়া, মুন্ডা, বাউরি, হাঁড়ি, সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের এটি একটি অন্যতম লোকউৎসব। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার পুরুলিয়া ও তার সংলগ্ন জেলা এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলায় এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এছাড়া, আসাম, ওড়িষা ও ছত্রিশগড় রাজ্যের আদিবাসী জনজাতিদের মধ্যেও উৎসবটি উদ্‌যাপিত হতে দেখা যায়। মূলত, ভালো ফসলের কামনায় এই শস্যোৎসব পালিত হয়। যার প্রধান আরাধ্য হল বৃক্ষ দেবতার পূজা। উৎসবের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হল গান আর নাচ। যেখানে নারীদের বিশেষ অবদান এবং ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

'জাওয়া-করম' উৎসব প্রধানত গ্রামীণ নারীদের দ্বারা উদ্‌যাপিত লোকপার্বণ। উৎসবের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াকর্মে নারীদেরই মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। প্রধানত কুমারী কন্যাদের দ্বারা উৎসবটি পালিত হলেও, বিবাহিত নারীদেরও নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। এই উৎসবে বিবাহিত নারীরা পিতৃগৃহে আসার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে। ভাদ্র মাস আরম্ভ হতেই সমস্ত নারীর মন উৎসবের আমেজে আনন্দিত হয়ে উঠে। সকলে সমবেত ভাবে আচার-সংস্কার পালনের মধ্য দিয়ে জীবন উপভোগের প্রস্তুতি

নেয়। প্রতিটি পাড়ার কুমারী কন্যারা প্রস্তুত হয় তাদের ঐতিহ্যবাহী রীতি-নীতি পালন করার জন্য।

ভাদ্র মাসের পার্শ্ব একাদশীর দিন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। কিন্তু তার প্রারম্ভিত সূচনা হয় দশ-বারো দিন আগে থেকে। উৎসব পূর্বের কোন এক বিজোড় দিনে পাড়ার সমস্ত কন্যারা একত্রিত হয়ে বাঁশের ছোট 'টুপা' বা ডালা ও বিভিন্ন শস্য বীজ নিয়ে স্থানীয় নদী বা পুকুরে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে তারা স্নান করে, ডালাতে বালি নিয়ে শস্য বীজ বপন করে। তারপর সেই বীজকে রোগ মুক্ত করার জন্য তারা হলুদ জল ছিটিয়ে দেয়। তারপর সেই ডালার চারপাশে শাল কাঠি দেওয়া হয়। তারপর জাওয়া ডালিগুলিকে সকলে এক জায়গায় রেখে একে অপরের হাত ধরে চক্রাকারে আবর্তন করে, আর গান গায়—

"কাঁসাই নদীর বালি-এ জাওয়া পাতাব লো
এমনি জাওয়া উঠে যাবে শাল ধুন্দের পারা লো।"

সকলেই আশা করে তাদের জাওয়ার শস্য হবে 'শাল ধুন্দ' অর্থাৎ শাল গাছের শাখার মতো শক্ত আর মজবুত। এরপর সকলেই তাদের জাওয়া ডালিকে নিয়ে এসে, বাড়ির কোন সুরক্ষিত স্থানে সযত্নে স্থাপন করে। উৎসবের দিন পর্যন্ত এই স্থানে রেখে পরিচর্যা চলে। প্রতিদিন হলুদ জল, হালকা করে গোবরের জল দেওয়া হয়। সব সময় নজর রাখা হয়। শুধু তাই নয় এই সময় কন্যাদেরও কয়েকটি কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হয়। নিয়ম ভাঙলে চারাবীজের ক্ষতি হবে, এই ভয় সব সময় তাদের মনে কাজ করে। এই সময় কুমারী কন্যারা যেন মা হয়ে উঠে, শস্য ডালিটি তাদের কাছে সন্তানসম হয়ে যায়। একটি মা যেমন সূতিকা গৃহে থেকে সন্তানের জন্য সযত্ন হন এবং কঠোর নিয়ম মেনে চলেন, কুমারী কন্যারাও সেই মতো তার জাওয়া ডালিকে নিষ্ঠা সহকারে রক্ষা করে চলে। কন্যাদের কাছে সন্তান পালনের এ যেন এক প্রাথমিক শিক্ষা, যা ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত এক বিশেষ দিক। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কন্যারা তাদের ডালিগুলিকে নিয়ে করম ঠাকুরের পূজা স্থলে উপস্থিত হয়। সেখানে সকলে বৃত্তাকারে ডালি রেখে নিজেরা একে অপরের হাত ধরে গান গেয়ে নাচ করে। একে অন্যের হাত ধরে চক্রাকারে সামনে-পিছনে পা ফেলে, কোমর ঝুঁকে নাচ করে। নাচে কোন বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। খালি গলাতে গান গাওয়া হয়, যে গানগুলিতে নারী সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথাই প্রধানত প্রকাশ পেয়ে থাকে। এই সমস্ত গানগুলির রচয়িতা নারীরাই। সংগৃহীত তিনটি গান উল্লেখ করা হল—

ক. 'উপর ক্ষেতে হাল দাদা নামঅ ক্ষেতে কামিন রে— (২ বার)
কোন ক্ষেতে লাগাবি দাদা কাজল বরণ ধান রে।'

অর্থাৎ, উপর-নিচে কাছাকাছি দুটি ধানের ক্ষেত আছে, দাদাকে জানানো হচ্ছে যে— উপরের ক্ষেতে লাঙল আছে আর নিচের ক্ষেতে ধান লাগানোর কামিন (মহিলা শ্রমিক) আছে। দাদা ঠিক করুক কোন ক্ষেতে লাগাবে কাজলের মতো ধানের চারা।

খ. 'ই বাড়ির ঝিঙা লতটি উ বাড়িকে যায় গো— (২ বার)
দাদার বহু নিমন মুখী ঝিঙা নাই খায় গো।'

অর্থাৎ, 'ই বাড়ির' অর্থ এই ক্ষেতের ঝিঙে লতাটি যেমন অন্য ক্ষেতে আধিপত্য বিস্তার করে, তেমনি দাদার বৌয়ের নিজের বাড়ির ঝিঙে তরকারি পছন্দ না করে অন্য বাড়ির তরকারি পছন্দ করে খাওয়ার চেষ্টা করে।

গ. 'এক দিনকার হলুদ বাঁটা তিন দিনকার বাসি গো— (২ বার)
মা বাপকে বোলে দিবি বড়ই সুখে আছি গো।'

অর্থাৎ, এক দিনের হলুদ বাঁটা তিন ধরে রান্না করে খেতে হয়, এত অভাব সত্ত্বেও স্ত্রী জানিয়েছে মা-বাবাকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয় সে খুব সুখে আছে। নারীর সহন শক্তির কথা এখানে প্রধান ভাবে ফুটে উঠেছে। (উপরোক্ত তিনটি গান গেয়ে শুনিয়েছে— বর্ষা মাহাত, বয়স-১৮, গ্রাম-কুদলুং, পো-ফতেপুর-সিন্দরি, থানা-বরাবাজার, জেলা-পুরুলিয়া। তারিখ-৫/১০/২০১৬)।

এইভাবে পর্যায়ক্রমে সকলে সমবেত গান গায়। গান গাইতে গাইতে রাত হয়ে গেলে, সকলে নিজ নিজ জাওয়া ডালি নিয়ে বাড়ি ফেরে। একাদশীর আগের দিন পর্যন্ত এই ধরণের নৃত্যানুষ্ঠান চলতে থাকে।

একাদশীর দিন হল উৎসবের প্রধান সময়। এই দিন মহিলাদের বিভিন্ন ধরণের ক্রিয়াকর্ম থাকে। বাড়ির বয়স্ক মহিলারা করম পূজার স্থলটিকে গোবর দিয়ে শুদ্ধ ও পরিষ্কার করে দেন। কারণ আজ রাত্রেই তাদের মেয়েরা এখানে উৎসব পালন করবে। কন্যারা সকলে সারাদিন নির্জলা উপবাস তেকে করম ঠাকুরের ব্রত পালন করে। ব্রতীরা সকাল হলে সকলে একত্রিত হয়ে গ্রাম থেকে বহু দূরে চলে যায় বনফুল সংগ্রহের জন্য। তারা সারাদিন ঘরে আসবে না, কারণ ঘরে এলে খাবার খাওয়ার ইচ্ছে জাগবে। তাই ঘরের বাইরেই সারাদিন নাচ-খেল করে সময় অতিবাহিত করে। তাদের ব্রত খুব নিষ্ঠার, কোন পানীয় পর্যন্ত পান করবে না। কারণ, তাদের শেখানো হয়েছে কোন কিছু পান করলেই রাত্রে পূজার সময় তার পূজার প্রদীপ নিভে যাবে। তাই খুব সাবধান, যত কষ্টই হোক অবহেলা করলে চলে না। আজকের দিনটিই উৎসবের শেষ দিন, তাই তারা প্রাণোচ্ছল ভাবে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করে। আনন্দ নিতে গ্রামের যুবকরাও উপস্থিত হয়, তাদের

সঙ্গেও চলে রোমান্টিক রঙ্গ রসিকতা। অবশেষে সন্ধ্যা হয়ে এলে সকলে বন থেকে বিভিন্ন ফুল (বিশেষ করে কেয়া ফুল) নিয়ে বাড়ি ফেরে। ফুলগুলিকে তারা পূজার ডালিতে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে। এছাড়া ডালিতে রাখা হয়— ঘি, মধু, দুর্বাঘাস— সিঁদুর, কাজল, মেথি, হরিতকী, বহড়া ইত্যাদি এবং আর একটি আবশ্যিক উপাদান সবৃন্ত কাঁকুড় বা শশা। যা ব্রতী কন্যাদের কাছে সন্তানের প্রতীক। সকল কন্যাই এই প্রতীক রেখে পুত্র সন্তান কামনা করে এবং শশাটিকে সন্তানের মতো আদর করে। একটু সন্ধ্যা হয়ে এলে গ্রামের লায়া বা পুরোহিত করম ঠাকুরের প্রতীক করম ডাল নিয়ে করম থানে উপস্থিত হন। তিনি করম ডাল পুঁতে সকলকে আসার জন্য ডাক দেন, অবশ্য তার আগেই বাড়ির অন্যান্য মহিলারা এসে পূজাস্থলের সমস্ত কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক করে দেয়। সমস্ত ব্রতীরা পূজার অর্ঘ্য নিয়ে করম ডালের চারদিকে ঘিরে বসে। পূজারির কথা মতো সকলে করম ডালে চালের গুঁড়ির আর সিঁদুরের টিপ দেয়। আদরের সন্তানসম শশাতে কাজলের টিপ দেয়। ঘি, গুড়, মধু, ফুল করম ঠাকুরের চরণে উৎসর্গ করা হয়। সঙ্গে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হয়, এই প্রদীপ নিভে গেলে অশুভ লক্ষণ মনে করা হয়। তাই পূজাতে খুব নিষ্ঠা রাখতে হয়। এই প্রদীপ করম ডালের তলায় রেখে, সেই ডালকে সকলে কোলাকুলি করে। সকলে সন্তানসম শশাটিকে ডালের নিচে রেখে ভবিষ্যত জীবনের সুখ শান্তি ও সুস্থ সন্তানের কামনা করে। পূজা শেষ হওয়ার পর পাড়ার কোন বয়স্ক ব্যক্তি সমস্ত ব্রতীদের 'ধরমু ও করমু'র লোককাহিনি শোনান। সকলেই এক মনে তা শোনে। মাঝে মাঝে গল্পকার বলে থাকেন— 'ফুল দাও— পার্বতীরা— ফুল দাও', তৎক্ষণাৎ 'পার্বতী' বা ব্রতীরা করম ডালের দিকে ফুল ছুঁড়ে দেয় আর প্রণাম করে। গল্পকার কাহিনি বলে যেতে থাকেন, আর মাঝে মাঝে ফুল দিতে বলেন। এতে তিনি যাচাই করেন কাহিনির প্রতি ব্রতীদের একাগ্রতা। অবশেষে, কাহিনি শেষ হয়ে আসে; সকলকে নির্দেশ দেওয়া হয় পরের দিনে সকালে পান্তা (বাসি) ভাতের পান্না করতে। সকলে বাড়ি ফিরে, আজকের রাত্রে ভাত বা অন্ন জাতীয় কিছু খাওয়া নিষিদ্ধ; তাই সকলে সুজি-ছোলা বা 'সাঁওয়া' (দানা জাতীয় শস্য) খেয়ে, করম দেবতার স্মরণ করে রাত কাটায়।

দ্বাদশীর সকালে সকল ব্রতীরা তাদের ডালা নিয়ে পূজাস্থলে উপস্থিত হয়। সেখানে সকলে সমবেত ভাবে শেষ বারের মতো জাওয়া ডালি ঘিরে নৃত্য-গীত করে। তারপর সকলে ডালা ভর্তি চারা উপড়ে ফেলে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে ছড়িয়ে দেয়। ধানের গোলা, গোবরখাল, তুলসী মঞ্চ, প্রতিটি বাড়ি, বাড়ির সামনে সবজি ক্ষেত ইত্যাদি স্থানে দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য হল শস্য কামনা ও রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি। এরপর সকলে ঝিঙে পাতা, শাল দাঁতন, তেল, হলুদ ইত্যাদি নিয়ে পুকুর ঘাটে উপস্থিত হয়। সেখানে স্নান করে ঘাটের

উপরে পূর্বদিকে মুখ করে পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে তিনটি বা পাঁচটি ঝিঙে পাতাতে তেল-হলুদ ও দাঁতন উৎসর্গ করা হয়। তারপর সেই পাতাগুলিকে সকলে প্রণাম করে আবার সুন্দর করে স্নান করে, ধানক্ষেত থেকে একটি তিন বা পাঁচ শাখা যুক্ত ধানগাছি নিয়ে বাড়িতে আসে। বাড়ির একটি নির্দিষ্ট জায়গায় চালের গুঁড়ি দিয়ে বর্গাকার ক্ষেত্র আঁকা হয়, সেখানে সূর্যসহ বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের চিত্র অঙ্কন করা হয়। যা সূর্যদেবের প্রতীক হিসেবে পূজিত হয়। সেই স্থানে ধানগাছিটিকে রাখা হয়, তার মূল অংশটিকে গুঁড়ি ও সিঁদুর দিয়ে সাজিয়ে পূজা করা হয়। এরপর সেই স্থানে তিনটি কচু পাতা রেখে বাসি ভাতের পান্না করা হয়। একটি পাতে চিল আর একটি পাতে শকুনিকে খাবার দিয়ে অশুভ শক্তিকে সন্তুষ্ট করা হয়। অন্য একটি পাতে ব্রতী নিজে ভাত খেয়ে করম ব্রত সমাপ্ত করে। পূজার সমস্ত সামগ্রী পুকুরের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ধানগাছিটিকে কোন গোপন স্থানে বা ক্ষেতের নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দেওয়া হয়। সকলের বিশ্বাস এই ধানের চাল বা ভাত খেলে সকলেই খুব শক্তিশালী হয়। মোরগকে খাওয়ালে সে প্রতিযোগিতাতে বিজয়ী হয়। এইভাবে শেষ হয় করম ব্রত অনুষ্ঠান ও উৎসব। এই দিন পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, সিংভূম ইত্যাদি জেলার বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে, সে মেলাগুলিতে নারীরা যোগদান করে উৎসবের আনন্দ নেয়।

উৎসবের প্রধান অঙ্গ হল জাওয়া গান আর নাচ। জাওয়া গানগুলির মধ্য দিয়েই নারী মনের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনা ও আত্মপরিচয় ফুটে উঠে। নারী তার অব্যক্ত কথাকে সকলের সামনে গানের মধ্য দিয়ে তুলে ধরে। এই গান শুধুমাত্র নারীদের দ্বারাই রচিত ও গীত হয়, সেখানে পুরুষের কোন স্থান নেই। তাই গানের মধ্য দিয়ে নারী তার দৈনন্দিন জীবনের কথাই প্রধান ভাবে ব্যক্ত করে থাকে। জীবনের হতাশা বিধুর দুঃখ-যন্ত্রণার কথাই গানের মূল সুরে ধ্বনিত হয়। তাই গান প্রসঙ্গে 'ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য' গ্রন্থের রচয়িতা ডঃ বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত বলেছেন— "জাওয়া গান তাই নারী সমাজের দৈননন্দিন জীবন-চর্যার বেদনা-মধুর ভাষ্য। সুখের কথার চেয়ে দুঃখের কথাই যেন এ গানের মূল উপজীব্য।" (বাণীশিল্প, ২০০০, পৃষ্ঠা-৬০) গানের বিষয়ে চাষবাস, বন-জঙ্গল, আচার-অনুষ্ঠান, ঘর-সংসার যতখানি এসেছে, তার থেকে অধিক এসেছে নারী জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা, হিংসা-দ্বেষ আর প্রেম-ভালোবাসা, বধূ নির্যাতন, শ্বশুর ঘরের যন্ত্রণা ও সতীন সমস্যার কথা। নারীরা গান গেয়ে নাচ করে, এই নাচ এলাকায় 'পাঁতা নাচ' নামে পরিচিত। পঙক্তি বা সারিবদ্ধ ভাবে নাচ হয় বলে এই নামকরণ। অন্যান্য দিনে না হলেও উৎসবের দিনে বিবাহিত-অবিবাহিত মহিলারা একত্রিত ভাবে নাচ-গান করে। এই দিন সকলে অবাধ স্বাধীনতা পায়। তাই এই দিনের উৎসবে যোগদানের জন্য বিবাহিত নারীদের মন

ব্যাকুল হয়ে উঠে। তাদের মনে পড়ে যায় বাল্য জীবনের কথা— বাল্য সখীদের কথা। সকলে বাপের বাড়ি আসার জন্য উৎসুক হয়। বিবাহিত নারী তার স্বামীকে গানের সুরে বলে—

"পড়িল ভাদর মাস— লাগিল নৈহরের আশ।
দিনা-চারি সঁঞা যাবত নৈহর গো।"

অর্থাৎ, ভাদ্র মাস পড়ে গেছে, বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য মনে আশা জেগেছে। চার দিনের জন্য বাপের বাড়ি যাবোঁ গো। ('নৈহর' = বাপের বাড়ি)

নারী আবদার জানায় এই মাসে তাকে যেন আটকে না রাখা হয়, অন্য মাসে যেতে না দিলেও— এই মাসে তাকে যেন যেতে দেওয়া হয়। নারীর মনে পড়ে ছোটবেলার বন্ধু, ভাই-বোন-দাদাদের সঙ্গে কত খেলার মজার ঘটনা। ভাই-বোনের অন্তরঙ্গতার ছবি জাওয়া গানে ফুটে উঠে। দিদি ভাইয়ের বর্তমান অবস্থা স্মরণ করে গান গায়—

"ভাই আমার দুধের সর হাল বাইতে যায় রে—
হালের বোঁটা ছাড়ে দিয়ে বউ আনতে যায় রে,
বউ আনতে গেলি ভাই বউয়ে জবাব দিল রে—
ভায়ের আমার ভাঙা কপাল বউয়ে জবাব দিল রে।"[১]

অর্থাৎ, দিদির কাছে ভাই খুব আদরের— দুধের সরের মতো, সে লাঙল চালানো ছেড়ে দিয়ে বৌ আনতে যায়। কিন্তু বৌ ভাইকে উপযুক্ত জবাব দিয়ে ফেরত পাঠায়।

ভাইয়ের প্রতি দিদির মন করুণাতে ভরে উঠে। নারী বাপের বাড়িতে আসে, সেখানে ছোট-বড়ো সঙ্গী-সাথি সকলের সঙ্গে একত্রিত হয়। না বলা, অব্যক্ত কথাগুলি গানের মধ্য দিয়ে ফুলঝুরির মতো প্রকাশ পায়। এত দিন ধরে চেপে থাকা কথাগুলি, যন্ত্রণার দিনগুলি, একে-অপরের কাছে গানের সুরে ব্যক্ত করে। বিবাহিত নারীরা তাদের শ্বশুরঘরের কথাই প্রধান ভাবে বলে থাকে। স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি আর ননদ— সতীনদের অত্যাচার ও অবহেলিত জীবনের কথা প্রকাশ করে। সেই নারী যদি পুত্রবতী না হয়, তাহলে তার উপর লাঞ্ছনা আর গঞ্জনার শেষ থাকে না। উঠতে-বসতে প্রতি পদক্ষেপে কথা শুনতে হয়। বাড়িতে দ্বিতীয় স্ত্রী এলে সৃষ্টি হত সতীন সমস্যা। সতীনদের দুঃখ দুর্দশা শেষ হত না। অতীতে শ্বশুরঘরে এই সতীন সমস্যা এক গুরুতর সমস্যা ছিল। একে-অপরকে মারামারি করতেও পিছুপা হত না। গানে সে কথাও ব্যক্ত হয়ে উঠে—

"আম পাতা চিরিচিরি নৌকা বেনাব
কাঁসাই নদী দামোদর হেলক পাইরাব,

তাই বলে কি সতীনের মার খাব লো।"[২]

অর্থাৎ, আমের পাতা ছোট ছোট করে কেটে নৌকা বানিয়ে কাঁসাই, দামোদর নদী পার হয়ে যাবো, তাও সতীনের মার খাবো না। এখানে অসহ্য যন্ত্রণা থেকে নারী মুক্তি চেয়েছে। নারী তার জীবনকে তুচ্ছ মনে করে। এই পৃথিবীতে নিজেদের মূল্যহীন মনে করে। শুধুমাত্র পরের ঘরে দাসত্ব সয়ে জীবন কাটানো ছাড়া আর কোন সার্থকতা খুঁজে পায়না। তাই গানের মধ্য দিয়ে বলে—

"বনে ফুটে বন তিলা ফুল, বনকে করে আলো লো—
বিটি ছায়ের মিছাই জনম, পরের ঘরের আলা লো।"[৩]

অর্থাৎ, বনের তিলা ফুল বনকে সুশোভিত করলেও, নারীরা তার শ্বশুর বাড়িকে সুন্দর করতে পারে না। পরের ঘরে অবহেলিত দাসী হিসেবেই জীবন অতিবাহিত করতে হয়। বাপের বাড়িতে এসেও তারা শান্তি পায় না। যে ঘরটিতে সে এতদিন আনন্দ করেছে, ঘুমিয়েছে, সেই ঘরই আজ দাদার বৌ দখল করে বসেছে। সে নিজেই আজ সে ঘরে ঢুকতে পারছে না। অভিমানে নারী সখীদের কাছে গান গায়—

"চাঁদমনি সূরযমনি গেল শ্বশুর ঘর লো—
দাদার বহু হাবলামুখী লিল কোঠা ঘর লো।"[৪]

(বহু = বৌ, হাবলামুখী = লম্বা মুখ, লিল = নিয়েছে, কোঠা ঘর = মূল বাড়ি) অভিমান যায় না, বৌয়ের কর্মে অপটুতা ও খারাপ স্বভাব দেখে ননদ গানে ব্যক্ত করে—

"দু দুয়ারে দুটা পাখ শুঁই শুঁই করে গো
দাদার বহু ঢনঢনি পড়াই খাতে খুঁজে লো।
পুড়তে যে দিলি বহু কাড়তে যে লাললি গো
গাছের কাপড় মাথায় নিয়ে লোক ডাকতে গেলি লো।"[৫]

অর্থাৎ, দাদার বৌ খুব খাদ্যান্বেষী (ঢনঢনি), খাবার খুব তাড়াতাড়ি পুড়িয়ে খেতে চায়। পুড়তে দিয়ে আবার উনান থেকে বের করতে পারে না, লোক ডেকে বেড়ায়। এতটাই সে অদক্ষ। ঘরের বৌ-ও ছেড়ে কথা বলে না, তার ননদ যে এখন তার শ্বশুর বাড়ির প্রধান শত্রু হয়ে উঠছে; সে কথা বধূ তার গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে—

"ঘরের বাদী ননদিনী ট্যাঁড়ের বাদী পর গো—
যমুনা ঘাটের বাদী শ্যাম নটবর গো।
গুঁদলু কুটি হুকুড় হুকুড় ছইলকে উঠে চাল গো—
ননদ মাগী ঘরে বাদী না করিল কাজ গো।"[৬]

(বাদী = শত্রু, ট্যাঁড় = মাঠের বা বাইরের, গুঁদলু = দানা জাতীয় শস্য, হুকুড় = আওয়াজ)। (উপরোক্ত ছয়টি গান মঞ্জুশ্রী মাহাত-এর কাছ থেকে সংগৃহীত, গ্রাম-লিকি, থানা-বান্দোয়ান, জেলা-পুরুলিয়া, বয়স-২২, তারিখ-২৫/০৯/১৬)।

পারিবারিক গৃর্হস্থের নির্যাতিতা নারীদের কথা ছাড়া, কিছু ইতিবাচক স্বামী-স্ত্রীর গভীর ভালোবাসার কথাও জাওয়া গানে ফুটে উটেছে। নিচের গানটিতেই তার প্রমাণ মিলে—

"হামার বঁধূ হাল বাহে কেঁদকানালীর ধারে
গরা গায়ে ধরা লাগে
দেখে পরান ফাটে ও ননদ লো
হামি যাব নিজেই বাস্যাম দিতে।।"

অর্থাৎ, এক বিবাহিত নারী তার স্বামীর উদ্দেশ্যে গান গাইছে। তার স্বামী (বঁধূ) কেঁদকানালীর (ক্ষেতের নাম, যে মাটির জল ধারণ ক্ষমতা স্বল্প) ক্ষেতে লাঙল দিচ্ছে। তাঁর পরিষ্কার শরীর জুড়ে রোদে ঘাম ঝরে পড়ছে, তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। স্ত্রী ননদের উদ্দেশ্যে বলেছে, তোমাকে সকালের খাবার (বাস্যাম) নিয়ে যেতে হবে না, আমি নিজেই নিয়ে যাবো।

অভাব, দারিদ্র্যের মধ্যেও স্বামী-স্ত্রীর অকৃত্রিম ভালোবাসা গ্রাম বাংলার জনজীবনেই গড়ে উঠে। স্ত্রী স্বামীর একটু কষ্ট সহ্য করতে পারে না। সে তার সব সময়ের সহযোগী ও সহভোগী হয়ে তাঁকে আগলে রাখতে চায়। কখনো যদি স্বামী পরকীয়া প্রেমে আকৃষ্ট হয়, তাহলে স্ত্রীর বুক বেদনায় দীর্ণ হয়ে যায়। সব সময় সে কেঁদে চলে, তার কান্না গানের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে—

"ভাদর মাসের গাদর জনার খলাই দিলে ফুটে গো—
মন মাইরি দিবা নিশি প্রাণ কাঁদে উঠে গো।"

(গাদর জনার = সুপক্ক ভুট্টা, খলাই = মাটির পাত্র)

পরকীয়া প্রেমের কথাই নয়, নারীর শুদ্ধ প্রেমের কথাও জাওয়া গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে থাকে। নারী তার প্রেমিক পুরুষকে কখনো ছাড়তে চায় না। সারা জীবন তার সঙ্গেই ঘর করতে সে প্রস্তুত হয়। তার প্রেমিকের গলা জড়িয়ে তাই সে গান গায়—

"তুমি তরু হামি লতা
রাখিব বেধিঁয়ে হে

যাও দেখি কথা যাবে
হামারে ছাড়িঞ হে।।"

অর্থাৎ, নারী তরু-লতার মতো প্রেমিকের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায়। প্রেমিকও সেই মতো তাকে কথা দেয়। তার সঙ্গে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। গ্রাম বাংলার এই লৌকিক প্রেম জাওয়া গানে চমৎকার ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বাল্যপ্রেমের কথাও কখনো কখনো নারীর মনে উঁকি দেয়, তা সত্ত্বেও সে অতীত ভুলে বর্তমানকে আঁকড়ে ধরে জীবন অতিবাহিত করতে চায়। দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে বাস্তবিক প্রেমই তাদের কাছে মধুর হয়।

এছাড়া নারীমন বাৎসল্য রসে ভরপুর। নিজের সন্তানের দুঃখ-কষ্ট যে যেমন সহ্য করতে পারে না, তেমনি অন্য কোন ছেলের কান্নাও তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠে। একটি ছেলের কান্না দেখে নারী গান গেয়েছে—

"আ'খ বাড়ির ধারে ধারে কাহার ছাল্যা কাঁদে গ
আস ছাল্যা কলে লিব বড় দয়া লাগে।"

অর্থাৎ, আখ ক্ষেতের ধারে কার ছেলে কাঁদছে, ছেলে এস তোমায় আমি কোলে নিব, আমার খুব দয়া হচ্ছে।

নারী মনের এই ধরণের বহু আন্তরিক কথা জাওয়া গানগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে নারীর আত্মপরিচয় স্বতঃস্ফূর্ত ও অকুণ্ঠভাবে বাণীরূপ পেয়েছে। আদিবাসী নারী মনের সামগ্রিক চিন্তা-চেতনা, সৃষ্টিশীলতা, বঞ্চনা ও প্রাপ্তি জাওয়া গান এবং জাওয়া উৎসবের মধ্য দিয়েই বিশেষভাবে পরিচয় লাভ করে। তাই প্রাবন্ধিক ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত বলেছেন— "নারীসমাজকে তার সামগ্রিক ভাবনার ক্ষেত্রে একযোগে কোথাও পেতে হলে জাওয়া গানের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।" এই গান এবং উৎসব হল জঙ্গল ঘেরা জেলাগুলির ঐতিহ্যবাহী নারী সংস্কৃতির এক বিশেষ দিক এবং বিশেষ পরিচয়।

তথ্যসূত্র

১. ভট্টাচার্য, তরুণদেব, 'পুরুলিয়া', ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৯
২. মান্ডি, কলেন্দ্রনাথ, 'সাঁওতাল পূজো-পার্বণ', খেরওয়াল প্রকাশন, সাঁতরাগাছি, হাওড়া, অক্টোবর, ২০০৮

৩. মাহাত, ড. নিমাই কৃষ্ণ, 'মানভূমের কৃষিসংস্কৃতি', নলেজ ব্যাঙ্ক পাবলিশার্স এন্ড ডিস্ট্রিবিউটরস্, ৪১-বেনিয়াটোলা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৫, জানুয়ারি, ২০১৭
৪. সম্পাদনা— সেন ও মাহাত, শ্রমিক ও কিরীটি, 'লোকভূমি মানভূম', বর্ণালী-৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, এপ্রিল, ২০১৫
৫. সিকদার ও কিস্কু (অনুবাদ-সম্পাদনা), সুকুমার ও সারদাপ্রসাদ, 'খেরওয়াল বংশা ধরম পুঁথি' নির্মল বুক এজেন্সি, ৮৯-মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭, তৃতীয় সংস্করণ নভেম্বর, ২০০৭
৬. গোস্বামী, দিলীপ কুমার, 'সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি', পারিজাত প্রকাশনী, বিদ্যাসাগর পল্লী, পুরুলিয়া
৭. করণ, ড. সুধীর কুমার, 'সীমান্ত বাংলার লোকযান', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় সংস্করণ— পৌষ, ১৪০২
৮. মাহাত, ড. বঙ্কিমচন্দ্র, 'ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য', বাণীশিল্প, ২০০০

সাক্ষাৎকার

শ্রীমতী শকুন্তলা মাহাত, বয়স-৫০, গ্রাম-মধুপুর, পো-জিতান, জেলা-পুরুলিয়া, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ।

পুরুলিয়ার টুসু পরব : একটি পর্যালোচনা

সাবিনা খাতুন

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলা পুরুলিয়া। জেলার লোকসমাজ 'বারো মাসে তেরো পার্বণে' লেগেই আছে। জেলার নর-নারীরা সারা বছরই কোন না কোন উৎসব-পার্বণ উপলক্ষ্যে আনন্দে মেতে ওঠেন। বিশেষ করে সমাজের নারীদের ভূমিকা উৎসব-পার্বণ গুলিতে এক অন্য মাত্রা এনে দেয়। পার্বণ উপলক্ষ্যে নারীরা কখনো মৌখিক ভাবে গান করেন, কখনো ছড়া কাটেন, আবার কখনো নাচ করেন। পুরুলিয়া জেলার অন্যতম উৎসব 'টুসু পরব'। এলাকার জনগণের কাছে পরবটি 'পৌষ পরব', 'মকর পরব', 'পিঠা পরব' নামেও পরিচিত। কেউ কেউ বলেন টুসু হলেন শস্যের দেবী। অগ্রহায়ণ মাসে চাষির খামার ফসলে পরিপূর্ণ হয়, তারপর অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির সন্ধ্যায় এই উৎসবের আরম্ভ, পৌষ সংক্রান্তিতে টুসু ভাসানের মধ্য দিয়ে পরবটি শেষ হয়। অঘ্রাণ সংক্রান্তির সন্ধ্যাবেলা গ্রামের মেয়েরা দলবেঁধে পাড়ার কোন এক বাড়িতে টুসু পাতায়। কুলুঙ্গির মধ্যে মাটির সরাতে চালগুঁড়ি, দুর্বাঘাস, সিঁদুরের টিপ, হলুদের টিপ, বাসক ফুল, গাঁদা ফুল, ইত্যাদি রেখে টুসু পাতায়। পৌষমাসের প্রতিদিন সন্ধ্যায় একটি করে ফুল দিয়ে থাকেন তারা টুসুকে। পাড়ার মেয়েরা প্রতিদিন সন্ধ্যার পর যে বাড়িতে টুসু পাতায় সেখানে সকলে দলবেঁধে যায় এবং টুসুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকার গান করেন। শুধু মেয়েরাই নয়, বাড়ির বৃদ্ধা, বিবাহিতা, ও কিশোরীরাও এই গানে অংশগ্রহণ করেন। একটা দলে থাকেন বারো-তেরো জন। কখনো একক ভাবে, আবার কখনো সকলে মিলে টুসু গান করেন। নারী মনের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের গানে সন্ধ্যাকালীন পরিবেশ সংগীতময় হয়ে উঠে—

> "টুসুকে ঘিরে যে সান্ধ্য পরিবেশটি গড়ে উঠে, সে পরিবেশটি সীমান্তবাঙলার ভূ-প্রকৃতি ও জনপ্রকৃতির সঙ্গে একটি মধুর সাদৃশ্য রচনা করে। মিটমিট করে মাটির প্রদীপ জ্বলছে টুসুর পাশে। মেয়েদের পাশে কেরসিন তেলের ডিবি। তার

কালো শিখা উপরের দিকে ঠেলে ঠেলে উঠছে। হয়ত বা চাঁদের আলোই কোন কোন ক্ষেত্রে আলোকশিখার প্রয়োজনকে দূরে সরিয়ে দিয়ে উপভোগ করছে টুসু গানের মিঠে সুর।"[১]

টুসু গানে সমকালীন রাজনীতির বিষয় যেমন উঠে আসে তেমনি সমাজের বিভিন্ন বিষয়গুলিও উঠে আসে। যেমন— বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, বধূনির্যাতনের মত বিষয়গুলি টুসু গানে দেখা যায়। চলতি বছরে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী প্রভৃতি বিষয়গুলি টুসু গানের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছিল। এছাড়া পারিবারিক অভাব-অনটন, প্রেমের গান, বিরহের গান টুসু গানে দেখা যায়।

মানভূমের বঙ্গভুক্তি আন্দোলনে ১৯৫৪ সালে যে টুসু সত্যাগ্রহ হয়, সমকালীন সমাজের একটা বৃহত্তর অংশে তার প্রভাব পড়েছিল। বিহার সরকার মানভূমবাসীকে জোর করে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বিহার সরকারের নিপীড়নের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তৎকালীন মানভূমের সাংসদ ভজহরি মাহাত টুসু গানের মধ্যে দিয়ে। ভজহরি মাহাতর স্বরচিত টুসু গানে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর তীব্র হয়ে উঠেছিল—

"শুন বিহারী ভাই
তোরা রাইখতে নারবি ডাঙ্গ দেখাই।
তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি
বাংলা ভাষায় দিলি ছাই।"[২]

পারিবারিক অভাব অনটনের চিত্রও টুসুগানের সুরে ভেসে ওঠে—

"বাপে মায়ে বিহা দিল
ভালো শ্বশুর ঘর দেইখে
জনম গেল মাড় খাইতে
(হামি) রহিব কেমন কর্যে।"[৩]

এই টুসু পরবে মেয়েরা বাপের বাড়িতে আসতে না পারলে তাদের ব্যথিত হৃদয় গেয়ে ওঠে—

"আমার মন কেমন কর্যে
যেমন শোল মাছে উফাল মার্যে।"

সংক্রান্তির কয়েকদিন আগে থেকেই টুসু পরবের আয়োজন শুরু হয় পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে। পৌষ সংক্রান্তির আগের দু'দিন হয়— চাঁউড়ি ও বাঁউড়ি, সংক্রান্তিতে মকর ও পরের দিন আখানযাত্রা। চাঁউড়ির দিন গ্রামের মেয়েরা গোবর মাটি দিয়ে ঘর পরিস্কার

করেন, প্রতিটি গৃহে ঢেঁকি দ্বারা চালের গুঁড়ি তৈরি করা হয়। বর্তমানে মেশিনেও কেউ কেউ গুঁড়ি তৈরি করেন। বাঁউড়ির দিন প্রতিটি বাড়িতে বিভিন্ন ধরণের পিঠে হয়— গড়গড়্যা পিঠা বা উঁদিপিঠা, পাটিসাপটা ইত্যাদি। উঁদি পিঠে দেখতে অনেকটা অর্ধচন্দ্রের মত। এদিন রাতে হয় টুসু জাগরণ। জাগরণের রাতে সারারাত জেগে মেয়েরা টুসু গান করেন। পালা করে চলতে থাকে টুসু গান। সকালবেলা টুসুকে নিয়ে দলবদ্ধভাবে গান গাইতে গাইতে পুকুরে বা নদীতে উপস্থিত হয়। জেলার একাধিক নদী ও জলাধারে টুসু ভাসানো হয়— কাঁসাই, শিলাই, কুমারী ও সুবর্ণরেখা নদীতে এবং পুটিয়ারী জলাধার, মুরগুমা জলাধার প্রভৃতি স্থানে। সীমান্তবাঙলার নরনারীরা টুসুকে দেবী রূপে নয়, কন্যা রূপে দেখেন। দীর্ঘ একমাস টুসুকে বাড়িতে রাখার পর সংক্রান্তির ভোরবেলা টুসু ভাসানের সময় নারী কণ্ঠে শোনা যায় ব্যথিত সুর—

"তিরিশ দিন যে রাখলি টুসু তিরিশটি ফুল দিয়ে গো
আর রাখিতে লারব টুসু মকর আল্যো চলে গো।"

সংক্রান্তির এই দিনটিকে বলা হয় 'মকর'। এদিন টুসু ভাসানোর পর সকলেই কনকনে ঠাণ্ডায় নদীতে বা পুকুরে মকর ডুব দিয়ে থাকে। পৌরাণিক মতে এইদিন সূর্য ধনুরাশি থেকে মকর রাশিতে প্রবেশ করে। তাই এই দিনটির নাম 'মকর সংক্রান্তি'।

সংক্রান্তির পরদিন অর্থাৎ পয়লা মাঘ আখ্যান। এদিন কৃষিবর্ষের আরম্ভ হয়। সেদিন থেকে সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু হয়। আদিবাসী কুড়মীরা এই দিনটিকে বছরের প্রথম দিন হিসেবে পালন করেন। এই দিনটিতে তারা যে কোন শুভ কাজ সেরে ফেলেন। কুড়মীরা এদিন 'গ্রাম ঠাকুরের' পূজো দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়।

টুসু বিসর্জনের দিন প্রতিটি দলে থাকে একটি করে চৌডল। সাধারণত চৌডলগুলি দেড়-দুই ফুট থেকে শুরু করে আট-দশ ফুট পর্যন্ত হয়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে চৌডলগুলি আকারে বেশ বড় ও রংবাহারি হয়। চৌডলটি বাঁশ, রঙিন কাগজ, রঙিন পুঁতির মালা দিয়ে তৈরি হয়। কাঠামোটি চতুষ্কোণ আকৃতির এবং উপরের দিকটি মন্দিরের চূড়ার মত হয়। ছোট আকারের চৌডলের দাম প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা। আট-দশ ফুটের চৌডলের দাম ৩০০০ টাকা পর্যন্ত হয়। সকলের পক্ষে এত টাকা খরচ করে চৌডল কেনার সামর্থ্য থাকে না, তাই অনেকে কম খরচে নিজেরা বাড়িতে তৈরি করেন।

টুসু পরবে মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদের ভূমিকা রয়েছে। জাগরণের রাত থেকে টুসু বিসর্জন পর্যন্ত টুসু গানে মেয়েদের সঙ্গ দেন ছেলেরাও। টুসু গানের আসরকে আরও আর্কষণীয় করতে ছেলেরা বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্র— ধামসা, মাদল, বাঁশি ইত্যাদি বাজান।

টুসু পরবকে কেন্দ্র করে সংক্রান্তির দিন জেলার একাধিক জায়গায় মেলা হয়। তবে অধিকাংশ জায়গায় মকর ও আখ্যান দিনে মেলা হয়। মেলাগুলিতে লক্ষ লক্ষ জনগণের সমাগম ঘটে। সমগ্র পুরুলিয়াবাসী উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠেন। এই মেলা হয়ে ওঠে মিলন মেলা। শিলাই তীরে মেলা হয় সাতদিন, হুড়া থানার মাগুড়িয়া গ্রামের বড় পাহাড়ে মেলা হয় দুইদিন, পুটিয়ারি ড্যামে মেলা হয় একদিন, কাঁসাই নদীতে পৌষ পরব উপলক্ষ্যে মেলা হয় একদিন। এছাড়া ঝালদা থানার তুলিন, জয়পুর, আড়ষার দেউলঘাটা মন্দিরেও সেদিন টুসু মেলা হয়। এখানকার জনজীবনে টুসু উৎসব দুর্গাপূজার চেয়েও বেশি জাঁকজমক ভাবে পালিত হয়। মেলাগুলিতে টুসু গানের প্রতিযোগিতা, চৌডল প্রতিযোগিতা হয়। কোন কোন টুসু মেলায় মোরগ লড়াই হয়ে থাকে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রতিযোগিদের পুরস্কৃত করা হয়।

মানভূমের বঙ্গভূক্তির পূর্বে বঙ্গসংস্কৃতির একটা বড় জাতীয় উৎসব ছিল এই ‘টুসু পরব’। বঙ্গে অন্তর্ভুক্তির পর এই উৎসব সীমান্ত অঞ্চলে এখনোও জাতীয় উৎসব হিসেবে পালিত হয়। টুসু গানে সমসাময়িক সমাজের সমস্যাগুলো উঠে এসেছে। লোকসাহিত্যের একটা বিশেষ দিক হয়ে উঠেছে টুসু গান। টুসু গান ও টুসু পরবের সম্ভাবনাময় দিকগুলিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে—-

১. লোকসমাজে এই উৎসব আজও বহমান। জেলার সর্বস্তরের মানুষ এতে উৎসাহ উদ্দীপনায় অংশগ্রহণ করেন।

২. জেলার অন্যতম লোকগান হল টুসু গান। সংখ্যায় কম হলেও জেলার লোকশিল্পীরা এখনো টুসু গান বাঁধেন।

৩. সরকারের আর্থিক সংহায়তায় লোকশিল্পীরা সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচীর কথা টুসু গানের মধ্য দিয়ে প্রচার করেন। যা টুসু গানের জনপ্রিয়তার পরিচায়ক।

টুসু উৎসবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলা যেতে পারে—

১. নতুন প্রজন্মের কাছে টুসু পরবের তাৎপর্য ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরে তার জৌলুসকে বজায় রাখতে হবে। নতুন প্রজন্মকে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিতে হবে।

২. সাম্প্রতিক কালে নারী শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে টুসু গানে শিক্ষিত মেয়েদের অংশগ্রহণ কমে যাচ্ছে, যা উদ্বেগের বিষয়। নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা মনে রেখে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। লজ্জা নয়, টুসু গানকে জীবনের গান হিসেবে গ্রহণ করার ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে হবে।

৩. কবি-শিল্পীদের আরো বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে। বিকৃতি নয়, সঠিক ভাষা, ভাব ও সুরকে বজায় রাখতে হবে।

৪. সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে।

অতীতের গৌরবময় টুসু গান ও মেলার ঐতিহ্যকে বজায় রেখে এই অঞ্চলের জাতীয় উৎসবকে উজ্জীবিত করতে হবে। নইলে ক্রমশ ফিকে হতে হতে কালের নিয়মে টুসু পরব হয়তোবা একদিন একটি নিয়ম রক্ষার দিনে পরিণত হবে। সেদিন যাতে না আসে টুসুর কাছে সেই প্রার্থনা জানাই।

তথ্যসূত্র

১. সুধীর কুমার করণ, 'সীমান্ত বাঙলার লোকযান', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ.-১৭২

২. শ্রমিক সেন ও কিরীটি মাহাত সম্পাদিত, 'লোকভূমি মানভূম', বর্ণালি পাবলিশিং, কলকাতা, ১ম সংস্করণ ২০১৫, পৃ.-৪৭৪

৩. তদেব, পৃ.-৪৬৯

৪. দিলীপ কুমার গোস্বামী, 'সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি', পারিজাত প্রকাশনী, পুরুলিয়া, ১ম প্রকাশ ২০১৪

৫. শিবশঙ্কর সিং, 'পুরুলিয়ার লোকমেলা', নলেজ ব্যাঙ্ক পাবলিশার্স এ্যান্ড ডিসট্রিবিউটরস্, পুরুলিয়া, জানুয়ারি, ২০২১

ঋণ স্বীকার :

অর্চনা মাহাত-রাহেরডি (হুড়া)। সমর কালিন্দী-বানজোড়া (বরাবাজার)।

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 13. October, 2021

লোকশিল্পে ‘Singing Bowls’ (সাদা বাটি) প্রসঙ্গ বাঁকুড়া জেলা

সুমন্ত মন্ডল

সারসংক্ষেপ : কোন একটি অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি চর্চায় লোকশিল্পের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কারণ লোকশিল্পে ধরা থাকে সেই অঞ্চলের লোকসমাজের সহজ সরল জীবনযাপন এর রূপরেখা। অর্থাৎ লোকশিল্পের পরম্পরা মধ্যে নিহিত থাকে তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য। অতীত ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রভাস সেন লিখেছিলেন— “ঐতিহাসিক যুগ থেকে যেসব আদিম অনুভূতি রূপকল্পনা ক্রমশ আহরিত ও পরিশীলিত হয়ে লোকশিল্পের প্রতিরূপ এর আকারে পরিণত হয়েছে, আজকের পৃথিবীতে ও নানা লোকসংস্কৃতির সৃষ্ট শিল্পকর্মের তাদের বহু রূপকল্প-এর শিল্পীর রসোউপলব্ধির প্রসাদগুণে বিশ্বজনীন।”[১]

লোকশিল্প সামাজিক মানুষের সমষ্টি ভাবনায় প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় কাঁসা শিল্পে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কাঁসা শিল্পের প্রসার লক্ষ্য করা যায়। বাঁকুড়ার পুখুরিয়া, মগরা, হেলনা, কেঞ্জাকুড়া, চাবড়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে, এছাড়া পুরুলিয়ার বিভিন্ন স্থানে, পশ্চিম মেদিনীপুরের রাজমজীবনপুরে, মুর্শিদাবাদের খাগড়া, কান্দি, জঙ্গিপুরে এই শিল্পের উৎকর্ষতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তবে পুখুরিয়া গ্রামের কাঁসার জামবাটি (Singing Bowls) কারিগরদের নির্মাণে এই জামবাটি উন্নতমানের হওয়ার জন্য এই শিল্পের উৎকর্ষতা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যা Meditationএর কাজে লাগছে। বিশ্বের দরবারে এর চাহিদা শিখরে রয়েছে।

সূচক শব্দ : কর্মকার, জামবাটি, গড়নদার, বিদেশ, শাল, মজুরি, মহাজন।

লোকপ্রতিভার ও লোককর্মের অভিজ্ঞান লোকসংস্কৃতির নানা ধারা উপধারা তে বিদ্যমান। এই ধারার এক অপরূপ প্রকাশ লোকশিল্প। লোক শিল্প হল “লোকায়ত সংহত সমাজের

ব্যক্তিগত অভিপ্রায়। শাস্ত্র ও সামাজিক অনুশাসন অপেক্ষা ঐতিহ্য অনুসারী ধারাবাহিকতা প্রসূত, মৌলিক বা গোষ্ঠীক পরম্পরাগত স্বতঃস্ফূর্ত ভাব-ভাবনার ক্রিয়াশীলতায় সমাজের যৌথ আবেগ-অনুভূতি প্রয়োজন প্রীতিতি, আচার-অনুষ্ঠান বিশ্বাস-সংস্কার বাস্তব চেতনা, রস চেতনা, ব্যবহারিক প্রয়োজন, সৌন্দর্য স্পৃহা, বিবিধ ও বিচিত্র মাধ্যমে রূপাবয়ব লাভ করে।”[২]

আমরা জানি যে লোকশিল্প ব্যক্তিগত হয়েও কখনো কখনো সমাজের অঙ্গ হয়ে যায়। সার্থক শিল্পকর্ম ব্যষ্টি থেকে সমষ্টি, তথা বিশেষ কোন অঞ্চল ও সমাজ জীবন প্রবাহের সঙ্গে মিশে গিয়ে তার প্রতিনিধিত্ব করে। ঠিক এরকমই একটি লোকশিল্প হলো পুখুরিয়ার কাঁসা শিল্প। পুখুরিয়া গ্রামটি বাঁকুড়া শহর থেকে সিমলাপাল গামী রাস্তায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে বিক্রমপুর গ্রামের পাশেই অবস্থিত।

কাঁসা শিল্প পদ্ধতিগতভাবে দু’ভাবে করা যায়— পেটাই পদ্ধতি ও ঢালাই পদ্ধতি। পেটাই পদ্ধতিতে তামা ও রাং ৭ : ২ অনুপাতে একটি মুচির মধ্যে নিয়ে একটি বিশেষ আকৃতির চুল্লির মধ্যে রেখে তাপ দেওয়া হয়। এর ফলে যে মিশ্র সংকর ধাতু উৎপন্ন হয় তাই কাঁসা। এই গলিত কাঁসা ছোট ছোট গর্তে প্রয়োজন অনুসারে ঢেলে পিন্ডাকারে করা হয়। এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হলো কাঁসা ওজন হ্রাসশীল ধাতু। ২২০ গ্রাম কাঁসার পিণ্ড থেকে ২০০ গ্রাম ওজনের দ্রব্য প্রস্তুত হয়। কারণ আগুনে ধাতুটির ক্ষয় হয়। শিল্পীরা বলেন ‘কিছুটা খেয়ে যাওয়া’। ওই ধাতুর পিণ্ডকে একজন সাঁড়াশি দিয়ে ধরে, অন্য চার পাঁচজনে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে বিভিন্ন দ্রব্য নির্মাণ করে হাতের জাদুতে। পুখুরিয়াতে এই পদ্ধতিতেই Singing Bowls নির্মাণ করা হয়।

বাঁকুড়া জেলার সিমলাপাল থানার পুখুরিয়া গ্রামের কর্মকার পাড়া ভোর থেকেই মুখরিত হয়ে ওঠে শাল গুলি (কাঁসারির কর্মশালা), কাঁসার বাড়ি তৈরির ঠ্যাং ঠ্যাং শব্দে। এই নিত্যনৈমিত্তিক শব্দ ৩-৪ পুরুষ অর্থাৎ প্রায় ২০০ বছর ধরে চলে আসছে, এই গ্রামেতে ভোরের পাখির কলরব এর সাথে তাল মিলিয়ে। সপ্তাহের রবিবার ছাড়া সব দিনই এই শব্দে পুখুরিয়া বাসী মেতে ওঠে তাদের তৈরি শিল্পের শব্দে। কাঁসার বাটি শিল্পের সাথে জড়িত পুখুরিয়া গ্রামটি, তাই বাঁকুড়া জেলার মধ্যে অন্যতম। এই জেলার মূলত কেঞ্জাকুড়া, বিষ্ণুপুর, পুখুরিয়া, চাবড়া, মগরা, হেলনা, মলিয়ান, লালবাজার, গোগড়া, লক্ষ্মীসাগর, পাত্রসায়ের প্রভৃতি স্থানে কাঁসা-পিতল শিল্প অবস্থিত। এখানে কাঁসা পিতলের কলসি, জামবাটি, থালা, গ্লাস, বাটি, গোন্দল ও বিভিন্ন ধরণের থালা তৈরি হয়। তবে পুখুরিয়া গ্রামটি কাঁসার জামবাটি শিল্পের উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে কারিগরদের তৈরি উন্নত মানের জামবাটির (Singing Bowls) জন্যই।

পুখুরিয়ার ৭৫টি শালে ৩০০টি পরিবার এই বাটি শিল্পের সাথে যুক্ত। তাদে মধ্যে কর্মকার সম্প্রদায়ের ৭৫% শিল্পী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ২৫% শিল্পী এই বাটি-শিল্পের সাথে যুক্ত। এখানে তিন চার পুরুষ ধরে যে সমস্ত কাঁসার বাটি তৈরি হয়ে আসছে সেই বাটির মাপ গড়ন পালিশ ও প্রচলিত নাম অনুযায়ী শিল্পীরা বিভিন্ন নাম ব্যবহার করে থাকেন। এই কাঁসার বাটির ব্যাপক প্রচলিত নাম জামবাটি। এছাড়া রামগন্ডি, রে মুন্না, আধাবেলি, ধারুন টানা, চিকন, চেটকি, ডবরা, ন্যাড়াবাটি, খাড়াবাটি, প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। গ্রামে এই বাটিগুলো ছাড়াও ১৫ বছর ধরে এক ধরণের জামবাটি তৈরি হচ্ছে, যার স্থানীয় নাম সাদা বাটি এবং তিব্বতিয়ান নাম Singing Bowls.

পুখুরিয়া গ্রামে এই সাদা বাটি বা Singing Bowls ১৫ বছর আগে বিষ্ণুপুরের সব্যসাচী কে. সি. দাস-এর মাধ্যমে অর্ডার হিসাবে তৈরি করার জন্য কর্মকার সম্প্রদায়ের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল। তারপর থেকে জামবাটি প্রস্তুত হয়ে আসছে এই গ্রামে। এখানে এই বাটি ৫০০ গ্রাম থেকে ১৮ কেজি পর্যন্ত ওজন এর তৈরি করে থাকেন শিল্পীরা। প্রস্তুত বাটিগুলি বিষ্ণুপুরের মহাজন, রামজীবনপুর এর মহাজন ছাড়িয়ে কলকাতা দিল্লি ও নেপালে ব্যবসায়ীদের কাছে পৌঁছে দেন স্থানীয় মহাজনরা। এই সাদা বাটির (Singing Bowls) ব্যবহার বর্তমানে ১৮টি দেশ করে থাকে— নেপাল, চীন, ভূটান, জাপান, কোরিয়া, উরুগুয়ে, কিউবা, কোস্টারিকা, ইটালি, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, পোল্যান্ড, স্লোভানিয়া ইত্যাদি। এই বাটির ব্যবহার বৌদ্ধযুগ থেকে চলে আসছে, নেপাল চীন-জাপান, সিকিম প্রভৃতি স্থানে। এই বাটি পূর্বে সেখানেই তৈরি হতো। ১৫ বছর ধরে এই গ্রামে কর্মকার সম্প্রদায় উৎকৃষ্টমানের এই বাটি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা এই বাটিটিকে সাদা বলে এতদিন জানতেন। কিন্তু সাত বছর আগে ব্যবসায়ীদের মারফত জানতে পারলেন এই সাদাবাটির বহুল প্রচলিত নাম হল তিব্বতিয়ান Singing Bowls.

পূর্বে যে সমস্ত বাটির নাম উল্লেখ করেছি, তাদের তৈরির পদ্ধতি হলো— প্রথমে শিল্পীরা মহাজনের কাছ থেকে কাঁসার বাটি তৈরির কাঁচামাল সংগ্রহ করেন। মহাজনরা কলকাতার বড় বাজার থেকে তামা ও রাং নিয়ে আসেন এবং স্থানীয় পুরানো কাঁসার খুঁট (ভাঙ্গা কাঁসার বাসন পত্র) সংগ্রহ করে শিল্পীদের দেন। সমিতির মাধ্যমে শিল্পীরা কয়লা সংগ্রহ করেন। শিল্পীরা প্রত্যহ বিকেলের দিকে একটি ছোট ভাটিতে আগুন করে ৭ : ২ অনুপাতে তামা ও রাং এর টুকরো মুচিতে রেখে সেটির মুখ মাটি দিয়ে বন্ধ করে, মুচিটিকে ভাটির আগুনে বসিয়ে দেন। তিন ঘন্টা আগুনে থাকার পর শিল্পীরা বড় রড বা শাবল দিয়ে আগুন সরিয়ে সাঁড়াশি দিয়ে মুচি নামিয়ে আনেন। তারপর মুচির মুখ খুলে তার মধ্যে গলে

তরলে পরিণত হওয়া মিশ্রিত তামা বা রাং বা বেল মেটালটিকে মাটির তৈরি অনেকগুলি ছাঁচের মধ্যে ঢেলে দেন। ছাঁচের মধ্যে ঢালা গরম তরল কাঁসার উপর ধুলোবালি ভেসে ওঠে। এই ধুলোবালি ছোট ছাকনি (মাথা বাঁকানো লোহার চ্যাপ্টা রড) দিয়ে তরল কাঁসার উপর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

পরের দিন সকালে চাঁচে ঢালা তরল কাঁসাটি নিরেট শক্ত কাঁসার পিণ্ড বাট বা রুয়া'তে পরিণত হয়। এই বাট বা রুয়াটিকে গড়নদার সাঁড়াশি দিয়ে ধরে বড় ভাটির আগুনে পোড় খাইয়ে (উত্তপ্ত করা) উত্তপ্ত লাল গনগনে করে তোলেন। গড়নদার শিল্প মহাজনের অর্ডার অনুযায়ী কাঁসার পিণ্ড ব্যবহার করেন এবং মহাজনের চাহিদা অনুযায়ী বাটি প্রস্তুত করেন। তারপর সেই পোড় খাওয়ানো উত্তপ্ত রুয়াটিকে দুটি সাঁড়াশির সাহায্যে নেহাই-এর উপর রেখে অন্যান্য শিল্পীদের ডাক দেন। তৎক্ষণাৎ অন্য তিনজন শিল্পী তাদের হাতুড়ি দিয়ে রুয়াটিকে আঘাত করতে উদ্যত হন। সেইসময় গড়নদার দুটি সাঁড়াশির সাহায্যে রুয়াটিকে অনবরত ঘুরিয়ে যান এবং মাঠনদার, চাঁচানদার ও ঘর্ষণদার এই তিনজন শিল্পী রুয়াটিকে পিটিয়ে যান হাতুড়ির সাহায্যে। যতক্ষণ রুয়া উত্তপ্ত থাকে, ততক্ষণ উপরিউক্ত কার্যপ্রণালী চলে।

রুয়ার উত্তপ্ততা কমে গেলে আর পেটানো চলে না কারণ তাহলে কাঁসা ফেটে যায়। পুনরায় গড়নদার রুয়াটিকে পৌড় খাওয়ান ও অন্য তিন বা চার জন্য শিল্পী তখন যে যার নিজের কাজে লিপ্ত থাকেন। রুয়াটিকে পেটানোর আগে হাতুড়িতে সরষের তেল বাগানো হয়, যাতে রুয়ায় আটকানো ছাই যন্ত্রপাতিতে না লাগে। এই ভাবে প্রত্যেকবার রুয়াটিকে উত্তপ্ত করা হয় এবং পেটানোর মাধ্যমে রুয়া ধীরে ধীরে চ্যাপ্টা থেকে গোল হয়। গড়নদার ৭০০ থেকে ৯০০ গ্রাম ওজনের তিন থেকে চারটে বাটি এক সাথে সাঁড়াশি দিয়ে ধরে পোড় খাওয়ান এবং অন্যান্য শিল্পীরা হাতুড়ি গিয়ে আঘাত করে একসাথে তিন চারটা বাটির আকৃতি দান করতে পারে। পুরোপুরি বাটির আকৃতি আনার জন্য নেহানি ছাড়াও খাসা পাথর বা কাঠের উপর উত্তপ্ত বাটিটি রেখে লোহা ও কাঠের হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করা হয়। সবশেষে আবার পূর্ণ বাটিটিকে পোড়ানো হয় এবং উত্তপ্ত বাটির উপর লবণ ছিটিয়ে দিয়ে তা বাইরে এনে জলে ডোবানো হয়। লবণ ছড়ানোর ফলে বাটিতে লেগে থাকা ছাই সহজেই পরিষ্কার হয়ে যায়। তারপর বাটিটিকে বালি দিয়ে ঘষে আরো পরিষ্কার করা হয়। এরপর সেই জামবাটি কে মাঠনদার ধীরে ধীরে কাঠের হাতুড়ির দ্বারা ঠুকে ঠুকে ঠিক করেন। মাঠনদারের কাজের পর চাঁচানদার সেই কাঁসার বাটিটিকে ঝোর কাঠ এবং গোজের দ্বারা আটকে রেখে লুয়ালি (বাটি চাঁচার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ইস্পাত দন্ড) ও উঘার (লোহার ঘর্ষণকারী যন্ত্র) দ্বারা বাটিটির পিছনে পিঠ ফেলেন ও বাটির ধারের অংশ চাঁছেন বা বাটির

কানা ঠিক করেন। পরে সেই বাটি ঘর্ষণদারের কাছে দেওয়া হয়। ঘর্ষণদার লুয়ালি, লোহার খাড়ি ও উঘার সাহায্যে বাটির ভেতরের অংশ ছেঁচে পরিষ্কার করেন। চাঁচার জন্য বা ছুঁলার জন্য যন্ত্রগুলির মাথায় হাওয়া স্টিলের পাত দেওয়া থাকে। যন্ত্রগুলিকে দ্রুত ক্ষয় এর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য স্টিল দেওয়া হয়। বাটির অর্ডার অনুযায়ী ওজন যাতে হয় তার জন্য বারবার ওজন ও ঘর্ষণ চলতে থাকে কাঙ্খিত মানে পৌঁছানোর জন্য। কুন্দ মেশিনে পালিশ করার সময় শিল্পীরা আগের থেকে তৈরি করা আঠার রজন, ধুলো ও তেলের মিশ্রণে তৈরির সাহায্যে বাটির বাইরের অংশকে হালকা গরম করে বাইরের দিকটিতে কুন্দ মেশিন লাগিয়ে বাটির ভিতরে দিকটিতে পালিশ করেন। তবে বাটির দু-দিক পালিশ করতে হলে শিল্পীকে বফ মেশিনের সাহায্য নিতে হয়। সবশেষে প্রস্তুত বাটিটিকে লাস্টার, চুল ও কেরোসিনের সাহায্যে মেজে চকচক করে মহাজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এই শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও উপকরণগুলি হল নেহাই, ছোট বড় কাঠের হাতুড়ি, লোহার হাতুড়ি, ছোট-বড় সাঁড়াশি, হাওয়া শাল, মুচি, ছাঁচ, ছাকনা হাতা, খাবলা, শাবল, ডাবু, খাসা, শিল, উঘা, ছোট-বড় ছেনি, চালুনি, লোহার দন্ড, বা খাড়ি, তামা, রাং, কয়লা, লবণ, কেরোসিন তেল, সরষের তেল, গালা, চুল, লাস্টার, যান্ত্রিক হাপর, মোটর চালিত কুন্দ মেশিন, বফ মেশিন ইত্যাদি। সকাল ৬টা থেকে জামবাটি বা Singing Bowls তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়, নিরলসভাবে চলতে থাকে দুপুর ২ টো পর্যন্ত। যদিও মাঝে কিছুক্ষণের জন্য স্বল্পাহারের জন্য বিরতি থাকে। এই নিরলস কর্মপদ্ধতি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় 'লোহার ব্যাখ্যা' কবিতায় তুলে ধরেছেন—

"দেখো গো হেথায়, হাঁপর হাঁপায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি
ক্লান্ত নিখিল করো গো শিথিল তোমার বজ্র মুঠি।"[৩]

যদিও লোহা ও কর্মকারের মধ্য দিয়ে এই রূপক ধর্মী কবিতায় অন্য বার্তা দিতে চেয়েছেন কবি। তথাপি বলা যায় যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি সকলেই চায় অর্থাৎ এই দীর্ঘ পরিশ্রমে সবাই যেন ছুটি চায়। এইভাবে শিল্পীরা প্রতিদিন এক কেজি ওজনের সাতটি বাটি ও আট কেজি ওজনের একটি বাটি তৈরি করেন। শিল্পীরা সপ্তাহের রবিবার দিনটি নিজেদের শালের কাজ বন্ধ রাখেন, অবসর বিনোদন ও ব্যক্তিগত কাজের জন্য।

ব্যবহার পদ্ধতি সম্বন্ধে যা জানা যায় তা হল— এই বাটিটির ধারে বা কানায় একটি সেলেট বা স্টিক দিয়ে ঘর্ষণ করলে যে সাউন্ড বা অনুরণনের সৃষ্টি হয় সেই সাউন্ড বা অনুরণনের (১ থেকে ২ মিনিট) স্থায়ীত্বের উপর ভিত্তি করে বাটির গুণাগুণ নির্ধারণ করেন ব্যবসায়ীরা। শিল্পীরা বলেন কাঁসার বাটি ব্যবহারের মাধ্যমে যদি পুরাতন করা যায় তাহলে তা ব্যবসায়ীদের কাছে মূল্যবান হয়ে ওঠে। কাঁসার বাটি থেকে সৃষ্ট শব্দ মানব শরীরে

অবস্থিত সাতটা চক্র কে উজ্জীবিত করে এবং মানুষকে শান্তি দান করে অর্থাৎ মেডিটেশনের কাজে লাগে। এই চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের দেশ অবগত না হলেও বর্তমানে এর চিকিৎসা পদ্ধতি বিদেশে ছড়িয়ে পড়ায় আন্তর্জাতিক দিক থেকে এই লোকশিল্পটি সত্যিই অভাবনীয় হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন নামের বাটিগুলি মহাজনেরা চালান করেন ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা, বিহার, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। এইসব অঞ্চলে কাঁসার বাটি ও কলসিগুলি আদিবাসী ও নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষজন মাঠে-ঘাটে, জঙ্গলে, খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ ও জল রাখার কাজে এবং অন্য সম্প্রদায়ের মানুষজন দৈনন্দিন, ব্যবহারিক, বৈবাহিক কাজে উপহারস্বরূপ, শিশুর অন্নপ্রাশনে এবং দেবতার ভোগ প্রস্তুত করতে ব্যবহার করেন। স্বাস্থ্যের কারণে এই কাঁসা শিল্প ব্যবহার করা হয়। 'নেচার' পত্রিকায় বৃটেনের বিজ্ঞানী রড রিড একটি প্রবন্ধ লিখেছেন— "পিতলের কলসিতে জল রেখে জল বিশুদ্ধ করার মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ভিত্তি আমরা খুঁজে পেয়েছি। পিতলের অণুর আয়নিক প্রতিক্রিয়ায় এর কারণ। পিতলের কলসিতে জীবাণু পূর্ণ জল ৪৮ ঘন্টা রেখে দিলে সেই জলে জীবাণু খুঁজে পাওয়া যায় না। ধারণা করা হচ্ছে পিতলের কলসি থেকে যে আয়নিক ব্লিচিং হয় তা জলে উপস্থিত জীবাণু প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।"[৪]

এবার আমরা কয়েকটি কাঁসার তৈরি বাটির ওজন, সাইজ ও মাপ নিচে দেওয়ার চেষ্টা করলাম—

বাটির নাম	**ওজন**	**সাইজ/মাপ**
আধাবেলি	৭০০-৯০০ গ্রাম	৬-৮ ইঞ্চি
ন্যাড়াবাটি	৩০০ গ্রাম-১ কেজি	৪-৭ ইঞ্চি
খাড়াবাটি	৩০০ গ্রাম-২.৫ কেজি	৪-২২ ইঞ্চি
চিকনবাটি	৮০০ গ্রাম-৪ কেজি	৮-১৪ ইঞ্চি
রামগণ্ডী	১ কেজি-৬ কেজি	১০-২৭ ইঞ্চি
ঝুমকা	১ কেজি-৮ কেজি	৭-১৩ ইঞ্চি
সাদাবাটি	৮ কেজি-১৮ কেজি	১৮-২৮ ইঞ্চি

এই শিল্প মহাজনী শিল্প, শিল্পীরা সরাসরি আমদানি ও রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত নয়। মহাজনদের অর্ডার অনুযায়ী শিল্পীরা এই শিল্প কর্ম করেন। শিল্পীরা প্রতিকেজি কাঁসার বাটির জন্য ৩০০ টাকা মজুরি পান এবং এর সাথে ৫০ গ্রাম কাঁসার টুট (ভাঙ্গা কাঁসার টুকরো) পান। বর্তমানে ৭০টি শালে ২০ বছর থেকে ৫৫ বছর পর্যন্ত বয়সী শিল্পীদের

কর্মরত দেখতে পাওয়া যায়। এই শিল্পে নিযুক্ত শিল্পীদের শ্রমদানের জন্য রোগব্যাধি হয় না। কেবল বয়সকালে শিল্পীদের হাড়ে একটু বাঁক দেখা যায়, যাকে চিকিৎসা পদ্ধতিতে Spondy-losis বলা হয়। শিল্পীরা বিশ্বকর্মার আরাধনার সাথে সাথে অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করেন। শিল্পীরা মনে করেন কাঁসার জিনিস এর মধ্যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করলে হজম শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং অম্বল হয় না। স্থানীয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাঁসার বাটির ব্যাপক চাহিদা থাকায় এবং এক বেলা কাজের পর, অন্য সময় কাজ করতে হয় না বলে ও প্রত্যহ কাজ পাই বলে নতুন প্রজন্ম এই শিল্পের শিল্পী হিসাবে আসতে আগ্রহী বোধ করছে।

শিল্পীদের উন্নয়নের জন্য সমিতি রয়েছে। সমিতি অল্প দামে কয়লার যোগান দেয় এবং দুঃস্থ শিল্পীদের কাজের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখে। সরকারি তরফ থেকে শিল্পীদের আইডেনটিটি কার্ড প্রদান করা হয়েছে। সমিতির কর্ণধাররা এবং শিল্পীরা মনে করেন যদি তাদের অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া হয়, স্বাস্থ্যবীমা, বার্ধক্য ভাতার ব্যবস্থা করা হয় এবং উচ্চশিক্ষায় শিল্পীদের ছেলেমেয়েদের আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দান করা হয় তবে শিল্পীরা ভালোভাবে বাঁচার প্রেরণা লাভ করতে পারেন।

তথ্যসূত্র

১. লোকশ্রুতি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সেপ্টেম্বর ১৯৯০, পৃষ্ঠা-৬০

২. বাংলার লোকশিল্প, প্রদ্যোত ঘোষ, পুস্তক বিপণি কলিকাতা-২৩, প্রথম সংস্করণ ২০০৪, পৃষ্ঠা-১০

৩. লোহার ব্যথা— যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর কবিতা, বাংলা সহায়ক পাঠ, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, জুলাই ২০০৭, প্রকাশক স্বপন কুমার সরকার, সচিব পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, কবিকাতা-১৬, পৃষ্ঠা-২১

৪. পরম্পরার প্রবাহে খাগড়ার কাঁসা-পিতল, নিবেদিতা চক্রবর্তী, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃষ্ঠা-১০১

সহায়ক গ্রন্থ

১. লোকসংস্কৃতি বিদ্যা ও লোকসাহিত্য, জীবেশ নায়ক, প্রকাশক দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, বইমেলা-২০১০

২. লোকশ্রুতি, সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে মালিনী ভট্টাচার্য, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী

সংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, Volm.-5, Issue-1, December-2006

ব্যক্তি ঋণ ও তথ্য দাতা

১. কার্তিক কর্মকার (বয়স ৪৫), অজিত কর্মকার (৪৪), সুভাষ কর্মকার (৪২), হারাধন কর্মকার (৪১), লক্ষ্মীকান্ত কর্মকার (৪৩), উনারা সকলেই পুখুরিয়া গ্রামের বাটি শিল্পী

২. স্বপন কর্মকার (বয়স ৬০), তপন কর্মকার (বয়স ৫০), পিন্চু কর্মকার (বয়স ৩০), কুমারেশ কর্মকার (বয়স ৫০), পেশা-শিক্ষকতা উত্তরাধিকারসূত্রে বাটি শিল্পের মহাজন কুমারেশ বাবু বাড়ি পুখুরিয়া গ্রামে। অন্যান্য ব্যক্তি বর্গ গন পুখুরিয়া গ্রামের বাটি শিল্পের মহাজন।

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে লোক-উপাদানের প্রায়োগিক বৈচিত্র্য

শ্যামাপদ মাহাত

উপন্যাস শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল উপযুক্ত বা বিশেষ রূপে স্থাপন। অর্থাৎ উপন্যাস হল একটি কাহিনিরূপ বা কোনো একটি উপাদানকে বিবৃত করার কৌশল বা পদ্ধতি। উপন্যাস শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'novel' যার আভিধাকি অর্থ হল 'a story long enough to till a complete book in which characters and events are usually imagery'[১] সমালোচক দেবীপদ ভট্টাচার্যের কথায়— 'গদ্যাশ্রিত আখ্যান অবলম্বনে নরনারীর হৃদয়ের বাসনা-কামনা ও তাদের চিত্তে যুগজীবন ও পারিপার্শ্বের প্রতিঘাত ও প্রতিক্রিয়ার স্বাক্ষর বহন করছে উপন্যাস।'[২] প্রত্যেকটি ব্যক্তি, বিষয় বা বস্তুরই নিজস্ব কিছু উপাদান থাকে। বিখ্যাত সমালোচক E.M. Forster তাঁর 'Aspects of the novel' -এ উপন্যাসের কতকগুলি দিকের কথা দেখিয়েছেন। যথা— story, people, plot, fantasy, prophecy, pattern and rhythm। শ্রদ্ধেয় সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে উপন্যাসের ছয়টি বৈশিষ্ট্য-এর কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল— (১) কাহিনি, (২) চরিত্র, (৩) মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, (৪) বাস্তবতা ও স্থানীয় পরিবেশ, (৫) সংলাপ, (৬) ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির যথার্থ রূপ দিতে ঔপন্যাসিক সমাজ থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেন। উপন্যাসের উপাদান সম্পর্কে বিখ্যাত সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান— "সমাজ ও সমাজ বিধৃত মানুষ, পট এবং পটনির্ভর মানুষই উপন্যাসের উপাদান।"[৩]। সাধারণত দু' ধরণের সমাজ থেকেই ঔপন্যাসিক উপাদানগুলি নিয়ে আসেন। এক, শিক্ষিত সমাজ। দুই, লোকসমাজ। এই লোকসমাজের উপাদানই মূলত লোক উপাদান। উক্ত আলোচনায়

লোক উপাদান বলতে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিকেই বোঝানো হয়েছে।

লোকসংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'folklore'। Cambridge dictionoryতে 'folklore' কে বলা হয়েছে— 'The traditional stories and culture of a group of people'[৪]

বিখ্যাত লোক গবেষক Ben Ames Folklore' সম্বন্ধে জানিয়েছন—"It is possible to distinguish three basic conceptions of the Subject underlying many definitions; accordingly, folklore is one of these : a body of knowledge, a mode of thought, or a kind of art."[৫]

এই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা, চিন্তাভাবনা, শিল্পকলার ধারণাগুলিকে নিয়েই অদ্বৈতমল্ল বর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে কীভাবে লোক উপাদানগুলির প্রায়োগিক বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে তাই উদাহরণ সহযোগে বর্তমান আলোচ্য।

প্রখ্যাত লোক গবেষক তুষার চট্টোপাধ্যায় লোকসংস্কৃতিতে পাঁচটি প্রধান অভিব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন।[৬] (১) বস্তুপ্রধান, (২) ভাব প্রধান, (৩) কার্যকারিতা প্রধান, (৪) অনুষ্ঠান প্রধান, (৫) শিল্প প্রধান। আমরা আলোচনার সুবিধার্থে অভিব্যক্তিগুলোকে এভাবে সাজাতে পারি— (ক) বস্তুগত উপাদান, (খ) মানসজাত উপাদন, (গ) প্রদর্শনমূলক উপাদান, (ঘ) অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক উপাদান ও (ঙ) বাচনিক উপাদান।

সমাজ ও সংস্কৃতির কাছেই তো সাহিত্য তার রসদ জোগাড় করে। তাই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাগীতি' থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত সাহিত্যের ধারাকে নানাভাবে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি পুষ্টি দান করে চলেছে। বাংলা উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। সাহিত্যসম্রাট তথা বাংলা উপন্যাসের সার্থক স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস নির্মাণেও বিচিত্রভাবে লোক উপাদানগুলি প্রযোজিত হয়েছে। আর অদ্বৈতমল্ল বর্মণের এই বিখ্যাত উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' মূলত নদীর নাম দিয়ে নামকরণ হলেও এই উপন্যাসের গড়নে ও রক্তমাংসে যে সজীবতা ধারণ করে রয়েছে তার প্রায় পুরোটাই রসদ জুগিয়েছে 'মালো' উপজাতিদের জীবন ও সংস্কৃতির যাপনধারা তথা লোকসংস্কৃতির নানান আকর। তাই সমালোচক ক্ষেত্রগুপ্তও জানান— "গোটা উপন্যাস জুড়ে মালোদের সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান অজস্র ধারায় রঙ ছড়িয়েছে।"[৭]

কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করে আলোচ্য বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে—

বস্তুগত উপাদান

লোকযান : লোকসমাজে যাতায়াতের জন্য যে যানবাহনের ব্যবহার দেখা যায় সেগুলিকেই

লোকযান বলা হয়ে থাকে। এই উপন্যাসেও তার প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন— "দীর্ঘ পথ গিয়াছে তিতাসের বুক চিরিয়া। সে পথে চলে কেবল নৌকা।"[৮]

তিতাস যেমন নদী থেকে একটি চরিত্র রূপে দাঁড়িয়েছে তেমনি মালোদের জীবনযাপনের সঙ্গে জুড়ে আছে 'নৌকা' নামক লোকযানটি। যে লোকযান মালোদের স্থানিক পরিবেশ, বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতে উপন্যাসকে চূড়ান্তভাবে সাহায্য করেছে। মালোদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা লোকযানটি সম্পর্কে লেখক জানান— "...নৌকাগুলি অচল হয়। মাঝিরা কোমরে দড়ি বাঁধিয়া সেগুলিকে টানিয়া নেয়"[৯]— এ বর্ণনাতে লেখকের জীবনদর্শন ধরা পড়ে। যেখানে লোকায়ত জীবনের প্রতি লেখকের নিবিড়প্রেম।

লোকখাদ্য : লোকসমাজ যে খাদ্যবস্তুগুলিকে খাবাররূপে ব্যবহার করে থাকে সেগুলিকেই মূলত 'লোকখাদ্য' বলে অভিহিত করা হয়। এ উপন্যাসেও তার প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন— "মেয়েরা যেখানে রাঁধে, ধান সিদ্ধ করে, মুড়ি চিড়া করে।...সেখানটাতে একটা আবদ্ধ বেড়া।"[১০]— এই ধান সিদ্ধ করার বর্ণনা, মুড়ি-চিড়া বা রাঁধনাশালের বিবরণ সেখানকার যেমন সামাজিক বা স্থানিক পরিবেশকে সুচারুভাবে প্রস্ফুটিত করেছে তেমনি উপন্যাসে মাটির গন্ধ স্থাপনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে— তা বলাইবাহুল্য।

মালোদের কালীপূজার ধূমধামের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এভাবে— "পাঁচ-ছ'দিন আগে থেকেই ঘরে ঘরে গুঁড়িকুটার ধূম পড়ে। মুড়ি ভাজিয়া ছাতু কুটিবার তোড়জোড় লাগে। চাউলের গুঁড়ি রোদে শুখাইয়া খোলাতে টালিয়া পিঠার জন্য তৈরী করিয়া রাখে।"[১১] এই মুড়ি, ছাতু, পিঠা সবই লোকখাদ্য। যার বর্ণনা ও প্রয়োগ কাহিনিকে সজীবতা দান করেছে।

লোকতৈজস : যে তৈজস পত্রগুলি লোকজীবন যাপনে প্রায় দৈনন্দিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে সে সবগুলিকেই সাধারণত লোকতৈজস বলা হয়। মালোদের সামাজিক অবস্থানটি বোঝাতে ঔপন্যাসিক তাঁদের গৃহস্থের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে— "ঘাটে নৌকা বাঁধা; মাটিতে ছড়ানো জাল, উঠানের কোণে গাবের মটকি। ঘরে ঘরে চরকি; টেকো, তকলি সূতা কাটার, জাল বোনার সরঞ্জাম।"[১২]

এই লোকতৈজসের বর্ণনা আঞ্চলিক পরিবেশ সম্পর্কে পাঠককে উপলব্ধি করতে সহায়ক হয়ে উঠেছে। আবার যখন রমু অতিথিদের জন্য— "কলসী হইতে চিড়া বাহির করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে কুলাতে করিয়া ঝাড়িয়া দিল"[১৩]—তখন আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না লোকসমাজের সামাজিক অবস্থানটি চেনাতে লোকতৈজসগুলি কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

লোকপরিচ্ছদ : যে ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ লোকসমাজের মানুষজন পরিধান করে থাকে সেগুলিকেই লোকপরিচ্ছদ বলা হয়ে থাকে। এ উপন্যাসেও তার চিত্র রয়েছে। যেমন—

> "তিলক বুড়া মানুষ। তার কাপড় হাঁটুর নীচে নামে না। কিন্তু কিশোর সুবল ধুতি পায়ের পাতা অবধি টিলা করিয়া কার্তিকের মতো কোমরে গেরো দিয়েছে। কাঁধে চড়াইয়াছে এক-একখানা গামছা।"[১৪]

এই পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা একেবারে লোকপরিচ্ছদের ছবি। যার বর্ণনা সামাজিক অবস্থানটি চেনাতে ও চরিত্রগুলিকে আবেদনক্ষম করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আবার রসিদ মোড়লের পোশাক-আশাক দেখলে তা আরও পরিষ্কার বোঝা যায়। যেমন— "রসিদ মোড়লের খালি পা, লুঙ্গি পরা, গায়ে একটু ফতুয়া।"[১৫]

মানসজাত উপাদানের প্রয়োগ

Encyclopedia Britannica-তে folk society-র সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে নিম্নরূপ—

> "Folk Society, an ideal type or concept of society that is completely cohesive-morally, religiously, politically and socially, because of the small numbers and isolated state of the people, because of the relatively unmediated personal quality of social interaction... "[১৬]

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নীতি, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতিগতভাবে একই ধারণাতে বিশ্বাসী জনসমাজই লোকসমাজ। এই বিশ্বাসগত ধারণা সমস্তই মানসজাত। তাই তাদের বিশ্বাস, সংস্কার, আচার-আচরণও একই। সেই উপাদানগুলিকেই লোকসমাজের মানসজাত উপাদান বলা যেতে পারে।

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার : বিশিষ্ট সমালোচকগণ মানুষের মানসিক দূর্বলতা, শুভাশুভ বোধ, অনিশ্চয়তা বোধ থেকেই লোকসমাজের মনে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের উদ্ভবকে স্বীকার করেছেন। লোকমনের বিশ্বাসকেই লোকবিশ্বাস রূপে অভিহিত করেছেন এবং সেই বিশ্বাসের অনুবর্তী হয়ে যে আচরণ দেখা যায় তাকেই বলা হয়েছে লোকসংস্কার।

তেমনই কিছু লোকবিশ্বাসের দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসেও চোখে পড়ে। যেমন— "এবার গৌরাঙ্গসুন্দর গঙ্গা মা'র নাম স্মরণ করিয়া লগি ঠেলিয়া নৌকা ভাসাইল।"[১৭]

আবার দেখা যায় মালোদের লোকমুখে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে— "বেঘোরে মরা

মালিনীর প্রেতাত্মা এখানে মূর্তি ধরিয়া পথিককে ভেংচায়।"[১৮]

এই লোকউপাদানের প্রয়োগ যেমন সামাজিক অবস্থানটিকে চিহ্নিত করেছে, তেমনি উপন্যাসের কাহিনি গ্রন্থনেও বৈচিত্র্য এনেছে।

লোকসংস্কারেরও এরূপ ছবি রয়েছে। যেমন— 'তাইনের শ্বশুরের নাম পান্ডব, পান কইতে পারে না, পানেরে কই বটপাতা'[১৯]

—এই নাম না বলতে পারার আচরণটি লোকসংস্কারেরই দৃষ্টান্ত। আর এর প্রয়োগ উপন্যাসে সেই সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘরানাটিকে উজ্জ্বল রূপে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে তা সহৃদয় পাঠকমাত্রেই অনুভব করতে পারেন।

লোকপুরাণ : শ্রদ্ধেয় লোকগবেষক ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী মহাশয় লোকপুরাণ সম্বন্ধে জানিয়েছেন— "দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুজগতের সৃষ্টি সম্পর্কিত গদ্যে রচিত মৌখিক ঐতিহ্যাশ্রয়ী কাহিনীই হল লোকপুরাণ"[২০]

এই উপন্যাসেও তেমনি চিরকুমার কার্তিকের লোকপুরাণ-এর কথিত কাহিনিটির প্রয়োগ দেখা গেছে। যেমন—উদয়তারা দাদার জন্য জামাইবাবুকে সওয়াল করে পাত্রী দেখার জন্য— "দাদার লাগি কিছু একটা করন্দা না, এমন কার্তিক হইয়াই দিন কাটাইব ? দাদার মাথায় কি শোলার মটুক কোনকালেই উঠব না"[২১]

এই লোকপুরাণের প্রয়োগ কাহিনিকে যেমন সজীবতা এনে দিয়েছে তেমনি সংলাপেও এনেছে বৈচিত্র্য।

লোকাচার : জন্মবিষয়ক বিভিন্ন আচার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন দেখা যায় মালোদের মধ্যেও তেমন লক্ষ করা যায়। যথা— "অষ্টম দিনে আট-কলাই। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে অনন্তরও ডাক পড়িল"[২২]

এই লোকাচারের প্রয়োগ মালো জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির পরিচয়কে বহন করতে সাহায্য করেছে এই উপন্যাসে।

প্রদর্শিত/প্রদর্শনমূলক উপাদানের প্রয়োগ

যে উপাদানগুলি জনসমক্ষে প্রদর্শিত হয়ে থাকে সে সমস্ত উপাদানগুলিকেই এ পর্যায়ের মধ্যে ধরা হয়ে থাকে। এই উপন্যাসেও তার প্রয়োগ যথেষ্ট।

ভাটিয়ালী গানের প্রয়োগ : 'ভাটিয়ালী' গানের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এ গানগুলো রচিত হয় মূলত মাঝি, নৌকা দাঁড়, গুণ ইত্যাদি বিষয়ে[২৩] এখানে কিশোর গেয়েছে— "মাঝি ভাই

তোর পায়ে পড়ি পাড় দেখিয়া ধর পারি...”[২৪] —এই গানের প্রয়োগে যেমন মালো-মাঝিদের যাপন জগৎটি ধরা পড়েছে তেমনি চরিত্রগুলোকেও জীবন্ত হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে এ উপন্যাসে।

মুর্শিদি গানের প্রয়োগ : মুর্শিদি গান হলো ‘আধ্যাত্মিক লোকসঙ্গীত’[২৫] এ উপন্যাসেও শোনা যায় তার সুর— ‘এলাহির দরিয়ার মাঝে নিরাঞ্জনের খেলা শিল পাথর ভাসিয়া গেল শুকনায় ডুবল ভেলা, জলের আসন জলের বসন দেইখ্যা সরাসরি, বালুচরে নাও ঠেকাইয়া পলাইল বেপারি।”[২৬]

উপন্যাসে সামাজিক বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলতে এ গানের প্রয়োগ যথেষ্ট সার্থকতা দান করেছে।

কেচ্ছাগানের প্রয়োগ : কেচ্ছাগানে গানের মাঝে মাঝে কথা থাকে। এখানেও সেই কেচ্ছাগানের প্রয়োগ রয়েছে—

“আর দিন উঠে বে চন্দ্র পূবে যায় পশ্চিমে
আজোকা উঠছে রে চন্দ্র শানের বান্ধান ঘাটে”[২৭]

আবার বনমালী লাচারিও গেয়েছে এভাবে—

“সোনার বরণ দুইটি শিশু ঝলমল ঝলমল করে গো
আমি দেইখে আলাম ভরতের বাজারে।”[২৮]

উপন্যাসে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়টি ফুটিয়ে তুলতে এই উপাদানের প্রয়োগকে কুর্নিশ জানাতেই হয়।

অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক উপাদানের প্রয়োগ

যে সমস্ত লোক উপাদানগুলি উৎসব অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক সে সমস্ত উপাদানগুলিকে এ পর্যায়ে রাখা যেতে পারে। যেমন বিভিন্ন ব্রত পার্বন, উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

এই উপন্যাসেও এই ধরনের উপাদানের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন— দোলপূর্ণিমার উৎসব বর্ণনা— “খলাতে দোল-পূর্ণিমায় খুব আরছা হয়। মাইরা লোকে করতাল বাজাইয়া যা নাচে! নাচে ত না, যেন পরীর মতো নিত্য করে। পায়ে ঘুঙরা, হাতে রাম করতাল। এ নাচ যে না দেখেছে, মায়ের গর্ভে রইছে”[২৯]

—কাহিনির রসায়ন বৃদ্ধিতে এ উপাদানের প্রয়োগ যথার্থ একথা অনস্বীকার্য।

মাদামগুলের ব্রত বর্ণনা লেখক দিয়েছেন এভাবে— "তরুণ কলাগাছের একহাত পরিমাণ লম্বা করিয়া কাটা ফালি; বাঁশের সরু সলাতে বিঁধিয়া ভিত করা হয়। সেই ভিতের উপর গড়িয়ে তোলা হয় রঙিন কাগজের চৌয়ারি ঘর। আজিকার ব্রত শেষে ব্রতিনীরা সেই চৌরারি মাথায় করিয়া তিতাসের জলে ভাসাইবে, সঙ্গে সঙ্গে ঢোল, কাঁসি বাজিবে; নারীরা গীত গাহিবে।"[৩০]

এ-ব্রত বর্ণনা নারী জীবনের অবস্থানটি পরিস্ফুট করেছে। কাহিনিকেও দিয়েছে অনন্য মাত্রা।

বাচনিক উপাদানের প্রয়োগ

মুখের কথায় কথায় যে সমস্ত লোক উপাদানগুলি প্রবাহিত হয়ে চলেছে সে উপাদানগুলিকে বাচনিক উপাদানরূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

বাগ্‌ধারার প্রয়োগ : সংজ্ঞাতে বলা হয়— "যে পদগুচ্ছ বা বাক্যাংশ বিশিষ্টার্থক প্রয়োগের ফলে আভিধানিক অর্থের বাইরে আলাদা অর্থ প্রকাশ করে।[৩১] এখানেও তার প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন— "মালোরা এসবই দেখিত...চুপ করিয়া থাকিত এবং সময়ে সময়ে নিজেরাও এই গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিত।"[৩২]

— এই 'গড্ডলিকা প্রবাহ' যে অন্ধ অনুসরণকে বোঝাতেই প্রযোজিত হয়েছে তাতে ভাষায় এসেছে বৈচিত্র,্য আবার কিশোর যখন পাগল হয়ে ফিরে এসেছে, তখন তার বউয়ের অবস্থা লেখক লিখেছেন এভাবে— "কিন্তু তার বাড়া ভাতে পড়িল ছাই। সে আসিল পাগল হইয়া"[৩৩]

এই অনিষ্ট হয়ে যাওয়ার অনুভবটি ব্যক্ত করতে ঔপন্যাসিক 'বাড়া ভাতে ছাই' বাগধারার প্রয়োগ করে ভাষার বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলতে সার্থক হয়েছেন।

প্রবাদের প্রয়োগ : প্রবাদ সম্পর্কে সমালোচক সুদেষ্ণা বসাক তাঁর 'বাংলার প্রবাদ' গ্রন্থে জানান— "একটি জাতির আবিষ্কৃত সত্য, সামাজিক রসবোধ, ঐতিহ্যগত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং মূল্যবোধ দীর্ঘদিন ধরে লোকমুখে প্রচলিত হয়, যা প্রবাদের মধ্যে সর্বজননতা লাভ করে।[৩৪]— এ উপন্যাসেও সে ধরণের লোকপ্রবাদ মূলক বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

নিজামত তার বেহাইকে বলেছে— "পুঁটি মাছের পরাণ তোমার"[৩৫] বা, দোলগোবিন্দ সা-র ভাত্তিজার অবস্থা লেখক জানিয়েছেন এরূপ— "হ, একেবারে হাতে বৈঠা ঘাটে নাও অবস্থা"[৩৬]

উপরিউক্ত লোকপ্রবাদমূলক বাক্যাংশগলিও ভাষার বৈচিত্র্যে সৃষ্টিতে সহায়ক হয়ে উঠেছে।

ছড়া : উপন্যাসে ছোট মেয়েরা অনন্তবালাকে দেখে মাঝে মাঝে ছড়া কেটে বলেছে—

"অনন্তবালা, ঘরের পালা

তারে নিয়ে বিষম জ্বালা"[৩৭]

এ প্রয়োগও উপন্যাসে সংলাপ বৈচিত্র্যে সহায়ক হয়ে উঠেছে।

লোকভাষা : লোকগবেষক দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান " 'লোক' বলতে ভাবা হয় Primitive— তাই এমন নামকরণ"[৩৮]

যাইহোক একথা স্বীকার্য যে ভাষাবিজ্ঞানের চিন্তাভাবনা করে লোকসমাজের মুখে ব্যবহার হয়ে না থাকা, প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা মুখের ভাষায় মূলত লোকভাষায়।

প্রসঙ্গত এ উপন্যাসে তিতাস তীরবর্তী অঞ্চলের মুখের ভাষাকে ঔপন্যাসিক যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। নমুনা স্বরূপ দেখা যেতে পারে— দুই দিনমজুরের কথোপকথন— "যাজরে উইট্যা মুনিবের বাড়ি গিয়া ঘুমের আলস ভাঙ্গি। ঘরের সাথে এই ত সমন্দ"[৩৯]

এখানে লক্ষণীয় অপিনিহিতির প্রয়োগ। শুধু তাই নয় 'আলস্য > আলস' দেখলে বোঝা যায় এগুলো মূলত তাদের লোকমুখেরই ভাষা তাই 'সম্বন্ধ' হয়ে গেছে 'সমন্দ'।

এই সংলাপ যেমন চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে। তেমনি উপন্যাসে ভাষাবৈচিত্র্যের উৎকর্ষতাও যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে।

'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাসটির বিশেষ পরিচিতি মূলত নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস রূপে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬)-তে নদীকেন্দ্রিক জনজীবন যেমন উঠে এসেছে এখানেও তেমনি রূপ পরিলক্ষিত হয়। আবার সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' (১৯৫৭)তেও ঠিক তেমনই নদীকেন্দ্রিক যাপন অভিজ্ঞতার কথা উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হয়েছে। ২০১৯ সালে আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত নলিনী বেরার 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসটিতেও নদীকেন্দ্রিক জীবনযাপন উঠে এসেছে বিচিত্রভাবে। নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস রূপে 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬)-এর পরিচিতি স্বীকার করেও নদীর তীরে অবস্থান করা মালো জনজাতির জীবন ও তাদের সংস্কৃতির আকর-ই যেন উপন্যাসকে দিয়েছে আলাদা মাত্রা। ফলত লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলির বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ যেন অধিক আকর্ষিত করে চলেছে আজও পাঠককে তা নির্দ্ধিধায় মেনে নিতে হয়।

তথ্যসূত্র

১. Cuddon. J.A. The penguin dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Penguin Books, 2014, P. 1055

২. ভট্টাচার্য, দেবীপদ, উপন্যাসের কথা, দে'জ পাবলিসিং, দ্বিতীয় জে.এ.ই সংস্করণ, ১৯৮২, পৃ. xii

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, নতুন সাহিত্য ভবন, কলিকাতা-২০, পৃ. ১২

৪. https://dictionary.Camridge, org.

৫. Ben Amos, Dan A; Toward a Definition of Folklore in Context @in toward New Perspectives in Folklore, ed. Paredes Americo, Bauman Richard; Austin : University of Texas, 1972, P.15

৬. চট্টোপাধ্যায়, তুষার, লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০০১, পৃ.৫৪

৭. গুপ্ত, ক্ষেত্র, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (ষষ্ঠ খন্ড), গ্রন্থনিলয়, পটুয়াটোলা লেন, কল-৭০০০০৯, দ্বিতীয় প্রকাশ— ২০১২, পৃ. ১৩৮

৮. মল্লবর্মন, অদ্বৈত, তিতাস একটি নদীর নাম, পুথিঘর প্রাইভেট লিমিটেড, বিধান সরণি, কলিকাতা ৬, ২০০১, পৃ. ২৬

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১

১৬. encyclopedia.Britannica

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

২০. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, বাংলা লোকসাহিত্যচর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপনি, বেনিয়াটোলা লেন, কল-৯, তৃতীয় পরিসংখ্যান, জানুয়ারি-১৯৯৯, পৃ. ৫৫৯

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬
২৩. bn.ikipeida org
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
২৫. bn.wikipedia.org
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৩১. wikipedia
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫
৩৪. বসাক, সুদেষ্ণা, বাংলার প্রবাদ, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৮, পৃ.১
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫-৩৬
৩৮. academia.edu
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও একটি নদীর মৃত্যু : প্রসঙ্গ তিতাস একটি নদীর নাম

সুমনা পাত্র

'সংস্কৃতি' হল কোনো সমাজের জীবনচর্যার উৎকর্ষজনিত রূপ। কোনো বিশেষ ধর্মীয় রীতিনীতি, অনুষ্ঠানকে আশ্রয় করেই অনেকসময় কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বিশেষ সাংস্কৃতিক রূপটি আত্মপ্রকাশ করে। সংস্কৃতি বলতে বোঝায় এক প্রবহমান জাতিসত্তা, যা আসলে মানুষের সামগ্রিক সৃষ্টিশীলতা ও আত্মপরিচয়কে জনসমক্ষে তুলে ধরে। মানুষ যে পরিবেশে, যে জীবিকার আশ্রয়ে বেড়ে ওঠে সেই পরিবেশ বা জীবিকা তার সাংস্কৃতিক পরিচয়কে আধারিত করে; অনেকক্ষেত্রেই পরিবেশগত বৈচিত্র্যের কারণে তা পরিবর্ধন পরিমার্জন দ্বারা নবরূপ লাভ করে। মানুষ যেমন সংস্কৃতিকে প্রতিদিনের কাজে-কর্মে, অবসরে-আলাপনে লালনপালন করে তার প্রবহমানতার ধারাকে অব্যাহত রাখে, সংস্কৃতিও তেমনি এক একটি জনগোষ্ঠীকে স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়ে বিশিষ্ট করে তোলে। সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বিশিষ্ট সমালোচক গোপাল হালদারের মন্তব্যটি উল্লেখ করতেই হয়—

> "সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মানুষের প্রায় সমুদয় বাস্তব ও মানসিক কীর্তিকর্ম, তার জীবনযাত্রায় আর্থিক ও সামাজিক রূপ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান; তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা, নানা বৈজ্ঞানিক অবিষ্ক্রিয়া আর নানা শিল্পসৃষ্টি— সমস্ত কারুকলা ও চারুকলা— এই হল সংস্কৃতির স্বরূপ।"[১]

সংস্কৃতির দুটি রূপ পৃথিবী জুড়ে আছে— একটি হল গ্রামীণ লোকায়ত সংস্কৃতি আর দ্বিতীয়টি হল নাগরিক পরিশীলিত সংস্কৃতি। লোকসাধারণের সহজ সরল গ্রামীণ জীবনযাপনে অবসর বিনোদনের জন্য প্রাত্যহিক জীবনাভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করেই লোকায়ত গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। তথাকথিত উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত দরিদ্র শ্রমজীবী সম্প্রদায় যাদের জীবনাচরণের মূল অবলম্বন কিছু বিশ্বাস-সংস্কার আর প্রথা,

তারাই মূলত লোকসমাজের 'লোক' এবং তাদের উদ্‌যাপিত সংস্কৃতিই হল লোকসংস্কৃতি।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি এমনই এক সংস্কৃতি সমৃদ্ধ সমাজের বাস্তব দলিল। এই সমাজ মালো সমাজ, মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে যাদের দিনাতিপাত হয়। অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিজেই ছিলেন মালো সম্প্রদায়ের মানুষ, নিজেকে 'জাউল্যার পোয়া' বলতে তিনি দ্বিধান্বিত হননি বরং গর্বিত ছিলেন নিজেদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির জন্য। তাই নাগরিক সংস্কৃতি থেকে দূরবর্তী প্রান্তিক মালো সমাজ-সংস্কৃতির অনুপুঙ্খ পরিচয় তিনি তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

তিতাস পাড়ে বেড়ে ওঠা মালোদের শয়নে-স্বপনে-মননে একাধিপত্য নিয়ে বয়ে চলেছিল তিতাস নদী। লেখকের কথায়— "...জীবনের প্রতি কাজে এ আসিয়া উঁকি মারে। নিত্যদিনের ঝামেলার সহিত এর চিরমিশ্রণ।"[২]

বলাবাহুল্য মালোদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ও তিতাসকেন্দ্রিক। কারণ—

> "...মালোদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মালমশলায় যে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব। পূজায় পার্বণে হাসিঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনের আত্মপ্রকাশের ভাষাতে তাদের সংস্কৃতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মালো ভিন্ন অপর কারো পক্ষে সে সংস্কৃতির ভিতরে প্রবেশ করার বা তার থেকে রস গ্রহণ করার পথ সুগম ছিল না। কারণ মালোদের সাহিত্য উপভোগ আর সকলের চাইতে স্বতন্ত্র। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত তাদের গানগুলি ভাবে যেমন মধুর সুরেও তেমনি অন্তরস্পর্শী।"[৩]

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সমালোচক সন্তোষ ঢালী-র একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

> "এখানকার মানুষগুলো যেন প্রাচীন মালার এক একটি বুনোফুল; একই দারিদ্র্যের সুতোয় গাঁথা, একই সংস্কারে বাঁধা, একই সংস্কৃতিতে সাধা। তাদের সংস্কৃতি বলাই ভালো, কারণ, এর সঙ্গে সভ্যতার কিংবা নাগরিকতার কোন সম্পর্ক নেই। অতি সাধারণ জনজীবনের লোকাচার, লোকবিশ্বাস, উৎসব, ভাষা, রীতি-নীতি, খাদ্য, সংগীত ইত্যাদি নিয়ে তিতাসপারের মালোপাড়া যেন বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপ। স্বতন্ত্র এদের রুচি, আমোদ-প্রমোদ-বিনোদন। এর ভিতর দিয়ে পাওয়া যায় আবহমান বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতির এক রূপ।"[৪]

তিতাসকেন্দ্রিক মালোদের জীবন ও সংস্কৃতি এবং তার অবক্ষয়ের ইতিহাস আলোচনার পূর্বে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের বিষয়বস্তুটি অতি সংক্ষেপে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। উপন্যাসটিকে লেখক চারটি খন্ড ও আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে

রচনা করেছেন।প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায় 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ তিতাসের ওপর মালোদের নির্ভরতা ও তিতাসের দার্শনিক রূপটি প্রতিভাত হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে 'প্রভাস খণ্ড' অধ্যায়ে, এখানে দেখা যায়—

> "তিতাস নদীর তীরে মালোদের বাস। ঘাটে বাঁধা নৌকা, মাটিতে ছড়ান জাল, উঠানের কোণে গাবের মটকি, ঘরে ঘরে চরকি, টেকো, তকলি— সূতা কাটার, জাল বোনার সরঞ্জাম। এই সব নিয়াই মালোদের সংসার।"[৫]

উপন্যাসের শুরুতেই মাঘমণ্ডল ব্রতের মধ্যে দিয়ে কিশোর, সুবল ও বাসন্তীর ভবিষ্যৎ দাম্পত্য সম্পর্ক তৈরির সম্ভাবনাপূর্ণ ইঙ্গিত লেখক দিয়েছেন। যদিও বাসন্তীর মনোগহন তলিয়ে দেখার চেষ্টা কিশোর করেনি, আর তাই বিদেশে 'খলা বওয়া'র কাজ শেষে শুকদেবপুরে এসে দোলউৎসবে সামিল হয়ে এক অপরিচিতকে উদ্ধার করে তার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। যদিও সংসার ধর্ম পালন তার ভাগ্যে জোটেনি। মোড়ল গিন্নির দয়ায় তাদের মালাবদল হয়েছে, কিন্তু গ্রামে ফেরার পথে নব বিবাহিতা স্ত্রী ডাকাতের দ্বারা অপহৃতা হলে ঘটনার আকস্মিকতায় বিধ্বস্ত কিশোর পাগল হয়ে গেছে। গ্রামে ফিরে সুবল বাসন্তীকে বিয়ে করেছে, কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই কালোব্যাপারীর নৌকোয় কাজ নিয়ে এক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সুবলের মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় খন্ডের শুরু বছর চারেক পরে। 'নয়াবসত' অধ্যায়ে দেখা যায় কিশোরের বউ ঘটনাচক্রে বেঁচে থাকে এবং ছেলে অনন্তকে নিয়ে গোকর্ণঘাটে ফিরে আসে। যদিও তার পরিচয় রহস্যাবৃত। সুবলের বিধবা বউ বাসন্তী তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়। 'জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ' অধ্যায়ে কালীপূজার সমারোহে মালোপাড়া মেতে উঠেছে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে মালোপাড়ার ঘরে ঘরে খাওয়া-দাওয়ার ধুম পড়েছে। দোলউৎসবে পাগল কিশোরকে আবির মাখাতে গিয়ে অনন্তর মা তার দ্বারা নিগৃহীতা হলে গ্রামের লোকজন মেয়েলোকের গায়ে হাত দেওয়ার অপরাধে তাকে নির্মমভাবে মারধর করেছে। সেই রাত অচৈতন্য অবস্থায় কাটিয়ে পরের দিন ভোররাতে কিশোর মারা গেছে, অনন্তর মা-র মৃত্যু হয়েছে তার চারদিন পরে।

তৃতীয় খণ্ডের 'রামধনু' অধ্যায়ে দেখা যায় মায়ের মৃত্যুর পর অনাথ অনন্তর অভিভাবক হয় বাসন্তী। সন্তান স্নেহে তাকে আগলে রাখে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মায়ের গঞ্জনায় অতিষ্ঠ হয়ে তাকে অপমান করে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলে। অনন্ত বাড়ি থেকে পালিয়ে নদীতীরে এক নৌকোয় আশ্রয় নেয় এবং বনমালী জেলের সঙ্গে তাদের গ্রামে যায়, সঙ্গী হয় বনমালীর বোন উদয়তারা। অনন্তর জীবনে একের পর এক মাতৃস্থানীয়া নারীর আবির্ভাব হয়, উদয়তারাও তাকে বাসন্তীর মত সন্তানস্নেহে আঁকড়ে ধরে। দ্বিতীয় অধ্যায় 'রাঙা নাও'-এ দেখা যায় নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা এবং সেই প্রতিযোগিতা দেখতে এসে অনন্তর

অধিকারকে কেন্দ্র করে বাসন্তী ও উদয়তারা হিংস্র কলহে লিপ্ত হয়।

চতুর্থ খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে 'দুরঙা প্রজাপতি'-তে দেখা যায় উদয়তারার সঙ্গে কলহের পরে মালোপাড়ায় বাসন্তীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, সে মনমরা হয়ে দিনযাপন করে। এদিকে গোঁসাই বাবাজীর হাত ধরে অনন্ত লেখাপড়া শিখতে শুরু করে। মালোপাড়ার ঘরে ঘরে শহুরে যাত্রাগানের মোহ ছড়িয়ে পড়ে, নিজেদের গানের চর্চা ভুলে তারা আদিরসাত্মক যাত্রাগানের প্রতি আসক্ত হয়।

শেষ অধ্যায়ের নাম 'ভাসমান'। যাত্রা সংস্কৃতির চাপে মালোদের নিজেদের সংস্কৃতি হারিয়ে যেতে শুরু করে। সামাজিক নীতিবন্ধন শ্লথ হয়ে যুবসমাজে নৈতিক অধঃপতন শুরু হয়। অন্যদিকে তিতাসের জল শুকিয়ে চর জেগে ওঠে। দূরদূরান্তের কৃষকেরা চরের মাটিতে কৃষিকাজ করতে ছুটে আসে। মালোদের ঘরে ঘরে অন্নের হাহাকার শুরু হয়। দিশেহারা মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করেন, কেউ কেউ অনন্তবালার বাবা-কাকার মতো সপরিবারে আসাম যাত্রা করে। উপন্যাসের একেবারে শেষ পর্যায়ে ভাতের জন্যে থালা হাতে শহরের বাবুদের কাছে দাঁড়াতে দেখা যায় বাসন্তীকে। কিন্তু 'বাবু' যে অনন্ত, সে কথা জানার পরই সে পালিয়ে যায়। অবশেষে তিতাসের পারে বাসন্তীও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আর এখানেই উপন্যাসের কাহিনির সমাপ্তি হয়েছে।

বিভিন্ন পালাগান, কীর্তনগান, পুঁথিপাঠ, জন্মজাতকর্মাদির অনুষ্ঠান এই উপন্যাসে নদী ও তৎসংক্রান্ত জীবন ও জীবিকার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। তিতাসপারের মালোরা পরিচিত বা অপরিচিত যাই হোক না কেন, এক সহজিয়া অনুরাগে কীর্তনের আসরে মিলিত হয়েছে। উপন্যাসে গোকর্ণঘাট, শুকদেবপুর, নয়াকান্দা, বাসুদেবপুর. বৈকুণ্ঠপুর প্রভৃতি সব গ্রামের মালোই 'কৃষ্ণমন্ত্রী'। উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের নামগুলিও কৃষ্ণচৈতন্যের মহিমায় উজ্জ্বল। গানে গল্পে প্রবাদে পরস্তাবে; পূজায়-পার্বণে, ব্রতে-উৎসবে মালোদের নিজস্ব সংস্কৃতি স্বতন্ত্র মাত্রা লাভ করেছে। কুমারী মেয়েদের মাঘ মণ্ডলের ব্রত পালন তিতাস তীরবর্তী মালো সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। অদ্বৈতের কথায়—

> "এ পাড়ার কুমারীরা কোনোকালে অরক্ষণীয়া হয় না। তাদের বুকের ওপর ঢেউ জাগিবার আগে, মন যখন থাকে খেলার খেয়ালে রঙিন, তখনই একদিন ঢোল সানাই বাজাইয়া তাদের বিবাহ হইয়া যায়। তবু এই বিবাহের জন্যে তারা দলে দলে মাঘ-মণ্ডলের পূজা করে।"৬

মাঘ সংক্রান্তির দিনে ঢোল ও সানাই-এর সুরে পুরনারীদের 'সখি ঐ ত ফুলের পালঙ রইলো, কই কালাচাঁদ আইলো'— এই গানের মধ্যে দিয়ে মালোকুমারীরা রঙিন কাগজে মোড়া সুন্দর সাজানো চৌয়ারি ছেড়ে দেয় তিতাসের জলে— রীতি অনুযায়ী যে মালোযুবক

যার চৌয়ারি ধরবে সেই কুমারী তার বাগদত্তা বধূ হয়ে যাবে। এখানে চৌয়ারি প্রেমের প্রতীক. আর সেকারণেই চৌয়ারি ধরতে ছেলেরা তিতাসের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মারামারিতেও লিপ্ত হয়। আর মেয়েরা মনে মনে এই প্রতিযোগিতাকে সমর্থন করে, কারণ— "ছেলেরাই যদি ধরতে না পারিল, তবে মেয়েদের উহা ভাসাইবার সার্থকতা কই!"[৭]

শুধু কি মাঘমণ্ডলের ব্রত, এরকম অজস্র সামাজিক উৎসব, বিয়ে, মনসা পূজা ও পদ্মাপুরাণ পাঠ, পৌষ সংক্রান্তি, দোল উৎসব, কালীপূজা, জালাবিয়া, নৌকা বাইচ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে মালোসমাজ সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। শিশুর জন্ম পরবর্তী আটকলাই, কামানি, মুখে প্রসাদ প্রভৃতি লোকাচারগুলি মালোসমাজে নিষ্ঠাভরে পালিত হয়েছে। অন্নপ্রাশনে যেমন তেমনই বিবাহ অনুষ্ঠানকে ঘিরেও মালোরা অনেক আনন্দ করে, বরং বিয়েতে লোকাচার আরও বেশি। আবার সখি বা সখা পাতানো মালোদের আরেকটি প্রিয় ব্যাপার। পছন্দের জনের সাথে সখি বা সখা পাতানোতে আগ্রহী হলে অন্য জনকে প্রস্তাব করতে হয়। দুজনেই রাজি হলে বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে, কাপড় গামছা বদল করে বন্ধুত্ব পাতানো হয়।

এছাড়াও শ্রাবণ মাসে মনসা পূজার দিনে তারা জালাবিয়া'র আয়োজন করে, বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই অনুষ্ঠান। বেহুলাসতী মৃত লখিন্দরকে নিয়ে গাঙুড়ের জলে ভেসে যাওয়ার আগে শাশুড়ি ও জায়েদের কতকগুলি সেদ্ধ ধান দিয়ে বলেছিল, তার স্বামী যেদিন বেঁচে উঠবে সেদিন এই ধানগুলিতে চারা বের হবে। বেহুলার এয়োস্ত্রী থাকার স্মারক চিহ্নরূপে মনসা পূজার দিন মালোনারীরা এক অদ্ভুত অভিনব বিবাহের আয়োজন করে। ধানের চারা বা জালা প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এক মেয়ে বরের মত সোজা হয়ে চৌকিতে দাঁড়ায়, আরেক মেয়ে কনের মত সাতবার তাকে প্রদক্ষিণ করে। তারপর দীপদানির মত একখানি পাত্রে ধানের চারাগুলি রেখে বরের মুখের কাছে নিয়ে প্রতিবার নিছে-পুঁছে নেয়। এইভাবে জোড়ায় জোড়ায় নারীদের মধ্যে বিয়ে হতে থাকে ও একদল নারী গান গেয়ে চলে। মালো নারীরা সুযোগ পেলেই 'পরস্তাব' বলে। এটা তাদের অবসর বিনোদন বা কিছু ক্ষেত্রে জীবনের ইতিহাস ব্যক্ত করতেও তারা করে থাকে। পৌষ সংক্রান্তির আগের দিনে পিঠে তৈরির সময় অনন্তর মা এক পরস্তাবের মধ্য দিয়ে নিজের জীবনের কথা বলেছে। কাজের ফাঁকে মালোর মেয়েরা শ্লোক বলে। প্রাত্যহিক সহজ সরল জীবনের মাঝে এগুলো তাদের পরিশ্রম লাঘবের একটা উপায়। এমন অনাবিল হাসুকৌতুকপূর্ণ ভাবপ্রকাশের অনায়াস প্রয়োগ তাদের লোকজীবনের মধুর একটা দিককে উদ্‌ভাসিত করে।

মালোদের নিজস্ব সংস্কৃতির একটা বড় অঙ্গ হল গান। এ প্রসঙ্গে দিগেন বর্মণ-এর

মন্তব্যটি স্মরণ করতেই হয়—

> ''মালোজীবনের মহাকাব্য 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে পাওয়া যায় মালো সম্প্রদায়ের কাব্যিক ভাষা ও তাদের জীবনের সংস্কৃতিকে— যেখানে প্রধান ভূমিকা নেয় লোকসঙ্গীত। শ্রমজীবনের ছন্দ থেকেই এই সঙ্গীতের উদ্ভব। শ্রমধ্বনির বৈশিষ্ট্য তিতাসের পাড়ের মানুষের কথা যেন সঙ্গীতের মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন অদ্বৈত্য মল্লবর্মণ।''[৮]

এই গান তারা পুরুষানুক্রমে গেয়ে থাকে। এর ভাব যেমন মধুর, সুরও তেমনি অন্তরস্পর্শী। এই গানগুলি মালোদের প্রাণের সঙ্গে মিশে আছে। যেহেতু মালোরা বেশিরভাগই 'কৃষ্ণমন্ত্রী' তাই রাধা-কৃষ্ণলীলাকে অবলম্বন করে এই গানগুলির পালা সাজানো হয়। এর সঙ্গে মিশে থাকে দেহতত্ত্ব। রধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার মান-অভিমান-মিলন-বিরহ মালোদের নিজস্ব সুরে ছন্দে কথায় স্পন্দিত হয়ে হৃদয় ছুঁয়ে যায়। মালোদের এই গানের সুরে ভাষায় বেদনা বিধুর ভারাক্রান্ত পরিবেশ তৈরি হয়। মাছ ধরতে ধরতে, দাঁড় বাইতে বাইতে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে, কাজে-অকাজে তারা গান গায়। তাদের জীবন সঙ্গীতময়, গানের মধ্য দিয়েই তাদের দৈনন্দিন জীবন প্রবাহিত হয়।

বলা বাহুল্য এইসমস্ত সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্য দিয়েই কোনো সমাজের সামাজিক কাঠামো এবং বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায়। তাছাড়া বিশেষ সংস্কৃতির যে খন্ড পরিচয় লোকাচারগুলি বহন করে তা থেকে সমগ্র জনগোষ্ঠীর ক্রিয়াকর্মের পরিচয় ফুটে ওঠে। পাশাপাশি এও উল্লেখ্য—

> ''এখানে একটি জাতির সমগ্র জীবনের সংরক্ষিত ও সভ্যতার ইতিহাস, তার লোকাচার, সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের বিন্যাস, তাদের গীতিময় উত্তরাধিকার, ধর্মীয় ঐতিহ্য— সবই অদ্বৈতর রচনায় ফুটে উঠেছে।''[৯]

সমাজকে ঐক্যমন্ত্রে বাঁচানোর জন্য অনেকসময় এগুলি সহায়কের ভূমিকা পালন করে। অন্তত তিতাস তীরবর্তী মালোসমাজের ক্ষেত্রে তাদের সুসংবদ্ধ লোকসংস্কৃতি তাদের একতার প্রতীক ছিল। কিন্তু সেই একতায়, সেই গর্বে ভাঙন ধরতে বা আঘাত হানতে বেশি সময় লাগেনি। নাগরিক সভ্যতা বিমুখ মানুষগুলি ভালো ছিল তাদের লোকসঙ্গীতের অফুরান ভান্ডার নিয়ে, কিন্তু শহুরে যাত্রাগানের বাদ্যবাজনায় তারা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সুবলার বউ অর্থাৎ বাসন্তীর প্রতি কুৎসিত মন্তব্যে প্রথম মালোপাড়ার সঙ্গে যাত্রাদলের লোকেদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বাসন্তী এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। যদিও যাত্রাদলের লোকেরা স্থির করে তারা সামনাসামনি প্রতিশোধ নেবে না। মালোদের তারা হাতে না মেরে অন্যভাবে মারার প্রস্তুতি নিয়েছে। মালোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে

তারা ভাঙ্গন ধরাতে সচেষ্ট হয়েছে। প্রথম দিকে সবাই একজোট হয়ে যাত্রাগানের বিরুদ্ধে নিজেদের গানের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ক্রমশ জনতা গিয়ে ভিড়েছে যাত্রাগানের আখড়ায়। হরিবংশ গান বা নাম সংকীর্তন যা মালোদের সকলের প্রাণের গান, যত দূরেই থাক একবার সুর কানে গেলেই যা তাদের প্রাণের মধ্যে অনুরণিত হয়, কাছে থাকলেই তারা গলা মেলায়, সেই গানের আকর্ষণও ফিকে হয়ে গেছে যাত্রাগানের কাছে। একসময় মোহন ও সুবলার বউ বাসন্তী ছাড়া আর সকলেই যাত্রার আসর ভরিয়ে তুলতে ছুটেছে। লেখকের কথায়—

> "...আজ কোথায় যেন তাদের সে সংস্কৃতিকে ভাঙ্গন ধরিয়েছে। সেই গানে সেই সুরে প্রাণ ভরিয়া তান ধরিলে চিত্তের নিভৃতিতে ভাব যেন আর আগের মত দানা বাঁধিতে চায় না, কোথায় যেন কিসের একটা বজ্র দৃঢ় বন্ধন শ্লথ হইয়া খুলিয়া খুলিয়া যায়। যাত্রার দল যেন কঠোর কুঠারাঘাতে তার মূলটুকু কাটিয়া দিয়াছে।"[১০]

সংস্কৃতির অবক্ষয়ের ফলে মালো সমাজের চিরাচরিত ঐক্যবোধের মূলেও ফাটল ধরেছে। আর তখন থেকেই শুরু হয়েছে তাদের দুঃসময়। এতদিন তারা আঁটসাট সামাজিকতার সুদৃঢ় গাঁথুনির মধ্যে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু পাড়ার মধ্যে যাত্রার দল ঢুকে সেই ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে। সাংস্কৃতিক প্রবহমানতা যখন রুদ্ধ হয়েছে তখন মালোদের জীবনে আরেক চিরায়ত প্রবহমানতারও অকস্মাৎ মৃত্যু হয়েছে। মালোদের কাছে অভাবনীয় অকল্পনীয় ঘটনা তিতাসের জল শুকিয়ে যাওয়া। তিতাসের বুকে চর জেগে উঠলে দূরদূরান্তের কৃষকেরা দল বেঁধে এসে তিতাসের বুকের মাটি কর্ষণ শুরু করেছে। যে তিতাসে এতদিন ছিল মালোদের একাধিপত্য, সেই তিতাস অচিরেই তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। মালোরা ভাবে— "তিতাস যেন একটা শত্রু। নির্মম নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে সেই শত্রু। আজ সম্পূর্ণ অনাত্মীয় হইয়া গিয়াছে।"[১১]

তবে শুধুমাত্র নিয়তির প্রতি দোষারোপ ব্যতীত মালোরা আর বিশেষ কিছু প্রতিবাদ করে উঠতে পারে না, কারণ নিজেদের মধ্যে দীর্ঘকাল দলাদলির ফলে তারা একযোগে লড়াই করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। একাধারে সাংস্কৃতিক ভাঙন, অন্যদিকে তিতাসের বুকে চর জেগে উঠে মালোদের জীবন বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত করে তোলে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও তারা বিবাদে লিপ্ত হযেছে। রোজগারের প্রতি আর আগের মত তাদের তাগিদ থাকে না। লেখকের কথায়— "তিতাসের মাছ ফুরাইয়া গেলে মালোরা আগে তোড়জোড় করিয়া প্রবাসে যাইত। এখন আর যায় না।"[১২]

শহুরে সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নব্যযুবক সম্প্রদায় হুঁকো ছেড়ে সিগারেট খেতে শিখেছে। নৈতিক অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে গুরুজনদের

প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব। শুধুমাত্র সমাজে নয়, পরিবারেও ভাঙন শুরু হয়েছে। মালোদের পাড়াতে যাত্রাওয়ালাদের যাতায়াত শুরু হয়েছে। মালো নারীদের কাছে যাত্রায় দেখা সেই সব রাজা, রাজপুত্র, সেনাপতি এক একটি অসাধারণ পুরুষ। বলাবাহুল্য মালো পুরুষেরা সেটা ভালো চোখে দেখেনি। বাড়ির মহিলারাও সাজসজ্জার পেছনে বেহিসাবি খরচ শুরু করে। যদিও এই অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। রোজগারের অভাবে মালোপাড়া ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হতে শুরু করে। উপবাসে দিন কাটাতে কাটাতে তারা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়েছে। বাড়ির বউরা বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা শুরু করেছে, বাকিরাও তাদের অনুসরণ করছে, যদিও নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তারা কেউ রক্ষা পায়নি। অনাহারে, অর্ধাহারে জর্জরিত মানুষ দেশছাড়া হয়ে আসাম যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে।

শুধু অনন্ত এইসব কিছু থেকে দূরে থেকেছে। শহুরে পরিমণ্ডলে পড়াশোনা শিখে সে আপাদমস্তক শহুরে হয়ে উঠেছে। বনমালী যখন তাকে ভদ্রলোক বলে পরিচয় দিয়েছে তখন বাসন্তী উদাস হয়ে গেছে, ভেবেছে— "ভদ্রলোকের সঙ্গে থাকে। ভদ্রলোকে যদি তারে যাত্রা শিখাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে।"[১৩]

যদিও অনন্ত যাত্রাদলের সজ্জিত ভদ্রলোক না হলেও শিক্ষিত ভদ্রলোক হওয়ার নমুনা দেখিয়েছে, মাসির জন্য শাড়ি পাঠাতে সে ভোলেনি, তবে গ্রামের দুর্দিনে সে ফিরে আসার কথা ভাবেনি। গ্রামে গ্রামে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ছুটে গেছে, একসময় সে এসেছে গোকর্ণঘাটে। ভাতের জন্য থালা হাতে শহরের বাবুদের কাছে দাঁড়িয়েছে বাসন্তী, তার দিকে ভাত দিতে এগিয়ে গেছে অনন্ত, চিনতে পেরেই বাসন্তী নিঃশব্দে সরে পড়েছে। কোথাও গিয়ে মনে হয় অনন্তও যেন নিজেকে মালোপাড়া থেকে সমূলে উৎপাটিত করেছে। বলাবাহুল্য সমগ্র মালোসমাজই যেন নিজেদের অন্ধ মোহের বসে সমূলে উচ্ছেদ করেছে, আর তাই হয়তো অভিমানে তিতাস বদলা নিয়েছে তাদের প্রতি।

মালোদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে শহুরে যাত্রাদলের অনুপ্রবেশে মালোদের চিরায়ত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের স্খলনকে লেখক এক বিশেষ তাৎপর্যবাহী রূপ দিয়েছেন একই সময়ে তিতাসের জনশূন্য হয়ে যাওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়ে। আসলে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে নদীনির্ভর মালোরা যেমন তিতাসকে বাদ দিয়ে অতিস্তহীন, একইভাবে মালোদের নিজস্ব সংস্কৃতিও তাদের আত্মপরিচায়ক, সেই সাংস্কৃতিক অবনমনে মালোদের অস্তিত্বসংকট অবশ্যম্ভাবী। তিতাস এবং মালোদের লোকসংস্কৃতি-ই মালোদের একতার প্রতীক। দুটিই মালোদের আবেগের ধন, তাদের বড় আপনার। আর সেকারণেই লোকসংস্কৃতি যখন শহুরে সংস্কৃতির প্রভাবে মৃতপ্রায় হয়েছে এবং মালোরা তাকে রক্ষা করতে নিরুৎসাহ হয়েছে তখন তিতাসও বোধহয় বাসন্তীর মতই নীরব প্রতিবাদ করেছে নিজেকে জলশূন্য

করে। মালোদের সংস্কৃতি ও তিতাস সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত ছিল, তাই সংস্কৃতির অকস্মাৎ গতিরুদ্ধ হতেই তিতাসও তার পথ চলা বন্ধ করেছে। মালোদের দুর্দশা ও করুণ পরিণতি বর্ণনা বোধহয় অসমাপ্ত থেকে যেত তিতাসের প্রবাহ অব্যাহত থাকলে। তিতাসের মৃত্যুতেই এই উপন্যাস এক অসামান্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে পাঠকমনে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ : মল্লবর্মণ, অদ্বৈত : 'তিতাস একটি নদীর নাম', পুঁথিঘর, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ।

তথ্যসূত্র

১. হালদার, গোপাল : 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ', মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৮৬ খ্রি:, পৃ: ২০৫
২. 'তিতাস একটি নদীর নাম', পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮
৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩০
৪. ঢালী, সামন্ত : 'তিতাস পারের জীবন ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধ, অদ্বৈত মল্লবর্মণ সংখ্যা, দলিত মনন, প্রথম বর্ষ-দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রি., পৃ. ১১৫
৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৪
৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৪
৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৬
৮. বর্মন, দিগেন : 'পূর্ণ রূপের সন্ধানে : প্রসঙ্গ 'তিতাস'-এর অসমাপ্ত সঙ্গীত' প্রবন্ধ। 'ভাসমান' অদ্বৈত মল্লবর্মন বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৪, পৃ. ৩২
৯. জানা, সুস্নাত : 'তিতাস— জেলে জীবনের মহাকাব্য' প্রবন্ধ। 'চতুর্থ দুনিয়া' অদ্বৈত মল্লবর্মন বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৪, পৃ. ২৪৬
১০. ঢালী, সামন্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩১
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০

বিশেষ গ্রন্থঋণ

চক্রবর্তী, বরুণকুমার : 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ষষ্ঠ পরিমার্জিত সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০

মনের মানুষের খোঁজে রবীন্দ্রবাউল

বুদ্ধদেব দাস

রবীন্দ্র-মননের ব্যাকুল আত্মান্বেষাই রবীন্দ্রনাথকে করেছিল জনজীবন অভিমুখী।

পিতৃ-আদেশ পালনে রবীন্দ্রনাথ জমিদারী পরিদর্শনের ব্যাপারে কিছুকাল পদ্মাতীরবর্তী শিলাই পতিসর সাজাদপুর অঞ্চলে বসবাস করার সময়ে তিনি লালন ফকিরের বাউল গানের সংস্পর্শে আসেন এবং বাউলগানের ভাব-ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি স্বয়ং ঐ গান সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। তাঁর কাব্যরুচি ও সাধনাকেও তিনি কিয়দংশে বাউলগান ও বাউল সাধনার আধ্যাত্মমার্গের দ্বারা অনুরঞ্জিত করেন। অনেকে তাঁর কতকগুলি গান পুরাতন বাউল গানেরই আধুনিক মার্জিত রূপ বলে মনে করেন।

জীবনের পনেরটি বছর শিলাইদহে কাটানোর ফলে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছিল বিচিত্রচারী, তিনি মনে করেন "দেশকে মুক্তি দিতে হলে আগে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে, এসব মানুষদের আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, এদের মধ্যে একটা সচেতনতা আনতে হবে। এর জন্য চাই সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র শিক্ষা।''

গ্রামাঞ্চলের আর একটি দৃশ্যও কবিকে ব্যাকুল করে তুলেছিল— ''সন্ধ্যা আসন্ন। সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির শেষে চাষিরা ফিরছে ঘরে। মাঠের উপর স্তব্ধ অন্ধকার আর বাঁশঝাড়ের মধ্যে এক একটি গ্রাম যেন রাত্রির বন্যার মধ্যে আছে, ঘন 'অন্ধকার দ্বীপের মতো'। বাঁশবনে ঝিল্লির ডাক। প্রহরে প্রহরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে শেয়ালের ডাক। সমস্ত দিনের দুঃসহ শ্রমের পরে নিরানন্দ ঘরে জ্বলছে না আলো গান উঠছে না আকাশে আর শহরে তখন ? শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুতিক আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে সেখানে।''

কালান্তর গ্রন্থের লোকহিত প্রবন্ধে কবি বলেন— "লোকসাধারণ সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠেছি। তাদের জন্য কিছু করা উচিত বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু যে লোক সাধারণকে

আমরা প্রীতি করি না, তারা আমাদের হিতৈষণাকে প্রীতির দান বলে গ্রহণ করবে না, দয়ার দান বলেই মনে করবে। লোকসাধারণকে আমরা বারবার অবজ্ঞা ও অসম্মান করেছি। 'ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। আমাদের সেই মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। ইউরোপের লোক সাধারণ শিক্ষার আলোয় আত্মসচেতন হয়ে নিজেদের প্রাপ্য নিজেরা বুঝে আদায় করে নিচ্ছে। এতে তাদের অবমাননা ঘটেছে না।"

রবীন্দ্রাথের পল্লীমনস্কতা তাঁকে যেমন শিক্ষা চিন্তায় ও রাষ্ট্রচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছিল তেমনই এই স্বদেশ প্রেমই তাঁকে লোকসংস্কৃতি অন্বিষ্ট করে তুলেছিল। রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যে এই লোকায়ত চেতনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছাপ স্বভাবতই লক্ষণীয়। জীবনের প্রথম পর্বে লেখা 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' প্রভৃতি গীতিনাট্যের রচনায় ও চরিত্র পরিকল্পায় বিশেষত দস্যু চরিত্রে লৌকিক বিশ্বাসসংস্কার, লৌকিক ভাষারীতি ব্যবহার বিশেষ লক্ষণীয়।

'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাউলের গান' শীর্ষক রচনায় লোক সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রচেতনার সক্রিয় ও সজাগ আকর্ষণের প্রথম প্রকাশ লক্ষণীয়। মাত্র বাইশ বছর বয়সেই এই প্রবন্ধে তিনি বাংলা সাহিত্যের অবিনাশী 'মর্মস্থানটি' আবিষ্কার করে বলেছেন, ''যে ব্যক্তি নিজের ভাষা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের ভাষায় নিজে কথা কহিতে শিখিয়াছে, তাহার আনন্দের সীমা নাই।"

শিলাইদহে ও পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন পর্বে রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি জনজীবন সান্নিধ্যে এসেছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাই দারিদ্র লাঞ্ছিত মানবাত্মার অন্তরের নীরব বাণী, তাদের প্রাণের গভীর ব্যথা, জীবন সংগ্রামের ছোট আপাত তুচ্ছ সুখ-দুঃখ, তাদের রীতি-নীতি জীবনধারণ প্রণালী, বলাবাহুল্য এক কথায় দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন, এই সচেতনতা আবাল্য তাঁর মধ্যে সুপ্ত লালিত ছিল। বড়োদের থেকে, শৈশবে শোনা রূপকথার গল্প, ঘুমপাড়ানি গল্প, ভূতদের দেখানো নানা রকম ভয়, ছেলেভুলানো ছড়া ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তাঁর আশৈশব কৈশোরের স্মৃতিপটে বিধৃত সেই লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি তিনি ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন বিশেষ অনুরক্ত। তাঁর প্রথম জীবনে শিশুদের জন্য লেখা একাধিক কবিতায় এসেছে লোককথা। তাঁর মজ্জায়-রক্তে ধমনীতে মিশ্রিত এই কথা, শিশু ভোলানাথের পাতায় পাতায় তারই প্রমাণ।

স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছিলেন লৌকিক উপাদান সংগ্রহের দিকে। লোকসাহিত্য ব্যক্তি বিশেষের সাহিত্য নয়, তা গোষ্ঠীগত। এই সাহিত্য একান্তই মৌখিক। গ্রাম্য গাথা, গীত ও কথা সংগ্রহের দিকেই কবি মন দিয়েছিলেন শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগের সমান্তরালে তিনি শিক্ষিত বাঙালিকে আহ্বান করেছিলেন সংগ্রহের কাজে।

ফলস্বরূপ এতে যে শুধু সমাজ সভ্যতার ধারাবাহিক বিবর্তনের কথা জানা যাবে তাই নয়, এর মধ্যে দিয়ে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য যেমন উপকৃত হবে তেমনই দেশের লোকের 'সুখ-দুঃখ আশা ভরসা' সম্পর্কে ও অবহিত হওয়া যাবে। শুধু তাই নয় এক একটি লৌকিক ছড়ার অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং পাঠান্তর সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যাবে।

মাতৃভাষার উন্নয়ন এবং প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে সদাসচেতন রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন লোকভাষা যা দেশের জনসাধারণের মুখের ভাষা তার উন্নয়নের মধ্য দিয়ে মাতৃভাষার উন্নতি সম্ভব। কারণ প্রাকৃত বাংলার কেন্দ্রস্থলে লোকভাষার অধিষ্ঠান।

শুধু লোকায়ত সাহিত্যেই নয়, লোকসংগীত, লোকনৃত্য ও লোকনাট্যের স্বতন্ত্রপ্রভাব রয়েছে রবীন্দ্রনাথে। পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারায় লোকায়ত-অভিজাত দুই সংগীতেরই রস আস্বাদনের সুযোগ ছিল তাঁর। সমন্বয়ী সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক তিনি। যাত্রা, কবিগান, কথকতা, বাউল, কীর্তন, সব রকমের গানই তিনি ভালোবাসতেন, সুযোগ মতো সাহিত্যেও ব্যবহার করেছেন। ক্ষিতিমোহন সেনকে তিনিই প্রবৃত্ত করেছিলেন বাউল গান সংগ্রহে। তিনি নিজেও লালন ফকির বা গগন হরকরার গান বা পদ্মাবক্ষে নৌকাভ্রমণকালে মাঝিদের গান শ্রবণে জীবন সুখসম্ভোগের আনন্দধ্বনি তাঁর হৃদয়ে ধ্বনিত হত। এই গান তাঁর উপলব্ধিকে এক মহান সত্যের সম্মুখীন করেছে। গগন হরকরার—

'আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।' . . .[১]

বা লালনের ''খাঁচার ভিতর অচিনপাখি কেমনে আসে যায়'' রবীন্দ্রসাহিত্যে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। 'গোরা' উপন্যাসের সূচনায় রয়েছে লালনের এই গান। উপন্যাসের কেন্দ্রীয়ভাবের সঙ্গে এ গান সম্পৃক্ত। রবীন্দ্রনাথের লোকসংগীত প্রীতির প্রকৃত ও সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকে'বলেন্দ্রনাথের বিবরণ থেকে। শান্তিনিকেতনের আশ্রমে তিনি বৈতালিক প্রথার প্রবর্তন করেন এই বাউল গানের প্রেরণায়। 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ', 'তোমার খোলা হাওয়ায় পাল লাগিয়ে', 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'— সর্বত্রই রয়েছে সেই একই প্রেরণা।

লোকনৃত্যও কবিকে গভীরে ভাবে নাড়া দেয়। শান্তিনিকেতনের পাশ্বর্বর্তী সাঁওতাল গ্রামের সাঁওতাল নাচ, সাঁওতাল পল্লীতে বাঁধনা পরবের অনুষ্ঠান, বীরভূমের রায়বেঁসে নৃত্য রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল। মণিপুরী নৃত্যের প্রতিও তিনি আকর্ষণ বোধ করতেন। চিত্রাঙ্গদা নাটকে মণিপুরী নৃত্যপদ্ধতি থাকলেও তাঁর পাশাপাশি ছিল মালাবার

প্রদেশ, বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশের লোকনৃত্যের আঙ্গিক। 'শাপমোচন' নাটকে দক্ষিণ ভারতীয় লোকনৃত্যের ভঙ্গির অনুসৃতি। 'ফাল্গুনী', শারদোৎসব প্রভৃতি রূপক সাংকেতিক নাটকগুলিতে বালকের দল, ঠাকুরদা, ধনঞ্জয় বৈরাগী, বাউল প্রভৃতি চরিত্রগুলির নৃত্য পরিকল্পনায় বাউল সংগীত-নৃত্য এবং লোকায়ত নৃত্যের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়। 'নবীন' নাটকে একাধারে মণিপুরী নাচের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার বাউল, রায়বেঁসে ও ইউরোপের হাঙ্গেরিয়ান লোকনৃত্যের সমাবেশ ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাটকের লোকায়ত চিন্তা-চেতনার স্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়। তাঁর নাটকের লৌকিক নাট্যকলার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের ছাপ সুস্পষ্ট। গীতিপ্রধান লৌকিক অভিনয়কলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রথম দিকের নাটকগুলিতে (বাল্মীকি প্রতিভা, মায়ার খেলা প্রভৃতি) এই গীতিপ্রাধান্য লক্ষণীয়। দস্যুদলের রঙ্গরসিকতা সন্ন্যাসী বা একদল স্ত্রীলোক এবং মালিনীদলের চরিত্র ভাবনায় ও রূপকল্পনায় (বাল্মীকি প্রতিভার রুদ্রচণ্ড, প্রকৃতির প্রতিশোধ) লোকায়ত জীবন ও লোকনাট্যের প্রভাব লক্ষণীয়। রাজা ও রানী, বিসর্জন, মালিনী প্রভৃতি নাটক এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'রাজা' নাটকের মূল ভাবনায় বাংলার লৌকিক বাউল ভাবনার নিবিড় মিল আছে। বাউলের অধরা এখানে 'রাজা' স্বয়ং। বাউলের 'মনের মানুষ' এখানে রবীন্দ্রনাথের 'প্রাণের মানুষ'।

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে...[২]

'ডাকঘর' নাটকে বা 'মুক্ত ধারা' নাটকে লোকজীবনের সরল বিশ্বাস সংস্কারের ক্ষীণ উপস্থিতি লক্ষণীয়।'রক্তকরবী' নাটকে দেখি একদিকে রয়েছে নবান্নের গ্রামবাংলা, পৌষের গান অন্যদিকে মাদলের তালে তালে গাঁইতির সঞ্চার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও লৌকিক আমেজের যুগপৎ জাল বিস্তার করেছে। 'চিত্রাঙ্গদা' শ্যামা চণ্ডালিকায় ও লোকায়ত নৃত্য-ছন্দ অপরূপ সুষমা সৃষ্টি করেছে।

সামগ্রিক ভাবে বলা যায় লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির সর্ববিভাগেরই স্পষ্ট অস্তিত্ব অনুভব হয় রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ সঠিক ভাবেই অনুভব করেছিলেন, "সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনও দেশের সাহিত্যে নাই"। সেইজন্যই তিনি বারবার ছুটে গেছেন লোকায়ত সংস্কৃতির দিকে। খুঁজে পেতে চেয়েছেন আমাদের সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাভূমিকে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচেতনা, পল্লীচেতনা বা লোকায়ত চিন্তাচেতনা কোনটাই বিচ্ছিন্ন নয়, ঐক্যসূত্রে সংগ্রথিত।

শিলাইদহ-সাজাদপুর-পতিসর অঞ্চলে এক দশকের বেশি সময় ধরে রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণের সান্নিধ্য লাভ করেন। এর ফলে তাঁর জনজীবনমুখী মানবিক চেনতা যেমন আরও সমৃদ্ধ বা তেমনই তাঁর সাহিত্যও জনজীবনচেতনার বাস্তব রূপ প্রতিবিম্বিত হয়। শিলাইদহ-পর্বে রবীন্দ্রনাথের যে বিচিত্রমুখী অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল, সাধারণ মানুষের জীবনধারার যে রূপ তিনি দেখেছিলেন তাঁর সাহিত্যে তার যথার্থ প্রতিফলন লক্ষিত। কাজেই একথা অবশ্য স্বীকার্য যে শিলাইদহ পর্ব রবীন্দ্রজীবনে একটি গুরুত্বপূণ পর্ব। রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্য এই শিলাইদহ অঞ্চলের জীবনযাত্রার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

১৯০১-১৯৪১— রবীন্দ্রজীবনের এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরব্যাপী পরিণত পর্ব অতিবাহিত হয় বোলপুর-শান্তিনিকেতনে। নিজস্ব শিক্ষাচিন্তার আদর্শে রবীন্দ্রনাথ এখানে গড়ে তোলেন আশ্রম বিদ্যালয়।

শান্তিনিকেতনে একদিকে ছিল পল্লীসান্নিধ্য অন্যদিকে এই অঞ্চলের পাশ্ববর্তী অঞ্চল সাঁওতাল বিশেষত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই লোকায়ত জীবন রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। এদের শিল্প-সংস্কৃতি অজানা জগতকে জানার ব্যাকুলতা ছিল তাঁর মধ্যে সদাজাগ্রত। স্বভাবতই এই লোকায়ত জীবনের প্রভাব রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্য স্পষ্টত অনুভূত হয়।

শুধু জীবনযাত্রা নয়, শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের অনেক কর্মপদ্ধতির সঙ্গেও এই সাঁওতালি জীবন জড়িত। রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যে রয়েছে এই সমন্বয়ের চিত্র।

এই লোকায়ত আদিবাসীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একাত্মতা বোধ করতেন। তিনি বলতেন— 'আমি ব্রাত্য আমি মন্ত্রহীন।'[৩] এই মন্ত্রের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়ে তাই তিনি অনুভব করেন এ মন্ত্র রয়েছে সাধারণের মধ্যে। তখন বললেন—

'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক।' ...[৪]

দীর্ঘকালের এই রাঢ়বঙ্গে অধিষ্ঠান রবীন্দ্রজীবনের ও রবীন্দ্রসাহিত্যের রাঢ়ের মৃত্তিকায় ও মৃত্তিকালগ্ন লোকায়ত জীবনের সুস্পষ্ট ছাপ যে ফেলেছে তা বীথিকা কাব্যগ্রন্থের সাঁওতাল মেয়ে বা চিত্রবিচিত্র এর উৎসব বা ফাল্গুন প্রভৃতি কবিতা থেকে বোঝা যায়।

সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার আত্মস্থ করে নিয়েও রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন পশ্চাৎপদ অন্ত্যজ অনার্য শ্রমজীবী অগণিত মানুষের সংস্কৃতিকে যতক্ষণ না পর্যন্ত ভারতীয় সাধনার মূলস্রোতে প্রবাহের সঙ্গে সমন্বিত করা যাবে ততক্ষণ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধনের যে ভারতীয় অভিপ্রায়, তার সম্পূর্ণতা সাধিত হবে না। সে জন্যই তিনি সব ফেলে ছুটে

গিয়েছিলেন লোকসংস্কৃতির শীর্ণপ্রায় ধারাটির দিকে। স্বভাবতই রবীন্দ্রমননে উৎসবের অর্থ অনেক গভীর ব্যাপক, তাই এর দৃষ্টিতে শ্রুতিতে চেতনায়—

'দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিম্ ডিম্ রবে
সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব হবে...
আম্রের মঞ্জরী গন্ধ বিলায়
চম্পার সৌরভ শূন্যে মিলায়।...
বনচূড়া রঞ্জিল স্বর্ণলেখায়
পূর্বদিগন্তের প্রান্তরেখায়'...[৫]

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্ররচনাবলী, নবমখণ্ড, কামিনী প্রকাশনী, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১০৯৩।
২. ঐ
৩. রবীন্দ্ররচনাবলী, নবমখণ্ড, কামিনী প্রকাশনী, ২০০৪, পৃষ্ঠা-২৮৩।
৪. ঐ
৫. ঐ

শামসুর রাহমানের কবি মানসের নিরিখে ‘পান্থজন’

মিলনকান্তি সৎপথী

‘পান্থজন’ শিরোনামে কবি শামসুর রাহমানের দু’টি কবিতার কথা জানা যায়। কবিতা সমগ্র ১-এ ‘এক ধরনের অহংকার’ কাব্যের ২৭ সংখ্যক কবিতা ‘পান্থজন’। কাব্যটির প্রথম প্রকাশ— মাঘ ১৩৮১, জানুয়ারি ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রকাশিত হয়েছিল বইঘর, চট্টগ্রাম থেকে। উৎসর্গ করেছিলেন— আবু সয়ীদ আইয়ুবকে। এই কাব্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতা হল— ‘এক ধরনের অহংকার’, ‘বুদ্ধদেব বসুর প্রতি’, ‘এখন আমি’, ‘ছেলেবেলা থেকে’, ‘তোমার স্মৃতি’, ‘নিজের ছায়া’, ‘প্রত্নতাত্ত্বিক’, ‘আততায়ী’, ‘জাদুঘর’ ইত্যাদি। কবিতা সমগ্র ৩-এ ‘এক ফোঁটা কেমন অনল’ কাব্যের ৮ সংখ্যক কবিতার নাম ‘পান্থজন’। এই কাব্যের মোট কবিতা সংখ্যা ৩৭টি। কাব্যটি বিউটি বুক হাউস, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল পৌষ ১৩৯২, জানুয়ারি ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে। প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন— কাইয়ূম চৌধুরী, উৎসর্গ করেছিলেন কথাশিল্পী শওকত ওসমান-কে। এই কাব্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতা— ‘আত্মচরিত’, ‘এই মাতোয়াল রাইত’, ‘পাস্তারনাকের কবরে’, ‘ফিরে আসি তোমার কাছেই’, ‘কবির কবর’, ‘নিয়তি আমার প্রতিপক্ষ’, ‘ঠিকানা জানা নেই’ ইত্যাদি।

পূর্বোক্ত দু’টি কাব্যের কালগত ব্যবধান এক দশকের বেশি সময়। দু’টি কবিতাই লেখা স্বাধীন বাংলাদেশের পটভূমিতে। প্রথমটির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ— বঙ্গবন্ধুর শাসনাধীন। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ— স্বৈর শাসকের অধীন। স্বাধীন বাংলাদেশের পুরোধা কবি-ব্যক্তিত্ব শামসুর রাহমান প্রথমটিতে যে ভাবনা বা ধারণার প্রকাশ ঘটিয়েছেন— দ্বিতীয়টিতে তেমন নয়। কবির ‘এক ফোঁটা কেমন অনল’ কাব্যের ‘পান্থজন’ কবিতাটিকে বেশি গুরুত্ব দিতে চাই— এই কারণে, এই কবিতায় কবির আন্তর্জাতিক মানবিকবোধের প্রকাশ ঘটেছে অপূর্বভাবে। বিপরীতে প্রথম কবিতাটিকে একেবারে গুরুত্বহীন ভাবারও কোনো কারণ নেই। আলোচনার পূর্বে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য দুটি কবিতাই এখানে উদ্ধৃত

করছি। প্রথম কবিতাটি—

পান্থজন

আমিও রেখেছি নগ্ন পদযুগ, ফোস্কাময়, এ জগতে। জলে
আয়না আছে বলে নিয়ত এড়িয়ে গেছি জলাশয়,
জলজ দর্পণে মজে সমাজ-সংসার কী অতলে
ডুবিয়ে পুরাণ হতে চাইনি কখনো। বড় ভয়

ছিল সেই লতাগুল্মময় জলাশয়কে আমার, কিন্তু তবু
মায়াবী বাণিজ্যে নিঃসঙ্গতা আমাকে নিয়েছে কিনে
কেশাগ্র অবধি, তাই বৈশাখের তীব্র দাহে প্রভু
তন্ন তন্ন করে জল খুঁজি। টলটলে অমন দর্পণ বিনে

বাঁচা দায়; প্রভু তুমি সেই জল ? আমি ছলচ্ছল আকাঙ্ক্ষায়
কখনো নিজেকে কখনোবা দূরে পদযাত্রা করে বারংবার
পাখির পালকে পাথরের দিকে চোখ রেখে দেখি শূন্যতায়
বিপন্ন উধাও তুমি, দর্পণে আমার মুখ কতিপয় হাড়।

এ কোন বৈশাখে আমি অকস্মাৎ পৌঁছে গেছি দীপ্র
জলাশয় খুঁজে খুঁজে ? চতুর্দিকে বালি ভয়ানক
জান্তব, ক্ষুধার্ত; আমি, রুক্ষ, তৃষ্ণাতুর, খুঁড়ি ক্ষিপ্র
ক্রূর বালি ফোয়ারার লোভে। আমার দশটি নখ
ব্যর্থ, কালো; ওষ্ঠে গণ্ডে বালুকণা আর সীবন-রহিত জমা
খন্ড খন্ড হ'য়ে খসে বিচূর্ণিত স্মৃতির মতন।

একপাল উন্মত্ত উটের শব্দ মাথার ভেতর, তপ্ত তামা
চতুস্পার্শে তরঙ্গিত সর্বক্ষম। গুপ্ত মায়াবী বাণিজ্যে ধন—

রত্ন পাব বলে এই কংকাল কণ্টকময় পথে
চলেছি সন্তের মতো উপবাসে। জলাশয় না পেলেও হেঁটে
হেঁটে যেতে হবে চিরদিন; কেননা কাঙাল আমি এ জগতে
স্বেচ্ছায় চেয়েছি হতে পান্থজন, যতই ঝরুক রক্ত পদযুগ ফেটে।[১]

—মোট পাঁচটি স্তবকে (৪+৪+৪+৬+৬) ২৪টি চরণে এই কবিতাটি লেখা। এই কবিতার ভিতরেও ধ্বনিত হয়েছে সমকাল এবং ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বের যন্ত্রণা ও এষণার কথা। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ের প্রতিচ্ছাপ কবি ও কালকে কিভাবে মুখোমুখি বসিয়েছে তা এই কবিতায় উপযুক্ত শব্দ ও চিত্রকল্পের বিন্যাসে মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক এবং রাষ্ট্রীয় বৈরীতা ডিঙিয়ে শুভবাদী দিগন্তের ঐকান্তিক খোঁজে সত্তায় নিহিত 'যাত্রী' শব্দটিকেই বহন করতে হবে। মানব অভিযাত্রায় এই কৃষ্ণগহ্বরের অবসান— এমনই একটি আশা বা দিশা কবিতার শেষ স্তবকে সন্তবাণীর মতোই ধ্বনিত হয়। 'যতই ঝরুক রক্ত পদযুগ ফেটে'— 'জলাশয় না পেলেও হেঁটে/হেঁটে যেতে হবে চিরদিন'— এই আন্তর অনুভবেই চরৈবেতির ঐতিহ্য।

দ্বিতীয় কবিতা—

পান্থজন

বহু পথ হেঁটে ওরা পাঁচজন গোধূলিতে
এসে বসে প্রবীণ বৃক্ষের নিচে ক্লান্তি মুছে নিতে।
গাছের একটি পাখি শুধায় ওদের—
'বলতো তোমরা কারা ?' প্রশ্ন শুনে পান্থজন
ঝুঁকে পড়ে নিজের বোধের
কাছে; বলে একজন, 'হিন্দুত্বের প্রতি আজন্ম আমার টান'।
দ্বিতীয় জনের কণ্ঠ বাঁশির মতন
বাজে, 'আমি বৌদ্ধ, হীনযান।'
এবং তৃতীয় জন বলে, 'আমি এক নিষ্ঠাবান
বিনীত খ্রিস্টান।'
চতুর্থ পথিক করে উচ্চারণ, 'আমার ঈমান
করেছি অর্পণ আমি খোদার আরসে,
আমি তো মুসলমান।'

পঞ্চম পথিক খুব কৌতূহলবশে
কুড়িয়ে পতঙ্গ এক বলে স্মিত স্বরে, 'আমি মানব সন্তান।'[২]

শামসুর রাহমানের সৃষ্টিশীল কবি মানসের নিরিখে এই দ্বিতীয় কবিতাটির প্রাসঙ্গিকতা কোথায়— তা আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের শিরোনামের উদ্দেশ্য।

অবিভক্ত বাংলার ঢাকা শহরে ৪৬ মাহুতটুলিতে কবি শামসুর রাহমান ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর মাতামহের (মুন্সি আফতাবউদ্দিন আহমদ) বাড়িতে ভূমিষ্ঠ হন। পৈত্রিক বাড়ি নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার পাড়াতলী গ্রাম। মুন্সি কলিমউদ্দিন আহমেদের চতুর্থ পুত্র মুখলেসুর রহমান চৌধুরীর সন্তান শামসুর রাহমান (প্রথমে রহমান লিখতেন, পরে রাহমান), মা— আমেনা বেগম। পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান শামসুর। কবির ভাই বোন ১৩ জন। পড়াশুনার হাতেখড়ি— পুরনো ঢাকার পোগেজ স্কুলের প্রাইমারি সেকশনে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৪৫— পোগেজ ইংলিশ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন দ্বিতীয় বিভাগে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত তখন ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ব বাংলায় অনুভূত হয়েছে। দাঙ্গা, হরতাল, মিছিল, স্কুল বন্ধ— এগুলি ছিল প্রাত্যহিক ঘটনা। এই প্রতিকূলতায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এ পাস করেন। ১৯৪৮ ভর্তি হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংরেজি বিভাগে বি.এ অনার্স শ্রেণিতে। অতিরিক্ত সাহিত্যানুরাগে অনার্স পরীক্ষা দেননি, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে বি.এ পাস করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. প্রিলিমিনারি প্রথম পর্বে ভর্তি হলেও— শেষ পর্বের পরীক্ষা দেননি।[৩]—ইতিমধ্যে নলিনীকিশোর গুহ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি তাঁর প্রথম কবিতা 'ভালোবাসার ইতিহাস ভুলতে পারি না' প্রকাশিত হয়। কবিতাটির নাম— কবি যদিও বলেছেন 'উনিশ শো ঊনপঞ্চাশ'—যা কোনো কাব্যে সংকলিত হয়নি। একসময় এই 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র সহ অনেকেরই লেখা বেরিয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা', ফজলে লোহানী এবং মুস্তাফা নূরউল ইসলামের 'অগত্যা', সৈয়দ আব্দুল মান্নানের মাসিক সাহিত্যপত্র 'তহজিব' ছাড়াও নিয়মিত লিখেছেন— 'সৈনিক', 'পূর্বাশা', 'পরিচয়', 'সংলাপ', 'সংবাদ' সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব বাংলার প্রথম আধুনিক কবিতার সংকলন 'নতুন কবিতা' (সম্পা. আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ খান)-য়, শামসুর রাহমানের কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শামসুর রাহমানের কবি-ভাবনায় স্বদেশ, সমকাল, স্বাশ্রয়ী সত্তা, গ্রামীণ— নাগরিক অনুষঙ্গ, পাশ্চাত্য কাব্যকলার সমীকরণ, রবীন্দ্র অনুধ্যান ব্যাপক— বৈচিত্র্যময়। কাজ করেছেন 'মর্নিং নিউজ'-এ সহ-সম্পাদকের, ১৯৫৮-'৬০ রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের

প্রযোজক রূপে। 'দৈনিক পাকিস্তান', 'দৈনিক বাংলা', সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা', 'কবিকণ্ঠ', 'অধুনা', সাপ্তাহিক 'মূলধারা' সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার যে আন্দোলন— সেই তীব্রতা সঞ্চারিত হয়েছে স্বাধীন বালাদেশ গঠনে ও তৎপরবর্তী পর্যায়েও। ১৯৬০-২০০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৬৫টি কাব্য, ১০টি ছড়া বই, চারটি উপন্যাস, বেশ কিছু ছোটগল্প, সংকলন গ্রন্থ, কিশোর পাঠ্য— 'স্মৃতির শহর' (অক্টোবর ১৯৭৯), স্মৃতিকথা 'কালের ধুলোয় লেখা' (একুশে বইমেলা ২০০৪), অনূদিত গ্রন্থ, বেশ কিছু উপসম্পাদকীয় প্রবন্ধ গ্রন্থ 'একান্ত ভাবনা' (লেখা হয়েছে ২ অক্টোবর ১৯৭২ থেকে ২৯ অক্টোবর ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে)-র বেশ কিছু ডায়েরি জাতীয় রচনা— তাঁর সৃষ্টিশীলচেতনার বহুমুখীদিগন্তের পরিচয় বহন করে চলেছে। আদমজী (১৯৬২), বাংলা একাডেমি (১৯৬৯), জীবনানন্দ দাশ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৩), আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্য পুরস্কার, মওলানা ভাসানি পুরস্কার, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক সহ বিভিন্ন সম্মাননা (১৯৯২-এ আনন্দ পুরস্কার, ১৯৯৬ রবীন্দ্রভারতী থেকে ডি.লিট, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট, ২০০৬-এ দিল্লিতে দ্য সার্ক পোয়েট সম্মাননা সহ বিভিন্ন সম্মাননা)-র অধিকারী কবি শামসুর রাহমান ১৭ আগস্ট ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাসীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কবির ইচ্ছানুযায়ী ঢাকায় বনানী কবরস্থানে, মায়ের কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়।

শামসুর রাহমানের সৃষ্টিশীল অনন্য ভুবনে পাঠক উপলব্ধি করেন— দীর্ঘ পদযাত্রার সেই কবিকে— যিনি স্বদেশের-সমাজের উত্তরণের স্বপ্নে বিভোর, আন্তর্জাতিক বোধে উজ্জীবিত, রবীন্দ্র ভাবনায়-বিশ্বাসী, একাধারে লোকজ আবার নাগরিক বৈদগ্ধ্যে মন্ডিত, কাব্যকলায় শিল্পকলানুষঙ্গ সহ বিভিন্ন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যবাদ, মিথ-পুরানের অব্যর্থ প্রয়োগে কবিতায় শিশির সম্পাত ও করোটিময় দীপ্ত প্রতিবেশ নির্মাণ করেন। শামসুর রাহমানের কবিতা জাতিসত্তার হয়ে ওঠার দীক্ষা দেয়, স্বদেশের মানচিত্র চেনতায়, ব্যক্তিবোধ ব্যাপ্ত করে পৌঁছে দেয় আন্তর্জাতিক মানচিত্রে। সন্ত্রাস নয়, লাশ নয়, গণতন্ত্রের অপমৃত্যু নয়, একনায়কী সরকারের রক্তচক্ষু নয়— শিউলি ফোঁটা সকাল, রক্তকরবীর ছোঁয়ায় আঁকা প্রাঙ্গণকে কাঙ্ক্ষিত করে তোলে। আছে পরাবাস্তবের গহীন দ্রাঘিমা, অতীতের উত্তরাধিকার, ঐতিহ্যে প্রগাঢ় অনুরাগ, সমষ্টির উজ্জীবনের প্রশস্ত শুভবাদী দিগন্ত। কীভাবে চলবে জীবন সেই পথের সঠিক হদিশ, আছে মীনরাজ্যে সেই অভিমন্যুর কথা, যে আর্তক্লান্ত খাঁতার রহিত, নিরুপায় অত্যন্ত একা। আবার হৃদয়ে মঞ্জুরিত হয়ে ওঠে বাউল, ভাটিয়ালি, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল, গালিব, রুমি, ওমর খৈয়াম— উৎস থেকে অভিমুখ। মৌলবাদ,

রক্ষণশীলতা, স্বেচ্ছাচার— স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তার কলম দায়বদ্ধ মানবিকতার পথটি সুগম করেছে বারবার। সার্ক সাহিত্য পুরস্কার গ্রহণ প্রদত্ত ভাষণে তিনি জানিয়েছেন— 'আমি অভিজ্ঞতা সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। ...সত্যের খোঁজে সাহিত্যই আমাদের পথ দেখায়। একজন লেখক, প্রথমত নিজেকে প্রকাশ করার জন্য এবং দ্বিতীয়ত সত্যের খোঁজে।'[৪]—কলম ধরেন বলে তিনি মনে করেন। এই প্রকাশ ও সত্যের খোঁজ তাঁর প্রথম কাব্যের বই— 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' (ফেব্রুয়ারি ১৯৬০, বার্ডস এন্ড বুকস, ঢাকা) থেকে শেষ কাব্যের বই— 'অন্ধকার থেকে আলোয়' (ফেব্রুয়ারি ২০০৬, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা) সংকলিত কবিতা সমগ্র।

শামসুর রাহমান ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৮-'৬৮'র মার্শাল 'ল, ১৯৬৯-'৭০-এর গণ-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যা, একনায়কী সরকার (জিয়াউর রহমান, জেনারেল এরশাদ) থেকে ১৯৯০ পরবর্তী বাংলাদেশের গণতন্ত্রী সরকার দেখা দীর্ঘ সময়ের এক কবি-ব্যক্তিত্ব। স্বাভাবিকভাবে সময় ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা তাঁর সব কটি কাব্যেই ঘুরে-ফিরে এসেছে। আমাদের মনে পড়বে তাঁর 'কবির কর্তব্য' প্রবন্ধটির কথা। দীর্ঘ এই প্রবন্ধ থেকে দু'টি উদ্ধৃতি নেওয়া যায়:

১. 'আমার বিবেচনায়, কোনো সৎ ও বিবেকবান লেখক তাঁর সমাজ ও পরিবেশের প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন না। যে সমাজে তিনি বসবাস করেন, তার দায় তাঁকে বইতেই হয়।'[৫]

২. 'মানুষের অপরিমেয় সম্ভাবনার পথ নির্দেশ করা, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার পরিধি সম্প্রসারিত করা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মানুষের মনে সৌন্দর্য উদ্রেক করে আনন্দের উদ্বোধন ও তাকে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করাই কবির কাজ।'

— এই দু'টি উদ্ধৃতি থেকেই শামসুর রাহমানের কবিমানসের প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আলোচ্য 'পান্থজন' কবিতাটি 'এক ফোঁটা কেমন অনল' (১৯৮৬) কাব্যের। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময় পর্বের কয়েকটি ঘটনার দিকে প্রথমে লক্ষ করা দরকার। বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বাংলাদেশে ফিরেন, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২— 'বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি' ১৪ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন, আর বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীকে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত করেন। বাংলাদেশের সংবিধান প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমেদ লিখেছেন— 'ডিমক্রাসি, সোশিয়ালিজম, ন্যাশনালিজম ও সেকিউলারিজম; এই চারটিকে আমাদের রাষ্ট্রের মূলনীতি করা হইয়াছে। এর সব কয়টির আমি ঘোরতর সমর্থক।'[৭] মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে

হত্যা করার পর বাংলাদেশে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে বাদ দেয়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় নিয়ন্ত্রণ দেখা গেল সংবাদপত্র ও গণতন্ত্রের উপর, প্রাধান্য পেল ইসলামিক চরিত্র। সংসদের ভূমিকাকে গৌণ করা হল। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে এক সেনা অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হলেন। উপরাষ্ট্রপতি সাত্তার প্রেসিডেন্ট হলেন। ১৯৮২ এর মার্চে সাত্তারকে সরিয়ে ক্ষমতায় এলেন জেনারেল এরশাদ। এরশাদের শাসনকাল ১৯৯০ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত। গণ-অভ্যুত্থানে এরশাদের পতন হলে, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে বি.এন.পি'র ক্ষমতা লাভ। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে শামসুর 'দৈনিক বাংলা' এবং সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'র সম্পাদকের পদ থেকে সরে যান। স্বৈরশাসকের সঙ্গে এ তার আপসহীনতার লড়াই। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়েছে— 'ভীষণ গোলকধাঁধা রাজনীতি, আমরা হারিয়ে ফেলি পথ' ('রঞ্জিতাকে মনে রেখে') বা—

'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ বিরানার; মুক্তিযুদ্ধ
হায়, বৃথা যায়, বৃথা যায়, বৃথা যায়।' ('উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ')

আবার এরই মাঝে এক আশ্রয়ীমন—

বয়স যতই বাড়ছে, ততই আমি সেই সমুদ্রের দিকে

যাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথ যার নাম,' (কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি)

'নিজ বাসভূমে' (ফেব্রুয়ারি ১৯৭০) কাব্য থেকেই শামসুরের কবিতার বাঁকটি সহজেই নজরে পড়ে। এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতা ১৯৬৯-এ লেখা। 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯', 'হরতাল', 'আমাদের শার্ট', 'দুঃস্বপ্নে একদিন', 'মা'—এর মতো কবিতা এই কাব্যের অন্তর্গত। আত্মজীবনীমূলক লেখা 'কালের ধূলোয় লেখা'য় কবির নিজস্ব মূল্যায়ন ছিল— মার্শাল 'ল' (১৯৫৮-'৬৮) সময়ে— 'রণনীতি বিমুখ এই আমি ক্রমান্বয়ে রাজনীতি-সচেতন হয়ে উঠলাম। আমার কবিতায় তার ছায়াপাত শুরু হয়। কিন্তু কবিতা যেন শ্লোগানধর্মী হয়ে না ওঠে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিল আমার গোড়া থেকেই।'[৮]—স্পষ্টই বোঝা যায়, দায়বদ্ধ কবিতার ভেতরেও নান্দনিকতার প্রশ্নটি যে নিহিত থাকবে সে বিষয়ে এই কবির দীপিত সচেতনতা। এই নিবিড় শিল্প অনুধ্যানের স্তরটি 'এক ফোঁটা কেমন অনল' কাব্যেও উজ্জ্বল।

প্রেসিডেন্ট এরশাদের শাসনামলে এই লেখা উক্ত কাব্যের কবিতাগুলিতে রাজনীতিমুখর পরিমণ্ডলটি ব্যক্তি অনুভবের আবেষ্টনে শিল্পীত স্বরগ্রামে বাঁধা। 'কুমোর' কবিতায় এই কাব্যের স্বর কিভাবে শোনা গেছে তা লক্ষ করার মতো—

'কী-যে হয় মাঝে মাঝে,

বসে থাকে চুপচাপ চা-খানায় কিংবা গৃহকোণে;
কিছুতে লাগে না মন তার কোন কাজে।
আবার কখনো রাত জেগে তারা গোণে;
এক ফোঁটা কেমন অনল
করে জ্বলজ্বল
হৃদয়ের ভেতরে, ...'

— সত্তার নিহিত আগ্নেয় আধিসের হদিশ কবি এভাবেই চেনাতে চান। 'আমার মাতামহের টাইপ রাইটার' কবিতায় কবির স্মৃতিতে আউসভিৎসের কন্সেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দি মানুষ যেমন ভিড় করে— ঠিক তার বিপরীতে উঠে আসে উপনিষদ তর্জমাকারী দারাশুকোর কথা, যিশুর মানবিক অভিযাত্রার কথা। 'একটি ফটোগ্রাফ', 'হাসান এবং পক্ষিরাজ'— জাতীয় কবিতাগুলিতে স্মৃতি ও বাস্তবে ব্যক্তি পরিসর এবং সীমাবদ্ধতার দিকটি উঠে আসে। লেখেন ব্যক্তির অসহায় একাকীত্বের কথা—

'বিমুখ প্রান্তরে, হে সতীর্থ, হে সুহৃদ।
এখনো আমরা আছি; এখনো সম্বল শুধু আর্তশব্দাবলী'। (হাসান এবং পক্ষীরাজ)

আবার সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মীতায় লেখা হয় পুরনো ঢাকার কথ্যভাষায় 'এই মাতোয়াল রাইত', কখনো বা 'মৌনব্রত' কবিতায় আত্মজৈবনিকতার সূত্রে পিতামহ, পিতা, নিজ পুত্রের কথা। এই কবিতাগুলির মধ্যে 'পান্থজন' কবিতাটির অভিমুখ ধর্ম— বর্ণের অমাবস্যা ডিঙিয়ে মানবিকতার পূর্ণিমার দিকে।

অনুবাদক শামসুর রাহমানের সৃষ্টিশীলতার পরিচয়— 'মাকোমিলিয়ানস' (মূল— ইউজন ও নিল, আগস্ট ১৯৬৭), 'হ্যামলেট ডেনমার্কের যুবরাজ' (শেক্সপিয়র, আগস্ট ১৯৯৫), 'বার্ট ফ্রস্টের নির্বাচিত' (অক্টোবর ১৯৬৮), 'খাজা ফরিদের কবিতা' (জুন ১৯৬৯) ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক আবহে কবি নিজেকে কতটা পরিশ্রুত করেছিলেন এগুলি তারই কিছুটা দিক বহন করছে। 'আমাদের মহান সতীর্থ শামসুর রাহমান' শীর্ষক প্রবন্ধে সৈয়দ শামসুল হক বলেছিলেন— 'শামসুর রাহমানই আমাদের শেষ ইউরোপ মনস্ক কবি'[৯]। 'পান্থজন' কবিতার ভিতরে সীমিত পরিসরে স্বীয় অর্জনে-চৈতন্যের যে অভিমুখ খুলে দিয়েছেন তা মনে করায় নাট্যকার জন গলসওয়ার্দির (John Galsworthy, 14 August 1867 - 31 January 1933) 'দ্য লিটল ম্যান' (The Little Man, Newyork, Charles Scribner's sons, April 1915, নাটকটি লেখা হয়েছিল অক্টোবর ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে) নাটকটির কথা। নাটকটির মোট তিনটি দৃশ্য, প্রথম দৃশ্যে আমেরিকান ও লিটল ম্যানের একটি সংলাপ—

American . ... (To the LITTLE MAN) what is your nationality, sir?

LITTLE MAN. I'm afraid I'm nothing particular'

জাতি ও রাষ্ট্রিক আভিজাত্যের মাঝে নাট্যকার সেই ছোট মানুষটির কথা তুলে ধরেছেন— যে মানবিকতায় মন্ডিত। ধর্ম-বর্ণের কৌলিন্যে বা দেশ রাষ্ট্রের আভিজাত্যে ব্যক্তি নামের মহিমা নয়, ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় তার মনুষ্যত্বে যা অপরকেও দীক্ষা দেয়। এই নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে আমেরিকান চরিত্রটিকে বলতে শুনি— 'I am inspired with a new faity in mankind' —মনুষ্যধর্মের এই ব্যাপ্ত বোধের দিকটি শামসুর রাহমানের 'পান্থজন' কবিতায় স্পষ্ট রূপ পেয়েছে।

ধর্মীয় যে আবেষ্টনে, স্বৈরশাসকের যে অনুশাসনে কবি বাংলাদেশকে দেখেছিলেন— ঠিক সেই নঞর্থকতার সংকীর্ণ গণ্ডি ভেঙে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন এই কবিতায়। পনেরোটি চরণে পাঁচজন মানুষের নাট্যিক-বাচিক অভিব্যক্তিতে বাস্তব ও সত্যের প্রকৃত দিশার সন্ধান উঠে এসেছে। বহু পথ হাঁটা মানুষের ক্লান্তি ও আশ্রয়ের কথা পাই জীবনানন্দ দাশ-এর 'বনলতা সেন' কবিতায়। এখানেও দেখি—

'বহু পথ হেঁটে ওরা পাঁচজন গোধূলিতে
এসে বসে প্রবীণ বৃক্ষের নিচে ক্লান্তি মুছে নিতে'।

—এই 'প্রবীণ বৃক্ষ'টি চিরন্তন প্রাকৃতিক উপলব্ধি বা মানবের শুশ্রূষার উৎসভূমি। 'গোধূলি' যেন সেই সন্ধিক্ষণ— যেখানে আলো— অন্ধকারের দ্বন্দ্বে ব্যক্তি তার আবিষ্কার-উদ্ভাসন-আশ্রয় খুঁজছে। আর গাছের পাখিটি যেন ধ্রুব সত্যের দরজা খুলে দিতে চাইছে। 'বলতো তোমরা কারা ?' এই প্রশ্ন যেন সমষ্টি মানব ইতিহাসের দিকে, যেখানে প্রতিনিধিত্বকারী চারজন— হিন্দু, হীনযান বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমান। ব্যক্তিনাম নয়, তাঁদের পরিচিতিতে উঠে আসছে স্বীয় জাতি— ধর্মীয় সত্তার প্রতি অমোঘ আকর্ষণ এবং অবশ্যই ঔদ্ধত্য। কিন্তু পঞ্চম পথিক এই সংকীর্ণ পরিচিতির পরিচ্ছেদের বাইরে সামূহিক সত্য দর্শনকে চেনায়—

পঞ্চম পথিক খুব কৌতূহল বশে
কুড়িয়ে পতঙ্গ এক বলে স্মিত স্বরে 'আমি মানব সন্তান।'

— শাহসুর রাহমান আজীবন এই সত্যেরই উপাসক ছিলেন।

এই কবিতার প্রাকরণিক দিকটিও নজর কাড়ার মতো। শব্দের কাঠিন্য নয়, কিছুটা বিবৃতি, দৃশ্যময়তা, নাট্য আবহে গোটা কবিতাটিই হয়ে উঠেছে স্বাশ্রয়ী-সংবেদী। চলচ্চিত্রের মতোই পরিবেশন প্রণালী, উপমা অলংকারের পরিমিতি বিন্যাস, কথ্যরীতির আদল, স্বগত স্বরগ্রামে মূল বক্তব্যের প্রতি নিবিড় অভিনিবেশ। ধীর লয়ে দ্বন্দ্ব ও সমাধানের বিচিত্র

সন্নিবেশে— শামসুর চিনিয়ে দেন কবিতার দায়বদ্ধতা এবং তার শিল্পীত সংরাগের যুগ্মতা। ‘পান্থজন’ কবিতাটি এ-ভাবেই বৈরীতা, আত্মম্ভরিতার বিপরীতে মানবের পূর্ণিমার যাত্রী হয়ে ওঠা চিরন্তন সত্যের পথ খুলে দিয়েছে। শামসুর রাহমান রচনাবলির ভূমিকায় তাঁর কবিতার গড়ন নিয়ে খান সারোয়ার মুরশিদের পর্যবেক্ষণটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য— ‘তাঁর কবিতা সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি— এ ভাষা থেকে শিক্ষিতজন, কুলীনজন কিংবা ব্রাত্যজনের বোল বাদ পড়েনি। তিনি কাব্যের ভাষাকে এমন নমনীয়তা দিয়েছেন যে তা গদ্যের খুব কাছাকাছি এসেও একটু খানিক অনুপ্রাণিত উষ্ণতার চাপে কবিতা হয়ে ওঠে। এ ভাষায় তিনি অনাটকীয় দৈনন্দিনতার বিবরণ দেন সেই সঙ্গে জীবনের সাধারণত্বকে মর্যাদা দেন।’[১০]

তথ্যসূত্র

১. কবিতা সমগ্র ১, শামসুর রাহমান, অন্যান্য, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৫।

২. কবিতা সমগ্র ৩, শামসুর রাহমান, অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

৩. সামসুর রাহমান : জীবনপঞ্জি, সামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ, ঢাকা, সম্পা. শামসুজ্জামান খান, আমিনুর রহমান সুলতান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১০, পৃ. ৩৪১।

৪. কবিতা প্রতি মাসে, বর্ষ ২, সংখ্যা ৭, সম্পাদক— বীজেশ সাহা, নভেম্বর ২০০৬, পৃ. ৬৮।

৫. সমকালীন বাংলা সাহিত্য, সম্পা. খান সারওয়ার মুরশিদ, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, প্রথম সংস্করণ : জুন ১৯৮৯, পৃ. ২৬৭।

৬. প্রাগুক্ত সূত্র ৫, পৃ. ২৭০।

৭. আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, আবুল মনসুর আহমদ, খোশরোজ কিতাবমহাল, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৪, পৃ. ৬০৩।

৮. শামসুর রাহমান গদ্যসংগ্রহ, সম্পা. গৌতম রায়, পুনশ্চ, কলকাতা : নভেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা- ২২২।

৯. প্রাগুক্ত সূত্র ৪, পৃ. ২৯-৩০।

১০. প্রাগুক্ত সূত্র ৩, পৃ. ২৬৭-২৬৮।

প্রেমাংশুর রক্ত চাই' কাব্যে কবি নির্মলেন্দু গুণের সমাজভাবনা

শুভম চ্যাটার্জ্জী

কবিতা কী এবং কীভাবে কবিতা সৃষ্টি হয় ?— এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। কিন্তু পাঠক সমাজ নিরন্তর এ রহস্যের দিকে ধেয়ে যান। কৌতূহল নিরসনের উদ্দেশ্যে বার বার ডুব দেন এই প্রশ্নের গভীরে। কবি সৃষ্টিকর্তা, তিনি সৃষ্টি করেন আর আমরা তার রসাস্বাদন করি। এর জন্যও প্রয়োজন গভীর জ্ঞান ও অনুশীলনের। একটি কবিতা সৃষ্টির পিছনে অনেকগুলি বিষয় কাজ করে। কবিতাটি সৃষ্টির পশ্চাতে কবির অনুপ্রেরণা, তাঁর মানসক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা একজন পাঠকের পক্ষে একান্ত জরুরি। তাছাড়া সময়কাল, উৎস-প্রক্রিয়া জানা থাকলে কবি বা সৃষ্টিকর্তা সর্বোপরি কবিতাটির সামগ্রিক রূপ আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অনেক সমালোচক এই মতের পরিপন্থী। তাঁরা মনে করেন কবিতার রহস্য যদি পাঠকের সামনে সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয়, তাহলেও রসাস্বাদনে ব্যাঘাত আসে। এরকম অনেক বাদানুবাদের পর আমরা যারা কবিতা পাঠক, কবিতা ভালোবাসি তারা রহস্যের বেড়াজাল টপকে কবিতার কাছাকাছি পৌঁছানোর নিরন্তর চেষ্টা করি। সৃষ্টির মুখোমুখি পৌঁছে সমগ্রতার স্বাদ অনুভব করলে মনে আসে প্রশান্তি— এ যেন এক বিরাট পাওয়া। এভাবেই সৃষ্টিকর্তা এবং পাঠকের মেলবন্ধন ঘটে।

কবি সমাজেরই একজন প্রতিনিধি আর তাঁর সৃষ্ট কবিতা সমাজের সঙ্গে জড়িত। কবিতার মূল উদ্দেশ্যই হল পাঠককে দীপ্ত করা এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কবিতার সৃষ্টি কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি-অভিজ্ঞতা থেকে হলেও সমাজে বসবাসকারী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-ব্যর্থতা, চারিপাশের পরিবেশ-পরিমণ্ডল, চিরন্তন সাশ্রয়ী রূপ, সংস্কৃতি-রাজনীতি এসবই কবিতায় উঠে আসে।

কবি ক্রান্তদর্শী অর্থাৎ বিশ্ব সংসারের অসীম ক্ষমতার অধিকারী তিনি। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে আবির্ভূত এরকমই একজন প্রতিনিধিস্থানীয় কবি নির্মলেন্দু গুণ। বিকৃত নাগরিক জীবন, হতাশাগ্রস্ত মানুষ, তাদের সংকট, ব্যক্তি মানুষের টানাপোড়েন, স্বৈরশাসকের চোখরাঙানি, প্রতিবাদী সত্তা এবং নারী-প্রেম-প্রকৃতি মিলেমিশে তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে ভিন্নধারার কবিতা। তিনি চিরপ্রচলিত প্রথা মান্য করে কবিতায় আবির্ভূত হলেও নিজ বৈশিষ্ট্য স্বকীয় ও স্বতন্ত্র। তিনি অনায়াসেই বলতে পারেন "পীড়িত আত্মার যন্ত্রণাকে আমি ভাষ্য দিতে চেয়েছি আমার কবিতায়।"[১] কবিতায় তিনি অকপট, যা দেখেছেন তাই কাব্যরূপ দেওয়ার চেষ্টা আজীবন করেছেন। নির্মলেন্দু গুণের জন্ম ২১ জুন, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে, নেত্রকোণা জেলার বারহাট্টা থানার কাশতলা গ্রামে। পরে কবি গ্রামের নাম পরিবর্তন করে রাখেন কাশবন। পিতার নাম সুখেন্দু প্রকাশ গুণ চৌধুরী এবং মাতা বীণাপাণি দেবী। চার বছর বয়সে বীণাপাণি দেবী মারা যাওয়ার পর বিমাতা চারুবালা দেবীর কাছেই তিনি মানুষ হন। কাশবন গ্রামেই পারিবারিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অর্থসংকট, কলহের মধ্যেই তাঁর বড়ো হয়ে ওঠা।

তিনি মেট্রিকুলেশন পাশ করে ভর্তি হন ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে। এখানে পড়াশোনা ছাড়াও তিনি বন্ধুদের সঙ্গে মিশে আড্ডা দেওয়া, তাস খেলায় মগ্ন হয়ে পড়েন। সেখান থেকে তারপর ভর্তি হন নেত্রকোণা কলেজে। এখানে মনের পরিবর্তন ঘটে। অবশেষে ১৯৬৪ সালে নেত্রকোণা কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বৃত্তিসহ আই.এস.সি পাশ করেন। ভালো রেজাল্ট করেও ফার্মেসিতে ভর্তির সুযোগ হয়নি। তার কারণ অবশ্যই চারিপাশের রাজনৈতিক অস্থিরতা। গ্রামে ভর্তির টাকা আনতে গিয়ে আর ঢাকা ফিরে আসা হয়নি। তারপর পরিস্থিতি শান্ত হলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য ঢাকায় যান। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলেও ভাইবা বোর্ডে তিনি আটকে যান। ভারতে তাঁর বড় ভাই আছেন— এই কথা বলার কারণে তাঁকে বাদ পড়তে হয়। কবি বলেছেন "ডাক্তারিতে গেলাম না, ফার্মেসিতে হয়েও হলো না, শেষে এক বছর গ্যাপ দিয়ে হতে চাইলাম ইঞ্জিনিয়ার— সেটাও হলো না, তখন বুঝলাম, একাডেমিক উচ্চশিক্ষা লাভ আমার ভাগ্যে নেই। আমি খুব লজ্জিত এবং অপমানিত বোধ করলাম।"[২] তারপর আবার তাঁকে আনন্দমোহন কলেজে পড়তে হয়। এর মাঝেও কিন্তু কবিতার প্রতি তাঁর টান কমে যায়নি। কবিতা লেখার শুরু কীভাবে সে কথা বলেছেন— "এদিকে বৃত্তির টাকা, অন্যদিকে হতাশা— এ রকম পরিস্থিতিতে আমার রক্তের ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা আত্মপ্রকাশ— উন্মুখ নেশাগুলো গুটিবসন্তের মতো ফুটে বেরুতে শুরু করে। অফুরন্ত আনন্দের তৃষ্ণা বাঁধ-ভাঙা প্লাবনের জলে খড়কুটোর মতো আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অগ্নিতে পেট্রোল ঢালার মতো আমি নিজেকে আনন্দের

অগ্নিতে নিক্ষেপ করি। মাঝে মাঝে খুব রাতে, যখন ঘুমিয়ে পড়ে সবাই এবং আমার যখন ঘুম আসে না, তখন বসি কবিতা লিখতে।"[৩]

সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় ক্লাসে বসে তিনি প্রথম কবিতা লেখেন। তারপর বন্ধু মতির সহায়তায় 'রঙধনু' পত্রিকা হাতে পান। এভাবে কিশোর নির্মলেন্দু গুণের মনে কবিতার প্রতি একটা ভালোলাগা সৃষ্টি হতে থাকে। ভালো ছাত্র হয়েও পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক অস্থিরতা, বৈরি রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্যই তিনি পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি। তিনি যখন দশম শ্রেণিতে পড়েন তখন 'উত্তর আকাশ' পত্রিকায় লেখেন 'নতুন কান্ডারী'। এরপর একের পর এক পত্র-পত্রিকায়, কলেজ ম্যাগাজিনে লেখালেখি শুরু করেন। নেত্রকোণা কলেজের বার্ষিক 'ময়ুখ', 'সাপ্তাহিক জনতা', 'আজাদ', 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় কবি প্রতিভার বিচ্ছুরণ আমরা লক্ষ করি। নির্মলেন্দু গুণ আপন কবি প্রতিভার বলে প্রকাশ্যে আসতে থাকেন। প্রকাশিত হয় একের পর এক কাব্যগ্রন্থ— 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' (১৯৭০), 'না প্রেমিক না বিপ্লবী' (১৯৭২), 'কবিতা,' 'অমীমাংসিত রমণী' (১৯৭২), 'দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী' (১৯৭৪), 'চৈত্রের ভালোবাসা' (১৯৭৫), 'আনন্দ কুসুম' (১৯৭৬), 'তার আগে চাই সমাজতন্ত্র' (১৯৭৯), 'শান্তির ডিক্রি' (১৯৮৪), 'অনন্ত বরফবীতি' (১৯৯৩), 'শিয়রে বাংলাদেশ' (১৯৯৮), 'নিশিকাব্য' (২০০৬)। শুধু কাব্যগ্রন্থ নয়, গল্পগ্রন্থের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে— 'আপন দলের মানুষ' (১৯৭৬), 'কালো মেঘের ভেলা' (১৯৮১), 'ভ্রমি দেশে দেশে' (২০০৪) ইত্যাদি। বোঝায় যাচ্ছে তাঁর সাহিত্য জীবন কতটা বিচিত্র এবং সমৃদ্ধ। তিনি চলমান কবি ব্যক্তিত্ব, তাই নিরন্তর এখনও লিখে চলেছেন। মূল আলোচনা পর্বে প্রবেশের পূর্বে আলোচনার সুবিধার্থে নির্মলেন্দু গুণের শৈশব, শিক্ষাজীবন এবং সাহিত্য সম্ভার সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, উত্তাল আবহাওয়ার ছবি ফুটে উঠেছে প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই। তার সঙ্গে রয়েছে গভীর প্রেমের আকুতি অর্থাৎ এই কাব্যগ্রন্থে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সঙ্গে প্রেম ভাবনারও সহবাস লক্ষ করা যায়। এখানে প্রখর সমাজভাবনার সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে আশ্চর্য কুশলতায় রোমান্টিক চেতনাকেও বইয়ে দিতে পেরেছেন। প্রতিবাদী সত্তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে নির্মলেন্দু গুণের মধ্যে আমরা রোমান্টিকতার ছাপ লক্ষ করি— এই বৈশিষ্ট্যই কবিকে অন্যদের থেকে ভিন্ন করেছে। দুই বাংলার সাহিত্যাঙ্গনে কবি হিসেবে নির্মলেন্দু গুণ বিশেষভাবে খ্যাত। জীবনের আঁকা-বাঁকা পথে, অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে তিনি নিজেকে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' দিয়েই তাঁর সার্থক কবিযাত্রা শুরু। তারপর আর তাঁকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আমাদের আলোচনা তাঁর 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' কাব্যগ্রন্থের

সমাজভাবনা। এই আলোচনার পূর্বে আবশ্যিক হয়ে পড়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) পরিবেশ-পরিস্থিতি নিয়ে দু-এক কথা বলা। যেহেতু সমাজভাবনাকে কেন্দ্র করে আলোচনা তাই এই বিষয়ে আলোকপাত না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭০, নভেম্বর। এই কাব্যের কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৬৪ থেকে ১৯৭০ সময় পর্বের মধ্যে। এই দীর্ঘ পাঁচ-ছয় বছরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে রয়েছে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা। একজন কবির বড় হয়ে ওঠা, চারপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতির ছাপ তাঁর লেখনীতে প্রভাব ফেলবে এ তো স্বাভাবিক বিষয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে 'নতুন কবিতা' সংকলন থেকে বাংলাদেশের কবিতার পথ চলা শুরু। তখন বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল। ১৯৪৭ সালের পরে বাংলাদেশকে নানা চড়াই-উৎরাই পথ ভেঙে এগোতে হয়ছে। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ, বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে যুক্তফ্রন্ট সরকারের জয়লাভ, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতালাভ, ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে সাংস্কৃতিক বিরোধ, ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা দাবি, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান— এই দীর্ঘ সময়পর্বের সাক্ষী কবি নির্মলেন্দু গুণ। তাঁর 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' কাব্যগ্রন্থে এই ছবি বিদ্যমান। কাব্যগ্রন্থটি বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে একটি মাইলস্টোন। প্রকাশ মুহূর্তের কথা কবি বলেছেন এভাবে "সারা দেশ যখন নির্বাচনী জ্বরে কম্পমান, অনভিজ্ঞ প্রসূতির মতো আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করতে গিয়ে আমি তখন ব্যগ্র এবং ব্যস্ত হয়ে পড়ি। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে আমার সময় কাটতে থাকে।"[৪] আবার নামকরণ নিয়েও ছিলেন তিনি চিন্তিত "বইটির জন্য আমি কয়েকটি নাম নিয়েই ভাবছিলাম। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। তখন জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত আমার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তিনি বলেন, আপনি 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' শীর্ষক কবিতাটির ভিত্তিতেই কাব্যগ্রন্থটির নামকরণ করতে পারেন। ঐ নামটিই আপনার কাব্যগ্রন্থের জন্য মানানসই হবে। নামের ব্যাপারে জ্যোতিপ্রকাশের সঙ্গে পূরবী বসুকে একমত হওয়াতে আমি আর দ্বিমত করিনি। আর যে-নামগুলো আমি বিবেচনায় রেখেছিলাম, সে-নামগুলো ছিল হুলিয়া, দাঁড়ানো মহিষ এবং আগুন নিয়ে বসে আছি।"[৫] কিন্তু "কিছুদিনের মধ্যেই বাইরে ব্যতিক্রমধর্মী প্রচ্ছদ এবং ভিতরে উত্তপ্ত রাজনৈতিক কবিতা থাকার কারণে বইটি পাঠকমহলে সাড়া জাগায় এবং আশাতীত বিক্রি লাভ করে।[৬] এরপর আসা যাক মূল আলোচনায়। প্রথম প্রকাশের (নভেম্বর, ১৯৭০) সময় কাব্যগ্রন্থটিতে ছিল ২৯টি কবিতা। পরে দ্বিতীয় সংস্করণে আরও দুটি কবিতা যোগ হয়েছে। মোট ৩১টি কবিতা নিয়েই

'প্রেমাংশুর রক্ত চাই'। এর বেশিরভাগ কবিতায় উত্তাল সময়পর্বের কথা ফুটে উঠেছে।

কবি নির্মলেন্দু গুণ প্রথম থেকেই সমাজ সচেতন। তাই প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেই সময় ও সমাজ ভাবনার ছাপ আমরা লক্ষ করি। তাঁর কবিতায় মানুষ, স্বদেশ, মাটি, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, প্রকৃতি, প্রেম ঘুরে-ফিরে এসেছে। তিনি যখন কবিতা চর্চা শুরু করেন তখন পূর্ব পাকিস্তানের মাথার ওপরে বিরাজ করছে আইয়ুব সরকার। অত্যাচার, নিপীড়ন এককথায় বাঙালি জাতির যাবতীয় স্বপ্ন-সম্ভাবনা ঘোর অন্ধকারে ডুবে ছিল। 'হুলিয়া' কবিতাটিতে তার বাস্তব প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেচে। 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই ? কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'হুলিয়া'। কবির নামে গ্রেফতারি জারি হয়েছে, তাই সে দীর্ঘ পাঁচ বছর পর গ্রামে ফিরেছে। তিনি বলেছেন—

"বারহাট্টায় নেমেই রফিজের স্টলে চা খেয়েছি,
অথচ কী আশ্চর্য, পুনর্বার চিনি দিতে এসেও
রফিজ আমাকে চিনলো না।"

সকলে চিনেও না চেনার ভান করছে। রফিজও পুলিশের ভয়ে ভীত। তাকেও নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে অত্যাচার করা হয়। একজন তরুণ যুবকের নামে হুলিয়া জারির পর সেই উত্তাল অবস্থার কথায় কবি এখানে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। তরুণ-যুবকদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, স্বৈরশাসকের অত্যাচার, তাদের নামে হুলিয়া জারি, আত্মগোপন করে থাকা সবই কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে। এই উত্তাপময় পরিস্থিতি যুবক সমাজের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর গ্রামে ফিরছেন, সেখানে তাঁর শৈশবের স্মৃতি কথা, প্রেম-ভালোবাসার কথা মনে পড়েছে। সেই পরিস্থিতির কথা ব্যক্ত করতে বলেছেন—

"শান্ত-স্থির-বোকা গ্রামকে কাঁপিয়ে দিয়ে
একটি এরোপ্লেন তখন উড়ে গেলো পশ্চিমে...।"

শান্ত-সরল জীবন নেই তাদের। কবিতাটির মধ্যে তৎকালীন স্বৈরশাসকের ভয়ঙ্কর রূপ, গ্রামের পরিবেশ, তরুণ যুবকের অসহায় অবস্থা ও স্বপ্নভঙ্গের কথা ফুটে উঠেছে। এই কবিতার মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন সমসাময়িক সমাজ, স্বদেশের আসল পরিস্থিতি।

'অশোক গাছের নিচে' কবিতায় দুপুরের গনগনে আগুনের প্রসঙ্গ এনে উত্তাল সময়ের কথা বলেছেন। সমাজের প্রাণহীন, উত্তেজনাহীন পরিস্থিতির কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি বিপরীতে এই নিস্তেজতার কারণ কবি খুঁজেছেন। কবি বলেছেন—

"কালোবাজারির মতো হয়তো সে বাতাসের মহাজন,

সমস্ত বাতাসগুলো বন্দী করে রেখেছে গোপনে,
নদী তীরে বিশাল গুদামে, মশাখালী স্টেশনের কাছে”

ম্রিয়মান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে লিখেছেন—

“অশোক গাছের নিচে হাওয়া নেই,
ক্রমশ হলুদ পাতা ঘাম হয়ে পিঠে-মুখে ঝরছে বগলে।”

প্রতিবাদহীন, নিশ্চল জনসমাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। চারিপাশের পরিমণ্ডল অনুকূল ছিল না। ‘সবুজ কাক’ কবিতায় সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন—

“কা কা করে ডাকে অন্ধকার, বাংলার জলে ভাসে
প্লাবনের হাঁস, সবুজ কাকের ঝাঁক উড়ে যায়,
চতুর্দিকে পুড়ে যায় রুগ্ন কচি ঘাস।”

যন্ত্রণায় জর্জরিত কবি বলে ওঠেন—

“জন্মভূমি বেড়ে ওঠে মানুষের নামে, মাংসে ক্ষতের মতো
জ্বলে ওঠে সীমান্তের লোহার সীমানা, আমার বয়স বাড়ে
যৌবনের মতো দ্রুত বাংলার পরিধি বাড়ে না।”

প্রতিকূল সময় ও সমাজের ছবি এখানে আমরা পেয়ে যাই। স্বদেশের অন্ধকারময়, রুগ্ন পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যেই যেন তরুণ স্বপ্নের বেড়ে ওঠা। যুবক কবিও এই পরিস্থিতির শিকার। যে সময় উজ্জ্বল আশা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার, সে সময়েই কবি দেখেছেন স্বদেশ-সমাজ-মাটির ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কবির লেখনীতে উঠে এসেছে এই ধরণের কবিতা।

কিছু কবিতায় দেখেছি রাজনীতি-প্রেম মিলেমিশে একাকার। এরকম একটি কবিতা ‘জনাকীর্ণ মাঠে জিন্দাবাদ’। শহীদ, গোরস্থান, রাজপথের মাধ্যমে সমকালীনতার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। কবি তাই বলেছেন—

“তুমি বোললে তাই আমরা এগিয়ে গেলাম,
নিষ্পাপ কিশোর মরলো আবদুল গণি রোডে।
তুমি বোললে রাজপথ মুক্তি এনে দেবে,
আমরা ভীষণ দুঃখী, নিপীড়িত শত অত্যাচারে
‘গীতাঞ্জলি’ অকর্মণ্য হবে।”

স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্য কবির লড়াই। তাই মুক্তির জন্য তিনি রাজপথেও নামতে

রাজি। গীতাঞ্জলির পরিবর্তে মাও সে তুং, গোর্কি, নজরুলকে সঙ্গে করে এগোতে চান, আবার ব্যক্তিগত নির্জতার বদলে এই ক্রান্তিকালে পল্টনের জনাকীর্ণ মাঠে গর্জে উঠতে চান জিন্দাবাদ বলে। আবার শেষে এসে কবি প্রেমের জয়গান গেয়েছেন। সামান্য কৌতুক ছলে 'জলের সংসার' কবিতাটিতে রূপোর থালা কল্পনা করা হয়েছে বাংলাদেশকে। থালাটি ভেসে যাচ্ছে—

"জলে ভেসে একটি রূপার থালা এসে গেছে সোনার শহরে।
নাগরিক, সামরিক নির্বিশেষে রিলিফে নিযুক্ত মানুষ
চতুর্দিকে ভিড় করে দেখছে থালাটা
ভাসছে নৌকার মতো জিন্নাহ অ্যাভিন্যুতে।"

সেই প্রসঙ্গেই বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) প্রকৃত পরস্থিতি, সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে এভাবে—

"সেনাবাহিনীর লোক চতুর্দিকে ভিড় করে আছে,
দু'হাতে রিলিফ নিয়ে আসছে সমাজসেবী,
ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ।"

একেবারে শেষে বুঝতে পারি এই থালাটি কীসের প্রতীক—

"স্বাধীনতা, মানবতা এবং সভ্যতা;
শব্দ ক'টি চোখে নিয়ে থালাটি ভাসছে একা।"

'অসভ্য শয়ন' কবিতায় ব্যক্তি মানুষের সংকট-সমস্যা, কণ্টকাকীর্ণ পরিস্থিতি, হতাশার ছবি ফুটে উঠেছে—

"তুমি এলেই দেখতে পেতে, শুয়ে থাকাটাই ঘুম নয়,
চারদিকে মশারির মতো নেমে-আসা সমস্যার ভিতরে
কিছু নেই, কেবল কবর খোঁড়ে অন্ধকার চোখের ব্যথায়!
আমি যত কাছে টানি, আলো তত দূরে সরে যায়!"

সময় ও সমাজের প্রতিচ্ছবি নিয়েই 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' কাব্যগ্রন্থ। আগেই বলেছি, এর সঙ্গে সমান্তরালভাবে বেশ কিছু কবিতায় প্রেমভাবনারও প্রকাশ দেখা যায়। তেমনই আরেকটি কবিতা 'যানবাহন নেই'। শহরে ব্যারিকেড, হরতাল, আন্দোলন তার মধ্যেই ভালোবাসার প্রসঙ্গ চমক সৃষ্টি করেছে—

"পালাবার পথ নেই, ব্যারিকেড চতুর্দিকেই,
যেন আন্দোলন চলছে প্রত্যহ।

যানবাহন চলবে না, আজকে অফিস নেই,
ভালোবাসা, তোমাকেও নগ্নপদে হেঁটে যেতে হবে।"

এই 'তুমি' কখনো কবির প্রিয়া, কখনো আবার স্বাধীন বাংলাদেশ—

"আমার চোখের কাছ দিয়ে, আমার বুকের কাছ দিয়ে,
আমার ভালোবাসার ফুটপাত ধরে তোমাকে হাঁটতে হবে।
আজ হরতাল, সমগ্র শহর জুড়ে আজ হরতাল।
গাড়ি-ঘোড়া নেই। ব্যারিকেড চতুর্দিকেই।"

'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' কবিতায় স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ, তুমুল প্রতিরোধ লক্ষ করা গেছে। 'প্রেমাংশু' এখানে স্বৈরাচারী শাসকের প্রতীক। তাঁর বিরুদ্ধে ক্রোধ-ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। এতদিন ধরে পশ্চিম পাকিস্তান ক্ষমতাবলে পূর্ব পাকিস্তানের গলা টিপে ধরে রেখেছিল। কবি এর থেকে নিস্তার চেয়েছেন। অন্ধকার পথ অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে স্বদেশের মানুষ, তারা আর পিছন ফিরে তাকাবে না। তাই কবির বজ্রকঠিন বাণী—

"আমাকে থাকতে হতো, আমাকে থাকতে হয়,
আমাকে থাকতে হবে, আমাকে থাকতেই হবে
লালশালুঘেরা স্টেজে, বক্তৃতায়, পল্টনের
মাউথ-অর্গানে, গণসঙ্গীতের নির্যাতিত রাতে।

তিনি বলেছেন প্রতিবাদের আগুনে, মানুষের মৃত্যু যন্ত্রণায় মানুষের পাশে এসে থাকতে হবে। যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁকে রুখে দাঁড়াতে হবে। প্রতিবাদে মুখর হয়ে জনতার সঙ্গে মিশে কবি বলেছেন—

"আমিও তো তোমাদেরই মতো প্রতিবাদে বলেছি তখন,
'প্রেমাংশুর বুকের রক্ত চাই', হন্তার সাথে আপোস কখনো নাই।'
বুকের বোতাম খুলে প্রেমাশুকে বলিনি কি— 'দেখো,
আমার সাহসগুলি কেমন সতেজ বৃক্ষ—,
বাড়ির পাশের রোগা নদীটির নীল জল থেকে
প্রতিদিন তুলে আনে লাল বিস্ফোরণ ?"

আবার বেশ কিছু কবিতায় স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে গ্রাম, গ্রামের শান্ত-স্থির প্রকৃতির কথাও উঠে এসেছে। কিন্তু স্বৈরশাসকের ভয়াল রূপের প্রভাব ঢাকা শহরেই নয়, তার চারিপাশের গ্রামগুলিতেও দেখা গিয়েছিল। শহর থেকে যারা অনেক দূরে, স্বপ্ন-আশা-ভালোবাসা

নিয়ে নিরপরাধ গ্রামবাসী বাস করতো তাদের মধ্যেও দেশীয় রাজনীতির আঁচ লেগেছিল। তারাও রেহাই পায়নি এই নিপীড়ন থেকে। 'একটি গৃহিণী গ্রাম, গ্রামবাসী' কবিতায় সে কথায় বললেন—

"এই গ্রাম উঠে যাবে, সভ্যতার কুটিল কুৎসায়,
ধিক্কারে, ষড়যন্ত্রে শুষ্ক হবে নদী।
এই গ্রাম উঠে যাবে;
সরল নিসর্গাবলী বন্দী হবে শহরে, সিটিতে।"

একই ভাবে অমিয় চক্রবর্তী-র 'পালাবদল' (১৯৫৫ খ্রি.) কাব্যগ্রন্থের 'ইতিহাস' কবিতাতেও দেখেছি বিশ্বনাগরিকতার সূত্রে সামাজিক অভিজ্ঞতার কথা। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে গ্রামগুলি নাগরিকতার আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে। যে গ্রাম তিলে তিলে গড়ে ওঠে সেই গ্রাম দ্রুত বদলে যাচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্যের করাল গ্রাসে গ্রামের মানুষজনের ঠাঁই গ্রামেই হচ্ছে না, তারা উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হচ্ছে। এই অভিবাদন ক্রিয়াটি বিশ্বজুড়ে কীভাবে প্রসারিত হতে চলেছে তারই প্রতিচ্ছবি আলোচ্য কবিতার শেষাংশ পাঠে আমরা পেয়েছি। একই অনুষঙ্গ নিয়ে নির্মলেন্দু গুণও 'একটি গৃহিণী গ্রাম, গ্রামবাসী' কবিতাটি লিখেছেন। এখানে সম্পন্ন, সমৃদ্ধশালী গ্রামের শ্রীমণ্ডিত রূপ এবং সেই রূপের ভিতর থেকে নিরাপত্তাহীনতা, শূন্যতা, বৈরি পরিমণ্ডলের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

'উন্নত হাত' কবিতাটিতে অন্যায়, অত্যাচার, বৈষম্যের কথা বলেছেন—

"আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে।
যুবক গ্রীষ্মে ফাল্গুন পলাতক,
পলিমাখা চাঁদ মিছিলে চন্দ্রহার—
উদ্ধত পথে উন্নত হাত ডাকে,
সূর্য ভেঙেছে অশ্লীল কারাগার।"

আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন। একজন স্রষ্টা তাঁর সমকালকে অস্বীকার করতে পারেন না। যা চোখের সামনে ঘটছে, যা তিনি প্রত্যক্ষ করছেন তা তো সাহিত্যের পাতায় উঠে আসবেই। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা দাবি, স্বৈরশাসকের চোখরাঙানি, বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে বারংবার ষড়যন্ত্র, ছাত্র আন্দোলন এবং ফলস্বরূপ ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান— এই সময় পর্বকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। নির্মলেন্দু তখন যুবক তরুণ কবি। তাই কলম ধরলেই এই ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রসঙ্গ বারবার 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' কাব্যগ্রন্থে উঠে এসেছে।

'চুক্তি', 'ভালোবাসার টাকা', 'হিমাংশুর স্ত্রীকে' ইত্যাদি কবিতায় প্রেমভাবনা, অবৈধ সম্পর্কের কথা ফুটে উঠেছে। 'অসমাপ্ত কবিতা'য় এসে উচ্চকণ্ঠে কবি বলেছেন—

"কবিতা আমার নেশা, পেশা
ও প্রতিশোধ গ্রহণের হিরন্ময় হাতিয়ার।"

কবি এখানে প্রতিবাদী, স্পষ্টবাদী। পল্টনের জনসমাবেশে জনতার উদ্দেশ্যে বলেছেন তিনি কবিতা লিখবেন না। তাহলে কী করবেন ? —নিজেই ঈষৎ ব্যাঙ্গের সুরে বলেছেন—

"আমার বক্তব্য স্পষ্ট, আমার বিপক্ষে গেলেই
তথাকথিত রাজনীতিবিদ, গাড়ল বুদ্ধিজীবী,
অশিক্ষিত বিজ্ঞানী, দশতলা বাড়িওয়ালা ধনী-ব্যবসায়ী
সাহিত্য-পত্রিকার জঘন্য সম্পাদক, অতিরিক্ত জনসমাবেশ
আমি ফুঁ দিয়ে তুলোর মতন উড়িয়ে দেবো।"

তিনি একজন সাহসী যোদ্ধা। মাতৃভূমির সংকট প্রসঙ্গে বলেন—

"ভাইসব, চেয়ে দেখুন, বাঙলার ভাগ্যাকাশে
আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, সুনন্দার চোখে জল,
একজন প্রেমিকার খোঁজে আবুল হাসান
কী নিঃসঙ্গ ব্যথায় কাঁপে রাত্রে, ভাঙে সূর্য,
ইপিআরটিসি'র বাস, লেখক সংঘের জানালা,
প্রেসট্রাস্টের সিঁড়ি, রাজিয়ার বাল্যকালীন প্রেম।"

ব্যঙ্গ-কৌতুকের সুরে যেন জনগণকে নিস্তেজতার বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। মেকি দেশভক্তি, চুপ করে বসে থাকলে যোগ্য জবাব দেওয়া সম্ভব না। এখানেই বোঝা যায় কবির সমাজ ও স্বদেশ চেতনা কতটা প্রখর। তাই লিখেছেন—

"আপনারা ভাবেন, আমি খুব সুখে আছি,
কিন্তু বিশ্বাস করুন, হে পল্টন,
মাঘী পূর্ণিমার রাত থেকে ফাল্গুনের পয়লা অবধি
কী ভীষণ দুর্বিষহ আগুন জ্বলছে আমার দুখের দাড়িতে,
উস্কখুস্কু চুলে, মেরুদণ্ডের হাড়ে, নয়টি আঙুলে,
কোমরে, তালুতে, পাজামার গিঁটে, চোখের সকেটে।"

বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে 'ভালোবাসার পুরনো বর্গায়' কবিতাটি একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা।

ভাষা আন্দোলন যখন হয় তখন গুণের বয়স মাত্র সাত। কিন্তু পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক অনেকগুলি কবিতা তিনি লেখেন। সেখানে ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা, শহীদদের সম্মান প্রতিফলিত হয়েছে। এই কবিতায় বলেছেন—

"তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে, কী আশ্চর্য,
সমস্ত যৌবন জুড়ে তর্ক ওঠে, আকাশে আগুন জ্বলে,
আন্দোলন বায়ান্নর পাঁচিল টপকায়।
তুমি তুমি নির্বিকার,
ঝুলে থাকো ঐতিহ্যের, ভালোবার পুরোনো বর্গায়।"

'দৃশ্যে-গন্ধে-রক্তে-স্পর্শে-গানে' কবিতায় কবি চেয়েছেন—

"অথচ আমি তো অনন্ত শৈশব চাই,
প্রসন্ন বিকেলের মাঠে ফিরে যেতে চাই,
আমি মানুষের শুভ্রতাকে চাই।"

আবার—

"আমি দৃশ্যে-গন্ধে-রক্তে-স্পর্শে-গানে
সুন্দরের অবয়ব পেতে চাই।"

এখানে সুন্দর, শান্তির প্রত্যাশা করেছেন কবি। কিন্তু সুবাতাস এসেও ফিরে গেছে। জীবনের সামান্য অধিকারটুকুও জনগণ হারিয়েছে। কারণ—

"আমরা বাঙালির পলির রুটিকে টুকরো-টুকরো করে
হিংস্র পশুর মতো ছিঁড়ে জননীর রক্তে ভিজিয়ে খেলাম।"

স্বদেশে মানুষের মনে শান্তি নেই। একের পর এক প্রতিঘাত জর্জরিত করেছে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষদের। ভেঙে দিয়েছে তাদের স্বপ্নকে। কবি 'স্বদেশের মুখ শেফালি পাতায়' কবিতায় বলেছেন—

"আমার মায়ের নিকানো উঠান
ভিজিয়ে দিয়েছে ব্যর্থতায়
সুচতুর শ্বাস, বিবর্ণ ছায়া।"

অক্ষমতা, শতাব্দীর অসুখ, নরক যন্ত্রণা নিয়ে যেন বেঁচে থাকা—

"দেশের করুণ শিথিল বক্ষে
কান পেতে আছি,

ঘুম পাবো বলে শুয়ে থাকি রোজ
শুয়ে থেকে থেকে
ঘুম ভেঙে যায়—
দেশের শীতল বক্ষ পাবে না
দুঃখ ভোলাতে।”

কবি অন্যদের মতোই জীবনযাপন করেন, কারণ— “কখনো পারিনি সচ্ছল চাঁদে উড়তে।” বাংলা কবিতা লেখালেখির প্রতিও ছিল নিষেধাজ্ঞা। কারণ কবিতাকে হাতিয়ার করে একদল কবি দেশবাসীকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। বাংলার সংস্কৃতির প্রতিও ছিল স্বৈরশাসকের কড়া নজর। তাদের ভয় ছিল জনগণ একত্রিত হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করবে। সে প্রসঙ্গই উঠে এসেছে ‘কলম’ কবিতায়—

“সকাল সন্ধ্যা
তাই তো এখন খাকী-পোশাকের
হাজার বালুচ পাহারা দিচ্ছে
লেইকের জল, বাঙলা কবিতা,
রক্তের নদী, শিমুলের গান।”

সমসাময়িক পরিস্থিতি যে কতটা কঠিন ছিল এবং কীভাবে কবি-সাহিত্যিকদের স্বাধীনতা হরণ করা হতো তার খানিকটা নমুনা পাওয়া যায় আলোচ্য কবিতায়। ‘অর্জুনের রাজ্য’ কবিতাটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গ রয়েছে। আবার ভারত-চীন যুদ্ধের কথা আছে—

“চীন আর ভারতের সীমান্ত বিরোধে, ১৯৬২-তে
আমার এক আত্মীয়ের দূরের আত্মীয় মারা গেলে
আমি তাকে কাঁদতে দেখেছি সারারাত।”

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধের ছবিও এখানে ফুটে উঠেছে। আবার পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা বোঝাতে বলেছেন—

“এরোপ্লেন আসে না এখানে, শুধু পত্রিকায়
বোমারু বিমান থেকে বোমা ঝরে।”

‘মানুষ’ কবিতায় তার জীবনযাপন পদ্ধতি, বোহেমিয়ান জীবনের ছাপ স্পষ্ট। অন্যদের থেকে তিনি কোথায় আলাদা তা এখানে তুলে ধরেছেন। আসলে সমসাময়িক পরিস্থিতিতে মানুষ সেজে থাকা সম্ভব ছিল না। ব্যক্তিগত বিপন্নতাবোধ, সংকট থেকেই তিনি বলেছেন—

"মানুষগুলো সাপে কাটলে দৌঁড়ে পালায়;
অথচ আমি সাপ দেখলে এগিয়ে যাই,
অবহেলায় মানুষ ভেবে জাপটে ধরি।"

'লজ্জা' কবিতাটি একটি করুণ ছবিকে কেন্দ্র করে লেখা। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে মৃত এক নারীর প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। মৃত্যুর পর নারীটির স্বাভাবিক লজ্জা নেই; মৃত্যু যেন তা গ্রাস করেছে। যে নারী পিঠ থেকে সুতোর কাপড় কোনোদিন খোলেনি, কিন্তু আজ মৃত্যুর পর—

"অথচ কেমন আজ ভিনদেশী মানুষের চোখের সমুখে
নগ্ন সে, নির্লজ্জ, নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে আছে
জলাধারে পশু আর পুরুষের পাশে শুয়ে আছে।"

আবার—

"তাঁর সমস্ত শরীর জুড়ে প্রকৃতির নগ্ন পরিহাস,
শুধু গোপন অঙ্গের লজ্জা ঢেকে আছে
সদ্য-প্রসূত-মৃত সন্তানের লাশ।"

সে প্রতিবাদহীন, নগ্ন হয়ে পড়ে আছে। শেষে বলেছেন—

"যেন তার সমস্ত লজ্জার ভার এখন আমার।
কেবল আমার।"

অর্থাৎ এই নগ্নতা থেকে তার লজ্জা, স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়ার দায় কবির। কিন্তু বর্তমান আধুনিক যুগের মানুষ, সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার এই মরদেহ নিয়েও বাণিজ্যে মত্ত। কবি এর বিরুদ্ধেই ক্ষোভ আলোচ্য কবিতায় উগরে দিয়েছেন। 'যুদ্ধ' নামের ছোট্ট কবিতাটিতে অসাধারণভাবে যুদ্ধ কী এবং যুদ্ধের ফলশ্রুতি কীরকম তা বুঝিয়েছেন—

"যুদ্ধ মানেই শত্রু শত্রু খেলা
যুদ্ধ মানেই
আমার প্রতি তোমার অবহেলা।"

'পুনরুদ্ধার' কবিতায় একজন পিতার একজন সন্তান হারানোর শোক প্রসঙ্গ ফুটে উঠেছে—

"শুধু সেই পিতা তাঁর একমাত্র
ছেলেকে পেলো না, যে-তরুণ অস্ত্র হয়ে
একদিন ঘর ছেড়েছিল।"

'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও নির্মলেন্দু গুণের প্রায় প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেই সময়, সমাজ ও স্বদেশের ছাপ বর্তমান। একজন সচেতন কবির পক্ষে সময়কে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। নির্মলেন্দু গুণ ছাড়াও হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, আবুল হাসান, হুমায়ুন আজাদ, শহীদ কাদরী, মুহম্মদ নুরুল হুদা, মহাদেব সাহা প্রমুখের কবিতায় বাংলাদেশের সমকালীন পরিস্থিতি, মাটি ও মানুষের কথা, সময়ের প্রতিচ্ছবি ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' কাব্যগ্রন্থটি নির্মলেন্দু গুণের প্রথম কাব্যগ্রন্থ এবং যেভাবে এই কাব্যগ্রন্থের প্রায় অধিকাংশ কবিতায় সমকাল, সমাজ ও সময়ের ছবি প্রস্ফুটিত হয়েছে তাতে নির্দ্বিধায় কবিকে একজন সমাজসচেতন প্রথম সারির কবি হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়।

কবি বার বার সাহসের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়। এভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন সমকালীন পরিস্থিতির কথা। তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে সময় ও সমাজের প্রতিচ্ছবি। তিনি সমাজ, সমকাল সচেতন একজন দায়বদ্ধ কবি। দেশমাতৃকার ভয়াবহ দুর্দিনে, আইয়ুবী শাসনামলে লিখিত 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' কাব্যগ্রন্থে যেভাবে সময়ের ছাপ রয়েছে তাতেই বোঝা যায় তাঁর প্রকৃত কবিসত্তা, অভিজ্ঞান ও দর্শন। সহজ-সরল ভাষায়, কখনো বা ঈষৎ কৌতুক, ব্যঙ্গের শাণিত সুরে নিরন্তর আঘাত করেছেন স্বৈরশাসকের শাসনব্যবস্থাকে। দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। প্রেমভাবনার পাশাপাশি যেভাবে এই কাব্যগ্রন্থে তাঁর সাহসিকতা, সংগ্রামী মানসিকতার পরিচয় পেয়েছি তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নির্মলেন্দু গুণের কবিভাবনা, মন ও মানসিকতা। কৃত্রিমতা নয়, চারিপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকেই উঠে এসেছে তাঁর কবিতা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে। এজন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যজগতে বিশেষভাবে সমাদৃত।

আকর গ্রন্থ

১. নির্মলেন্দু গুণ, কাব্যসমগ্র ১, কাকলী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ অক্টোবর ২০১১, আশ্বিন ১৪১৮।

তথ্যসূত্র

১. নির্মলেন্দু গুণ, কাব্যসমগ্র ২. ভূমিকা, কাকলী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১০, ফাল্গুন ১৪১১।

২. নির্মলেন্দু গুণ, মহাজীবনের কাব্য, আমার কণ্ঠস্বর, কথাপ্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১২১।
৩. তদেব, পৃ. ১২১
৪. তদেব পৃ. ৩৫৯
৫. তদেব, পৃ. ৩৬২-৩৬৩
৬. তদেব, পৃ. ৩৬৩

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. মানসী কীর্তনীয়া (সম্পা.), কারুভাষ, প্রেমে রঙে নির্মলেন্দু গুণ, বিরাটী, কলকাতা, প্রকাশ ২০১৫।
২. দীপ্তি ত্রিপাঠী, বাংলাদেশের আধুনিক কাব্যপরিচয়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ পুনর্মুদ্রণ : জুন ২০১৮, আষাঢ় ১৪২৫।
৩. আহমদ রফিক, কবিতা আধুনিকতা ও বাংলাদেশের কবিতা, অনিন্দ্য প্রকাশ, অনিন্দ্য প্রকাশ-এর প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৪২৬ অক্টোবর ২০১৯।

লক্ষ্মণ দোসাদ : দলিতের মানবাধিকারের অঙ্গীকার

অসিতরঞ্জন সাঁতরা

'ভারত' নামক রাষ্ট্রে আজও দলিত সমাজ বিদ্যমান। লক্ষ্মণ দোসাদ তারই প্রতিনিধি। লক্ষ্মণ দোসাদ অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতার প্রতিবাদী কণ্ঠ। 'বারুদ বালিকা' (১৯৮৮) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'লক্ষ্মণ দোসাদ' কবিতার সে নাম— চরিত্র। কবিতাটি উত্তম পুরুষে লেখা। সে জাহির করে তার জন্ম থেকে যাপনের ইতিহাস। কেমন করে এই দেশ আর সমাজ যুগ যুগ ধরে তাদের দলন করে চলেছে তার ইতিহাস। কালে কালে সে হয়ে উঠেছে ইতিহাস সচেতন। কবিতার ছত্রে ছত্রে তার ইতিহাস চেতনার স্বাক্ষর। সেই প্রাচীনকাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সুকৌশলে কেমন করে তাদের দলিত বানানো হয়েছে সে ধরে ফেলেছে সেই ছল-চাতুরি। মায়াবী ঘুম ভেঙে ওঠা লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণদের হাতে তাই আজ ধনুঃ-শর। তারা বিদ্ধ করতে উদ্যত সেই ভালো মানুষ দেবতাদের যাদের কারণে তারা আজ অস্পৃশ্য। দোসাদ।

আমার জন্ম
হলুদে সবুজে গম্‌গম অড়হর খেতে—
আমি লক্ষ্মণ দোসাদ।
আমার সম্পত্তি বলতে কয়েকটি গাধা আর কুকুর,
আমার পোশাক শববস্ত্র,
ভোজন ভাঙা পাত্রে,
অলঙ্কার লোহার বালা
বন্ধু কিছু শব পচ ও চণ্ডাল

কবিতার প্রথম স্তবকে নির্মেদ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে দোসাদ সম্প্রদায়ের একজন মানুষের জন্ম এবং সহায়-সম্পদের বৃত্তান্ত। এই বৃত্তান্ত কিন্তু পূর্ব-নির্ধারিত। দোসাদ সম্প্রদায়

শূদ্র। ছোটলোক। অস্পৃশ্য। অপরাধপ্রবণ। দলিত। তারা ছড়িয়ে আছে ভারতবর্ষের নানা জায়গায়— বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ। তাদের কাজ মৃত পশুর দেহ সরানো, মানুষের মল-মূত্র পরিষ্কার করা, রাত-পাহারা ও খেত মজুরি। সারা ভারত জুড়ে এইরূপ কায়িক শ্রম ও নোংরা কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত অগণিত মানুষ। কিন্তু তারাই ঘৃণিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত ও অস্পৃশ্য রূপে অবিচারের শিকার। আদিকাল থেকে তাদের শ্রমের মর্যাদাকে অস্বীকার করে তাদেরকে নির্বাসিত করা হয়েছে সমাজের অন্ধকার স্তরে। এই অন্ধকারের যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে।

বেদোত্তরকালে অত্যন্ত জটিল এক ক্রমবিকাশ ও পরিবর্তনের কাল পেরিয়ে একটি শ্রমজীবী শ্রেণির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে "এইযুগে একটি ক্ষুদ্র সেবকশ্রেণি হিসাবে শূদ্রের আবির্ভাব হয়। এই শ্রেণিতে পরাজিত, বা গবাদি পশু কেড়ে নেওয়া হয়েছে এমন, আর্য ও অনার্যরা ছিল।"[১] শুধুমাত্র এখানেই থেমে থাকল না উচ্চতর শ্রেণির লোকেরা। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা যতই উৎপাদন ও অন্যান্য দৈহিক শ্রম থেকে দূরে সরে যেতে থাকল ততই তাদের এই সব শ্রমের সঙ্গে যুক্ত লোকজনের প্রতি ঘৃণা বাড়তে থাকল "উচ্চতর বর্ণের লোক, বিশেষত ব্রাহ্মণরা, কায়িক শ্রমকে ঘৃণার চোখে দেখতেন; এই ধরনের নিয়মগুলো তারই ইঙ্গিত। এর ফলেই কায়িক শ্রম করে জীবিকা অর্জন করতে হলে তাঁরা নেমে যেতেন শূদ্রের পর্যায়ে।"[২] এখানে নিয়ম বলতে বোঝানো হয়েছে আর্য ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় যে কেউ যদি গো-পালন, বাণিজ্য, কারুকর্ম, ভৃত্যগিরি অথবা কুসীদজীবীর কাজ করে জীবন ধারণ করে তাদেরও শূদ্র পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হত। এই সময় থেকে নলকার (যিনি বাঁশের কাজ করেন), কুম্ভকার, পেসকার (যিনি বোনার কাজ করেন), চর্মকার এবং নাপিত প্রভৃতি নিম্নবৃত্তির লোকজনের কাজকেও ঘৃণার চোখে দেখা হতে লাগল। পরবর্তীকালে "কায়িক শ্রমের প্রতি ক্রমবর্ধমান ঘৃণার সঙ্গে যুক্ত হলো বস্তু বিশেষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিষেধাজ্ঞা (টাবু) এবং অশুচিতার আদিম ধারণা। আর এ দু-এ মিলেই সৃষ্টি হলো অস্পৃশ্যতা নামক এক অনন্য সামাজিক ঘটনা। চণ্ডালদের কাজের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে সত্য। তাঁরা কাজ করতেন মৃতদেহ নিয়ে, যার সঙ্গে জড়িত ছিল অশুচিতা ও আতঙ্কের আদিম ধারণা। এর জন্যই ঐ ধরনের লোকদের সংস্রব পরিহার করা প্রয়োজন বলে মনে হলো। পরবর্তীকালে অস্পৃশ্যতার ধারণা আরও প্রসারিত হয়।"[৩]

যারা একবার আধিপত্য ও ক্ষমতার স্বাদ পায় তারা সেটাকে চিরস্থায়ী করার বাসনায় নির্বিচারে অত্যাচার চালায়। চলতে থাকে খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন। আর সব শেষে শাস্ত্রের দড়িতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা। তাই জন্ম দেওয়া হয় 'মনুস্মৃতি' নামক শাস্ত্রের। মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথের ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গের এই কুকীর্তির কথা আজ অনেকেরই

জানা। ‘মনুস্মৃতি’ গ্রন্থে বিভিন্ন সঙ্কর জাতি যাদের অধিকাংশই অস্পৃশ্য তাদের বৃত্তি উল্লেখ করার পর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে “এরা গ্রামের বাইরে চৈত্যবৃক্ষ, শ্মশান, পর্বত ও উপবনের কাছে বাস করবে। দেখা যায়, জনগোষ্ঠীর মানুষদের বাস ছিল ব্রাহ্মণ্য বসতির বাইরে। চণ্ডাল ও শ্বপাকরা নিঃসন্দেহে বাইরে থাকতেন। তাঁদের ব্যবহৃত বাসনপত্র চিরকালের মতো বর্জন করা হতো। কুকুর ও গাধা ছিল তাদের একমাত্র সম্পত্তি, তাঁরা ভাঙা থালায় খেতেন, লোহার গয়না ও মৃত ব্যক্তির জামা কাপড় ব্যবহার করতেন, এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতেন।”[৪] এছাড়াও এই বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী করার বাসনায় যোগ হয়েছিল কর্মফল ও জন্মান্তরবাদের গেরো।

শাস্ত্র নিম্নবর্গকে বাঁধতে চেয়েছে একেবারে শক্ত-পোক্ত করে। “শূদ্রের ক্ষেত্রে ধর্মসূত্র থেকে ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিগ্রন্থ পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে বলেছে যে তার স্থান অন্য তিন বর্ণের নিচে এবং তার একমাত্র কর্তব্য হল সর্বোতভাবে এদের সেবা করা। পরবর্তীকালে জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদের দ্বারা এই মতকে দৃঢ় করা হয়েছে এই বলে যে পূর্ব জন্মের দুষ্কৃতির ফলে শূদ্রের শূদ্র জন্ম, এবং এ জন্মে যথোপযুক্ত ভাবে দ্বিজসেবা করলে পরজন্মে সে উচ্চতর বর্ণে জন্মাবে; এজন্মে দ্বিজসেবায় ত্রুটি ঘটলে সে আরও হীন পশুযোনি প্রাপ্ত হবে।”[৫] এইভাবে একদা শারীরিকভাবে কমজোরি ও কম বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে পাঠানো হল চির নির্বাসনে কিন্তু তার থেকে প্রাপ্ত সেবার ধারাটি থাকল অক্ষুণ্ণ।

কবিতার পরবর্তী স্তবকটি আমাদের কাছে তুলে ধরে দমন-পীড়নের আর এক চিত্র।

পুলিশের তাড়ায় আমি জীবন ভর
ডোম্‌নির সঙ্গে সহজ আনন্দে
ঘুরে বেড়িয়েছি শহর গঞ্জ জনপদ,
পূর্ণিয়ার নাথপুরে
আমার ছড়ানো কাঁধের ওপর পড়েছিল
বুকানন-হ্যামিলটনের গরম নিঃশ্বাস।

সমাজ থেকে নির্বাসিত, বহিষ্কৃত, জীবিকাহীন মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ছোটখাট চুরি ও অপরাধ করতে বাধ্য হয়। এইসব ছোটখাট অপরাধের কারণে এবং কোনোভাবেই বশ্যতা স্বীকার না করার কারণে কোম্পানির শাসকদের তীক্ষ্ণ নজর পড়েছিল এদের ওপর। তার ওপর আবার নাকি এইসব ভবঘুরে সম্প্রদায়ের সর্দার ও দলপতিরা সিপাহি বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহিদের সহযোগিতা করেছিল। সেই অজুহাতে এই সকল পিছিয়ে পড়া, শূদ্র, অস্পৃশ্য ও নিম্নবর্গের মানুষজনের কপালে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে তক্‌মা জুটল অপরাধপ্রবণ উপজাতি বলে। জারি হল Criminal Tribes Act (1871)। বুকানন-

হ্যামিলটন একেবারে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে যে Survey'র কাজ করেছিলেন সেখানেও এই অপরাধপ্রবণতার কথা আছে। এই তথ্য CAT তৈরির কাজে লেগেছিল। তাই কোনো একজন চুরির দায়ে দোষী হলেও সমগ্র গোষ্ঠী হয়ে উঠল অপরাধপ্রবণ। সম্প্রদায়ের সমস্ত শক্ত সমর্থ পুরুষদের বাধ্যতামূলকভাবে সপ্তাহান্তে থানায় হাজিরা দিতে হত। থানা তাদের নানাভাবে শোষণ, পীড়ণ ও নাজেহাল করত। পুলিশের তাড়ায় তাদের জীবন হয়ে উঠত বিপর্যস্ত। ঘুরে বেড়াতে হত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। লক্ষ্মণ দোসাদের জবানিতে এই ঘটনাকে অত্যন্ত ইঙ্গিতময় ও ব্যঙ্গপূর্ণ ভাষায় কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত ব্যঞ্জিত করেছেন। পুলিশের তাড়ায় সে নাকি সহজানন্দে জনপদে, শহরে, গঞ্জে প্রেমে হরষের বান ডাকিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। আশ্চর্য বৈপরীত্যের মাধ্যমে কবি সর্বহারা মানুষের বেদনাকে পাঠকের বুকের পাঁজরে চারিয়ে দিয়েছেন।

আমার পূর্ব পুরুষের নাম-রাহু
আমার দুঃখের অন্নের ওপর পড়েছিল
সেই দুই তস্কর চাঁদ ও সূর্যের থাবা,
তাদের ক্ষমা করিনি বলেই কি আমি অপরাধপ্রবণ ?
তাই কি রাহুর ছায়া আর দোসাদের ছোঁয়ায়
অশুচি হওয়ার ভয়ে
দুনিয়ার চাঁদ কপালেরা ফেলে দেয় রান্না-করা খাবার,
মজুদ জল,
অথচ আমার ডোম্‌নির নিহিতে
ঢুকিয়ে দেয় আগুনে তাঁতানো লাল শিক ?

নিম্ন বর্গের প্রচলিত দর্শন অনুযায়ী রাহু তাদের আরাধ্য দেবতা। আবার পূর্বপুরুষও বটে। উনিশ শতকের প্রারম্ভে বুকানন-হ্যামিলটনের লেখায় প্রথম পূর্ণিয়া অঞ্চলে দোসাদদের রাহুপূজার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। আর রাহুর প্রসঙ্গ এলেই স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে জাগ্রত হয় গ্রহণ সংক্রান্ত নানা সংস্কার। এরকমই একটি সংস্কার সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। "চন্দ্র আর সূর্যের মৃত্যু নয় রাহুর আগমনই অশুদ্ধতার হেতু, ঠিক যেমন নিম্নজাত ব্যক্তির ছায়া গায়ে পড়লে শুদ্ধতা হারায় ব্রাহ্মণ। অশুদ্ধতা সংক্রামক, তাই চন্দ্র বা সূর্য যতক্ষণ রাহুর কবলে, সমগ্রপৃথিবীও ততক্ষণ শুদ্ধতা থেকে বঞ্চিত।"[৬] গুজরাট অঞ্চলে উচ্চ জাতি সমূহের ব্যাখ্যায় দানবের ছায়া আর ভাঙ্গির ছোঁয়া সমান অশুদ্ধ। তাই গ্রহণকালে অশুদ্ধ সূর্য ও চন্দ্রের আলো যেখানে পড়ে সব অশুদ্ধ হয়ে যায়। রান্না-করা খাবার, মজুদ করা জল— সবই ফেলে দেয় চাঁদ কপালেরা।

কিন্তু তারা ডোম্‌নি কিংবা দোসাদ নারীকে যখন ভোগ করে তখন অস্পৃশ্যতার কথা মনে রাখে না। "বশিষ্ঠ বলেছেন, কৃষ্ণ বর্ণা কোন শূদ্রা রমণীকে ভোগার্থে উপপত্নী রূপে গ্রহণ করা চলতে পারে, ধর্মপত্নী রূপে নয়।"[৭] তাই শেষ কথা হল ভোগ। আর এই ভোগ বজায় রাখতে অন্যের কাছ থেকে অবৈধ সেবা আদায়ের অধিকার কায়েম রাখতে উচ্চবর্গের মানুষজন এবং ব্রাহ্মণেরা যতটা নরপিশাচ হওয়া যায় ততই করতে রাজি।

কিন্তু শেষমেষ এই অস্পৃশ্যরা মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছেন গবেষক ঐতিহাসিক দামোদর কোশাম্বি এবং চির পথিক, দার্শনিক রাহুল সাংকৃত্যায়নের বিচার বিশ্লেষণে। তারা বুঝতে পেরেছেন শাস্ত্র হল বঞ্চনার তাগিদে ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্গীয়ের এক সুচতুর নির্মাণ। সেই নির্মাণের কয়েকটি উদাহরণ কবিতায় দেখা গেল। চেরা ঠোঁট নিয়ে কেউ জন্মালে বলা হয় গ্রহণকালে তার পূর্ব পুরুষের কেউ কোনো কর্তনকর্ম করেছিল। আর তিল, জড়ুল প্রভৃতি জন্মদাগও সৃষ্টি হয় ওই গ্রহণকালের অশুদ্ধতার সময়ে কাঠ চেরাই কী অন্য কোনো শ্রমমূলক কাজের ফলে। তাই দানবের ছায়া ও ভাঙ্গির ছোঁয়া ভীষণ বিপজ্জনক। এই ছোঁয়া বাঁচাতে পেশোয়ারের আমলে— দুপুর তিনটে থেকে সকাল ন-টা পর্যন্ত পুনা ফাটকের ভেতরে মাহার-মাঙ্গদের ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল। কারণ ওই সময় মানুষের শরীরের ছায়া দীর্ঘ হয়। কোনো উচ্চ বর্ণের মানুষকে অশুচি করে দিতে পারে। অবাধ আধিপত্যে ক্ষমতাবান এই সমাজ যে কোনো আদিবাসীকে যে কোনো সময় তার জমি থেকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতে পারে। লট্‌কে দিতে পারে ফাঁসিতে দেবীপূজা দেখার অপরাধে।

এই যে প্রবল অন্যায় আর অত্যাচার তা নীরবে সয়ে গেলেও নিম্নবর্গের মানুষেরা যে আন্তরিকভাবে তা কখনোই মেনে নেয় নি তার নানা উপাদান চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। "বিরুদ্ধতার উপাদানে এসব জাতির বিশ্বাসের জগৎ স্পষ্টই চিহ্নিত। যে শাসন ব্যবস্থা তাদের উপরে আরোপ করা হয়েছে, তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের কাছে নতি স্বীকার নয়, বরং তাকে অস্বীকার করাই এই বিরোধের প্রবণতা।"[৮] সেই বিরুদ্ধতার মধ্যেই সুপ্ত ছিল জাগরণের বীজ। যা লালিত-পালিত হয়েছে অন্য এক পরম্পরার মাধ্যমে।

আমি তাই
ডাকাত দেবতা শালেসের বেদিতেই রক্ত ঢেলেছি
বুনো শুয়োর, ছিট্‌পালক মোরগের,
সরালের নলিচেরা রক্তের তিলক কপালে উঠে দাঁড়িয়েছি
সোমরা লোহার অর্জুন কাহার লক্ষ্মণ দোসাদ,
উনপঞ্চাশি হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছে
আমার মঙ্গোলয়েড করোটির লক্ষ লক্ষ কুশ,

এতদিন
ধর্মের নামে মুক্তির নামে নিষেধের নামে
যা যা কেড়ে নেওয়া হয়েছে,
তার প্রত্যেকটি চাল
আজ গুনে গুনে ফেরত চাই আমার।

ডোম, দোসাদ, ভাঙ্গি, মাঙ্গ— প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা পরিপূর্ণভাবে পোষ মানেনি বলেই তাদের ঐতিহ্য নিয়ে তারা সগর্বে ঘোষণা করে। হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের দেবতায় অধিকার নেই বলেই তাদের আশ্রয় ডাকাত দেবতার কাছে। তাদের নৈবেদ্য- বুনো শুয়োর আর ছিট্‌পালক মোরগ যা হিন্দু প্রথানুরূপ নয়। নিম্নবর্গের মানুষরা তাই ওদের বর্জন করে নিজেদের সংস্কৃতি নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছে। তাদের হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বশ্যতা মানার প্রয়োজন পড়ে নি। "যেসব আদিবাসী বশ্যতা মানেনি, তাদের নিয়ে কোশাম্বির ইঙ্গিত আরও জোরদার হয় যখন দেখি তাদের দেবতার প্রতিনিধি কখনওই হিন্দু প্রথানুরূপ মূর্তি নয়, বরং পাথর অথবা ঢেলা। আচার-অনুষ্ঠানে তাদের নৈবেদ্যও ব্রাহ্মণ্য প্রথানুরূপ নয়, এদের নিবেদন শুয়োর, মোরগ আর কারণ।"[৯] এই হার না-মানা প্রকৃতি আজ পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যে কুশ নামক অস্ত্রে এতদিন তাকে শাসন করা হয়েছে আজ সেই লক্ষ লক্ষ কুশের দাপাদাপি তার করোটির মধ্যে। ধর্মের নামে, মুক্তির নামে, নিষেধের নামে যে যে অধিকার তাদের হারিয়ে গেছে আজ তার সবই তার ফেরত চাই। ফেরত চাই অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মর্যাদা— মানুষের অধিকার। নইলে রেহাই নেই। এ অধিকার যে স্বতঃসিদ্ধ। "Human Rights are rights held by individuals simply because they are part of the human species."[১০] লক্ষ্মণ দোসাদ এভাবেই হয়ে উঠেছে দলিতের মানবাধিকারের অঙ্গীকার।

তথ্যপঞ্জি

১. রামশরণ শর্মা, 'প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস', ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৬, পৃ. ৪৫
২. রামশরণ শর্মা, 'প্রাচীন ভারতে শূদ্র', কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১২৭
৩. তদেব, পৃ. ১৩৫
৪. তদেব, পৃ. ২০৭

৫. সুকুমারী ভট্টাচার্য, 'প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ', ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ২০০৬, পৃ. ১৮৪
৬. রণজিৎ গুহ, 'একটি অসুরের কাহিনি', 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', সম্পাদনা গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০১০, পৃ. ৭০
৭. রামশরণ শর্মা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. ১২১। PBS
৮. রণজিৎ গুহ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. ৭৪। NB
৯. তদেব, পৃ. ৭৫। NB
১০. Micheline R. Ishay, The History of Human Rights, Orient Longman, First Edition, 2008, P.-3. (Introduction)

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 13. October, 2021

বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটক

ধ্রুবজ্যোতি পাল

সংক্ষিপ্তসার : বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বাংলাদেশের পেশাদার রঙ্গমঞ্চে ঐতিহাসিক নাটকগুলি ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়। যুগ কাল জনরুচি ও বিশেষ রাজনৈতিক কারণেই এই শ্রেণির নাটকগুলি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রেক্ষাপটে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকগুলি পেশাদার থিয়েটারে প্রবলভাবে জনপ্রিয় হয়। সমকালে তো বটেই, তাঁর মৃত্যুর পরও অনেকদিন ধরে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল। স্টার, মিনার্ভা, মনোমোহন, ইউনিক, ম্যাডান, আর্ট প্রভৃতি থিয়েটারে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি সমারোহে অভিনীত হয়েছিল।

সূচক শব্দ : বঙ্গরঙ্গমঙ্গ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ঐতিহাসিক নাটক, জনপ্রিয়তা।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালির মধ্যে যে দেশাত্মবোধ, স্বদেশপ্রীতি, পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করার প্রয়াস, স্বাধীনতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি দেখা যেতে থাকে, বিশ শতকের শুরু থেকে তা তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই আবহাওয়ায় বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চগুলি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সেই সব রঙ্গমঞ্চগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্টার, মিনার্ভা, ক্লাসিক, অরোরা, ইউনিক, ন্যাশনাল, কোহিনুর, মনোমোহন ইত্যাদি। এই পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলি যুগরুচি ও যুগ চাহিদার কথা মনে রেখে সে-সময় নাটক মঞ্চস্থ করতে থাকে। এই সময় বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় ঐতিহাসিক ও দেশাত্মবোধক নাটকের অভিনয়। নাটক দেখতে প্রচুর দর্শকও রঙ্গমঞ্চে ভিড় করতে থাকে। প্রচুর দর্শক সমাগমে

রঙ্গমঞ্চগুলি যেমন আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়ে ওঠে, তেমনি জনগণের মধ্যে দেশাত্মবোধের প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকে। এই আবহাওয়ায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) অনেকগুলি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন এবং সেগুলি সমকালীন পেশাদার রঙ্গমঞ্চে ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়।

'তারাবাঈ' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। নাটকটি ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে বা ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। নাটকটি খুব সুখ্যাতির সঙ্গে ইউনিক থিয়েটারে অভিনয় হয়। অভিনয়ের তারিখ ছিল ৩১ অক্টোবর ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ।[১] প্রধান ভূমিকালিপি ছিল—

পৃথ্বীরাজ— দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ)

সংগ্রামসিংহ— চুনীলাল দেব

রায়মল— তারকনাথ পালিত

জয়মল— ক্ষেত্রমোহন মিত্র

তারাবাঈ— তারাসুন্দরী

তমসা— প্রকাশসুন্দরী

প্রথম অভিনয়ের পর প্রায় মাসাধিক কাল ধরে ইউনিক থিয়েটারে 'তারাবাঈ' অভিনীত হয়। এই অভিনয় সম্বন্ধে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন— "স্বর্গীয় ডি. এল. রায় মহাশয়ের 'তারাবাঈ' ইউনিকে খুব সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হয়।...এইনাটক প্রধানত: ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দেই লেখা; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সুললিত ছন্দের পর ডি. এল. রায়ের এই ভাঙ্গা ছন্দ দর্শকের কানে বড় বেখাপ লাগিত।...এই অভিনব ছন্দে অভিনেতৃবর্গ অভিনয় করিত। যবনিকা পড়লে দর্শকরাও তাহার অনুকরণে নিজেদের মধ্যে কথা কহিত। যথা—

একজন বলিল, "কোথা যাইতেছে ?"

দ্বিতীয় উত্তর দিলেন. "খাইবারে জল; তুমি যাবে ?"

১ম। "নহে বন্ধু"

২য়। "উত্তম; আমি তবে আসি।"

দর্শকদের মধ্যে ইহা লইয়া খুব ঠাট্টা বিদ্রুপ চলিত। সাধারণ রঙ্গমঙ্গের জন্য ডি. এল. রায় মহাশয় ভাঙ্গা ছন্দে আর বড় বেশি নাটক লেখেন নাই। স্বর্গীয় রায় মহাশয় বাঙ্গালা নাটকে একটা নূতন ধারা আনয়ন করেন। তাঁহার ভাষায়, কী

গদ্যে, কী পদ্যে, একটা নূতনত্বের ছাপ ছিল।...নাটকীয় ঘটনার সাজানর গুণে এবং অভিনয় মনোজ্ঞ হওয়ায় তাঁহার 'তারাবাঈ' জমিয়াছিল ভাল।"[২]

সূর্যমলের পত্নী তমসা চরিত্র দর্শকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার প্ররোচনায় সূর্যমলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়েছে। প্রকাশমণির অভিনয়ে তা যথাযথ প্রকাশ পেয়েছিল। নাট্য গবেষক দেবনারায়ণ গুপ্ত জানিয়েছেন যে, প্রকাশমণি তমসার ভূমিকায় রূপদান করে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন। ইউনিক থিয়েটার তখনকার দিনে খুব একটা নামকরা থিয়েটার ছিল না এবং খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু তমসা চরিত্রের অভিনেত্রী সেই সময়কার প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ের কর্ণধারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর ফলে গিরিশচন্দ্র প্রকাশমণিকে মিনার্ভা থিয়েটারে নিয়ে আসেন।[৩] তারাাবাঈ-এর ভূমিকায় তারাসুন্দরীও সুন্দর অভিনয় করেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত 'তারাবাঈ' এই থিয়েটারে তেরো বার অভিনীত হয়েছিল। ইউনিক থিয়েটার ছাড়াও এই নাটকটি এই সময় মিনার্ভা থিয়েটার ও ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর পর গ্র্যান্ড ন্যাশনাল থিয়েটার (২৬ ডিসেম্বর ১৯১১ থেকে), মিনার্ভা থিয়েটার (২৫ জুলাই ১৯১৪ থেকে) এবং মনোমোহন থিয়েটারে (৬ এপ্রিল ১৯১৮ থেকে) 'তারাবাঈ' নাটকের অভিনয় লক্ষ করা যায়। যাইহোক, কলকাতার বিভিন্ন পেশাদার রঙ্গালয়ে 'তারাবাঈ' নাটকটি বিভিন্ন সময়ে অভিনীত হয়েছিল এবং তা অর্ধশত রজনী অতিক্রম করেছিল (১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত)।

'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটকটি রঙ্গমঞ্চে 'রাণা প্রতাপ' নামে অভিনীত হয়েছিল। নাটকটির জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। মিনার্ভা থিয়েটারে ৮ ডিসেম্বর ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে 'রাণা প্রতাপ' সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। প্রধান প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন—

রাণা প্রতাপ— অমৃতলাল মিত্র

শক্তসিংহ— অমৃতলাল বসু

পৃথ্বীরাজ— কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

মানসিংহ— অক্ষয়কালী কোয়ার্টার

মেহেরউন্নিসা— নরীসুন্দরী

দৌলতউন্নিসা— বসন্তকুমারী

'রাণা প্রতাপ' ছিল স্বদেশি ভাবোদ্দীপক নাটক। তখন বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন প্রবলভাবে চলছিল। এই যুগ কালের প্রেক্ষাপটে নাটকটি বাংলাদেশে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। "স্বদেশী আন্দোলনের সূচনার পূর্ব্ব হইতেই

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতাপসিংহ বা 'রাণা প্রতাপ' নাটক সহসা এক শুভ মাহেন্দ্র মুহূর্তে, উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সমুদিত হইয়া, দেশাত্মবোধ ও স্বার্থত্যাগের অনাবিল পুণ্যাদর্শে বাঙ্গালীর প্রাণ-শক্তিকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল।"[৪]

খুব ধুমধামের সঙ্গে 'রাণা প্রতাপ' স্টারে অভিনীত হলেও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে থিয়েটার কর্তৃপক্ষের মনোমালিন্য ঘটে এই অভিনয়কে কেন্দ্র করে। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "সকলেই বোধহয় জানেন, নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের 'হলদীঘাটের যুদ্ধ' নামে একটি কবিতা আছে। এমনও একদিন ছিল যখন এই কবিতাটি অনেকের মুখে মুখে ফিরিত। স্টারের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ও নাট্যাচার্য অমৃতবাবু, নাটকীয় রাণা প্রতাপের হলদীঘাটে গিরিশবাবুর এই কবিতাটি তিনটি কি চারটি বিভিন্ন দূতের মুখে যুদ্ধবর্ণনাচ্ছলে জুড়িয়া দেন। ইহাতেই আগুন জ্বলে। কারণ, এই জোড়াটা রায় মহাশয়ের মনঃপূত হয় নাই। শুনিয়াছি, অমৃতবাবু নাকি বলিয়াছিলেন যে, গিরিশবাবুর কবিতা দিয়া নাটকের মর্য্যাদা তিনি বাড়াইয়াছেন, কমান নাই। কথাটা যাহাই হউক এবং যেভাবেই হউক, প্রথম রাত্রির অভিনয়ের পরেই রায় মহাশয় স্টারের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলেন। মিনার্ভার স্বর্গীয় মহেন্দ্রকুমার মিত্রের সহিত 'তারাবাঈ' উপলক্ষ্যে দ্বিজুবাবুর পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল। দ্বিজুবাবু রবিবারেই মহেন্দ্রবাবুকে ধরিয়া বসিলেন, 'রাণা প্রতাপ' মিনার্ভায় অভিনয় করিতে হইবে; এবং অভিনয় করিতে হইবে স্টারের দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতে। মহেন্দ্রবাবু শনিবারে 'রাণা প্রতাপ' দেখিয়াছিলেন। তিনি সম্মত হইলেন।"[৫] অনেক আলোচনার পর স্থির হল যে, স্টারে 'রাণা প্রতাপ'-এর দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতেই হবে মিনার্ভায় 'রাণা প্রতাপ'-এর প্রথম অভিনয়। মিনার্ভায় প্রথম অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন—

রাণা প্রতাপ— সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

শক্তসিংহ— অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পৃথ্বীরাজ— অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি

মানসিংহ— মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মন্টুবাবু)

আকবর— নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (থাকবার)

সেলিম— ক্ষেত্রমোহন মিত্র

পুরোহিত— মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)

মেহের— সুশীলাবালা

ইরা— ভূষণকুমারী

লক্ষ্মী— সুধীরাবালা (পটল)

যোশীবাই ও দৌলত— তারাসুন্দরী

স্টার ও মিনার্ভায় 'রাণা প্রতাপ'-এর প্রথম অভিনয়ের ভূমিকালিপি দেখলেই বোঝা যায় যে, সেকালের বিখ্যাত সব অভিনেতা-অভিনেত্রী এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, নিমার্ভার অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'হলদীঘাটের যুদ্ধ' আর দূত মুখে দেওয়া হয়নি। অভিনয়ের আগে প্রস্তাবনা হিসাবে স্বয়ং গিরিশনচন্দ্র দু-চার রাত্রি 'হলদীঘাটের যুদ্ধ' কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন। 'রাণা প্রতাপ'এর বিশেষ আকর্ষণ হবে বলে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রেষারেষির ভাব প্রবল হলেও এই প্রতিযোগিতায় স্টারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করা সে সময়ে একটা দুঃসাহসিক কাজ ছিল। এই প্রতিযোগিতায় মিনার্ভা জয়লাভ করতে পারেনি। টিকিট বিক্রির দিক দিয়েও মিনার্ভা পিছিয়ে ছিল। প্রথম অভিনয় রজনীর বিক্রি ছিল ৩৭৪ টাকা, দ্বিতীয় অভিনয় রজনীর বিক্রি ছিল ৩৬৭ টাকা, তৃতীয় অভিনয় রজনীর বিক্রি ছিল ৩৫৫ টাকা। পরে আরো বিক্রি কমেছিল।[৬] তা হলেও মিনার্ভা 'রাণা প্রতাপ'-এর অভিনয় বন্ধ করে দেয়নি। পরে বিক্রি বেড়েছিল। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই রঙ্গমঞ্চে নাটকটি বিরাশি বার অভিনীত হয়েছিল। অপরদিকে প্রথম অভিনয়ের পর পরবর্তী দু-বছর (১৯০৬-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত) নাটকটি স্টারে মাত্র চব্বিশ বার অভিনীত হয়েছিল। স্টার, মিনার্ভা ছাড়াও গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'রাণা প্রতাপ' কয়েক রাত্রি অভিনীত হয়েছিল। যাইহোক সমকালে 'রাণা প্রতাপ' ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছিল একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বঙ্গভঙ্গ সমকালে 'দুর্গাদাস' নাটকটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়। ড. প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রলালকে রাঠোর বীর দুর্গাদাসের চরিত্র অবলম্বনে একখানি নাটক লিখতে উপদেশ দেন। তাঁর সেই পরামর্শ সমীচীন বিবেচনা করে দ্বিজেন্দ্রলাল 'দুর্গাদাস' রচনা করেন।[৭] নাটকটি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর। প্রধান ভূমিকালিপি ছিল—

দুর্গাদাস— সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

ঔরংজেব— প্রিয়নাথ ঘোষ

দিলীপ খাঁ— তারকনাথ পালিত

রাজিয়া— সুশীলাবালা

প্রথম অভিনয়ের পরবর্তী ছ'মাস প্রতি সপ্তাহে 'দুর্গাদাস' সাদরে অভিনীত হয়েছে। রাজিয়ার ভূমিকায় সুশীলাবালার অভিনয় বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাকে সাতটি গান গাইতে হয়েছিল। সেই গানে ধ্রুপদী সঙ্গীতের সুর-তাল-লয়ের অসাধারণ লাবণ্য লক্ষ করা যায় যা তিনি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাছ থেকে শিখেছিলেন। গুলনেয়ারের সঙ্গে রাজিয়ার অদ্ভুত কোমল সংলাপে যে পরিবেশ সৃষ্টি হত তা সম্পূর্ণ নির্ভর করত সুশীলাবাবার মিষ্টি অভিনয়ের উপর। বলাবাহুল্য, এই নাটকের অভিনয়ে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।[৮] কিছুদিন পর কয়েকটি ভূমিকালিপি পরিবর্তিত হয়েছে। তিনকড়ি দাসী তখন মিনার্ভা থিয়েটারে ছিলেন এবং এই নাটকের প্রথম অভিনয় রজনী থেকে মহামায়া চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বলে আমাদের মনে হয়। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই অভিনয়ের পর অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও কুসুমকুমারী স্টার থিয়েটার ছেড়ে মিনার্ভায় চলে আসেন এবং মিনার্ভায় ২১ জুলাই থেকে অভিনয় করতে থাকেন।[৯] সাতাশতম অভিনয় (৩ নভেম্বর ১৯০৭) রজনীর ভূমিকালিপি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সেখানে বেশ কিছু ভূমিকালিপি পরিবর্তিত হয়েছে। দুর্গাদাস' চরিত্রে অমরেন্দ্রনাথ, রাজসিংহ চরিত্রে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি এবং রাজিয়া চরিত্রে কুসুমকুমারীকে আমরা অভিনয় করতে দেখতে পাই।[১০]

মিনার্ভা থিয়েটারে দীর্ঘকাল ধরে 'দুর্গাদাস' অভিনীত হয়েছিল এবং কিছুদিন অন্তর অন্তর ভূমিকালিপি পরিবর্তিত হয়েছিল। তখন কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঙ্গে দলবদল ও দলাদলির জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীরা প্রায়ই এক থিয়েটার থেকে অন্য থিয়েটারে চলে যেতেন। ফলে অভিনীত নাটকের ভূমিকালিপিও পরিবর্তিত হয়ে যেত। প্রথম দিকে মহামায়া চরিত্রে তিনকড়ি দাসী, পরে প্রকাশমণি অভিনয় করেন। দুর্গাদাস' চরিত্রেও আমরা কখনো দানীবাবু, কখনো অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, কখনো থাকবাবু (নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), কখনো হাঁদুবাবুকে (মন্মথনাথ পাল) অভিনয় করতে দেখেছি। এইসব অভিনেতাদের মধ্যে দুর্গাদাসের ভূমিকায় দানীবাবুর অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী। তিনি লিখেছেন—

> "...যাঁর অভিনয় আমাকে অভিভূত করেছিল, তিনি দানীবাবু। প্রথম দিকেই, ঔরংজীবের রাজসভা ছেড়ে দুর্গাদাস যখন বেরিয়ে যান, তখনই এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হত।...এর পর বইতে লেখা আছে 'সসৈন্যে দুর্গাদাসের প্রস্থান'। কিন্তু এই প্রস্থান-দৃশ্যটি নির্বাকভাবে যা দেখাতেন তা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কখনও ভুলবেন না। ঔরংজীব 'যাও'' বলামাত্র তরবারি বন্ধ করে দানীবাবু একবার মাত্র ফিরে তাকাতেন রোষকষায়িত দৃষ্টিতে। তারপর দুরন্ত গতিতে

বিপরীত দিকে মুখ ফেরাতেন তিনি। সোঁটাওয়ালা বাবরি কাঁধ পর্যন্ত এসে পড়েছে, আর জব্বার মতো পোশাক হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ঝুলছে। যেই উনি বিদ্যুৎ গতিতে মুখ ফেরাতেন, অমনি সেই বাবরির চুলগুলি গালের ওপর এসে পড়ত, আর পোশাকের বেড়গুলিও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যেত। সে যে কী অপূর্ব টাইমিং-এর জ্ঞান; বহু দিনের অভিজ্ঞতা ছাড়া এটা হয় না,— আজ তা বুঝতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে চড়চড় করে হাততালি পড়ত। তারপর উনি মধ্যম গতিতে অথচ দৃপ্তভঙ্গিতে, মঞ্চ থেকে প্রস্থান করতেন— খুব দ্রুতও না, খুব ধীরে না।

চতুর্থ অঙ্কের শেষ দিককার সেই কারাগারের দৃশ্যটিও মনে আছে। দুর্গাদাস এখানে বন্দি। শম্ভুজি ওঁকে বন্দি করে ঔরংজীবের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার প্রেম নিবেদন করতে এলেন, দুর্গাদাস প্রত্যাখ্যান করলেন। গুলনেয়ার যেন রোষে ফুলে উঠলেন, বললেন— তুমি আমায় উপেক্ষা করছ ? বেছে নাও, বেগম গুলনেয়ার অথবা মৃত্যু।

দর্পভরে দুর্গাদাস উত্তর দিলেন— বেছে নিলাম— মৃত্যু।

এই 'মৃত্যু' কথার সঙ্গে সঙ্গে বীর রাজপুতের যে দর্প প্রকাশ পেত, তাঁর সেই অভিব্যক্তি আর দাঁড়াবার ভঙ্গি হত সুন্দর একটা ছবির মতো। মনে হত, কোনও এক চিত্রশিল্পী মুহূর্তে আমাদের চোখের সামনে একটা সুন্দর ছবি এঁকে দিয়েছেন।

...দানীবাবুর ভঙ্গিতে ঠিক এই বর্ণনাই যেন তখন সত্যি সত্যি মূর্ত হয়ে উঠেছিল! প্রতিটি অঙ্গচালনা যেন ছবির মতো। সারা মঞ্চ জুড়ে যেন এক যুদ্ধের অশ্ব চনমন করে বেড়াচ্ছে। সেই গতি, সেই পদক্ষেপ, সেই দীপ্ত ভঙ্গি, আমার মনে চির-জাগরুক হয়ে আছে। দুর্গাদাস-এ আরও অভিনেতা ছিলেন, কিন্তু দানীবাবু সেদিন যে ছাপ ফেললেন, তা কখনওই মুছে যাবার নয়।"[১১]

'দুর্গাদাস' নাটকটি মিনার্ভা থিয়েটারে ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত কিছু বিরতি দিয়ে প্রায় নিয়মিতভাবে অভিনীত হয়েছিল। মনোমোহন থিয়েটারেও বেশ কয়েক রাত 'দুর্গাদাস' অভিনীত হয়েছিল। ন্যাশনাল থিয়েটারে ও স্টারেও দু'এক রাত্রি নাটকটি অভিনীত হয়। সব মিলিয়ে 'দুর্গাদাস' বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে বিপুল জনপ্রিয় হয়েছিল। অভিনয় শত রজনী অতিক্রম করেছিল।

'নূরজাহান' নাটকটি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ। নূরজাহানের ভূমিকায় প্রকাশমণি ও জাহাঙ্গীরের ভূমিকায় প্রিয়নাথ ঘোষ অভিনয় করেন। সমকালে অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকের মতো 'নূরজাহান' বিপুল জনপ্রিয় না

হলেও এই থিয়েটারে অনেকদিন অভিনীত হয়েছিল। খুব ধুমধামের সঙ্গে 'নূরজাহান' খোলা হয়েছিল। প্রথম কয়েক রাত্রির বিক্রয় খুব ভালো হয়েছিল। তবে 'সিরাজদ্দৌলা' অথবা 'মীরকাশিম'-এর মতো হয়নি। ক্রমে টিকিট বিক্রির পরিমাণ কমতে থাকে এবং অষ্টম অভিনয় রজনীতে বিক্রি দাঁড়ায় মাত্র ১৩৬ টাকা। এই অবস্থায় হাল ফেরাতে 'নূরজাহান'-এর সঙ্গে অন্য ছোটো নাটক, অপেরা বা পঞ্চরং জাতীয় নাটক জুড়ে দেওয়া হয়। দশম অভিনয় রজনীতে মলিয়ের কমেডি অবলম্বনে অতুলকৃষ্ণ মিত্র রচিত 'তুফানী' জুড়ে দেওয়ায় বিক্রি বেড়ে দাঁড়ায় ৬৩০ টাকা।[১২] কর্তৃপক্ষের এই পরিকল্পনায় মিনার্ভা কিছুটা অক্সিজেন পেয়েছে এবং 'নূরজাহান' দীর্ঘদীন এই থিয়েটারে অভিনীত হয়েছে। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এখানে নাটকটি আটষট্টি বার অভিনীত হয়েছিল। বাংলা নাট্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি হওয়া সত্ত্বেও সমকালে 'নূরজাহান' কিন্তু বিপুল জনপ্রিয় হয়নি। প্রিয়নাথ ঘোষ, হাঁদুবাবু (মন্মথনাথ পাল), প্রকাশমণি, নীরদাসুন্দরীর মতো কুশলী অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও 'নূরজাহান'কে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দিতে পারেননি।

'মেবার পতন' নাটকটি মিনার্ভা থিয়েটারে মহাসমারোহে অভিনীত হয়। অভিনয়ের তারিখ ছিল ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর। প্রথম অভিনয়ের ভূমিকালিপি ছিল।[১৩]...

রাণা অমর সিংহ— সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

সগর সিংহ— হরিভূষণ ভট্টাচার্য

মহাবৎ খাঁ— প্রিয়নাথ ঘোষ

অরুণ সিংহ— সত্যেন্দ্রনাথ দে

গোবিন্দ সিংহ— তারকনাথ পালিত

রাণী রুক্মিণী— সরোজিনী (নেড়া)

মানসী— সুশীলাবালা

সত্যবতী— প্রকাশমণি

কল্যাণী— হেমন্তকুমারী

প্রথম অভিনয়ের পরবর্তী পাঁচ মাস প্রতি সপ্তাহে নাটকটি বিপুল জনপ্রিয়তার সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। কাহিনি পরিকল্পনায় স্বদেশপ্রীতিকে তিনি নাটকে তুলে ধরেছেন। মেবারের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও করুণ পরাজয়, বিশেষ করে গোবিন্দ সিংহের আত্মত্যাগ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে নাটকে। যদিও নাট্যকার বলেছেন যে, "এই নাটকে আমি এক

মহানীতি লইয়া বসিয়াছি; সে নীতি বিশ্বপ্রেম।" যাইহোক, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ রাণা অমর সিংহ চরিত্রাভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর অসাধারণ অভিনয়ে 'মেবার পতন' জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছায়।[১৪] দীর্ঘদিন 'মেবার পতন' মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। সেকারণে ভূমিকালিপিতেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। দশ বছর পরে নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী যাঁদের দেখা গেছে তাঁর হলেন— রাণা অমর সিংহ চরিত্রে মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), গোবিন্দ সিংহ চরিত্রাভিনয়ে কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, সগর সিংহ চরিত্রাভিনয়ে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী চরিত্রাভিনয়ে কুসুমকুমারী প্রমুখ।[১৫] জনপ্রিয়তার জন্য নাটকটি মনোমোহন থিয়েটারেও (১৯১৯-এর ৬ এপ্রিল থেকে) বেশ কিছুদিন অভিনীত হয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে 'সাজাহান' সবচেয়ে বেশি অভিনীত নাটক। মিনার্ভা ছাড়া স্টার, মনোমোহন, আর্ট থিয়েটার, নাট্যমন্দির প্রভৃতি রঙ্গালয়ে নাটকটি বহুবার অভিনীত হয়েছিল। এককথায় নাটকটির জনপ্রিয়তা ছিল আকাশছোঁয়া। 'সাজাহান' সর্বপ্রথম অভিনীত হয় মিনার্ভা থিয়েটারে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২১ আগস্ট।[১৬] সেদিন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় এই অভিনয়ের বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হয়েছিল। নাটক শুরু হবার সময় জানানো হয়েছিল রাত ৮.৩০ মিনিট। প্রথম অভিনয় রজনীর ভূমিকালিপি ছিল—

সাজাহান— প্রিয়নাথ ঘোষ

ঔরংজেব— সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

দারা— তারকনাথ পালিত

সুজা— হীরালাল চট্টোপাধ্যায়

দিলদার— হরিভূষণ ভট্টাচার্য

মহম্মদ— সত্যেন্দ্রনাথ দে

সোলেমান— অহীন্দ্রনাথ দে

যশোবন্ত সিংহ— নগেন্দ্রনাথ ঘোষ

জাহানারা— সুধীরাবালা (পটল)

পিয়ারা— সুশীলাবালা

নাদিরা— হেমন্তকুমারী

মহামায়া— প্রকাশসুন্দরী

সাজাহান চরিত্রে প্রিয়নাথ ঘোষ এবং ঔরংজেব চরিত্রে দানীবাবুর অভিনয় দর্শকদের মুখে মুখে ফিরত; বিশেষ করে দানীবাবুর অভিনয় ছিল অনবদ্য। সুশীলাবালার (পিয়ারা চরিত্রে) গানগুলি দর্শক-হৃদয়ে আলোড়ন তুলত। 'সাজাহান' দীর্ঘদিন ধরে মিনার্ভাতে অভিনীত হয়েছিল। কয়েক বছর পরে আমরা বেশ কিছু ভূমিকালিপির পরিবর্তন লক্ষ করি। ১৯১৭ সালের ২৮ মার্চ থেকে ঔরংজেব চরিত্রে কালীপ্রসন্ন দাস, জাহানারা চরিত্রে তারাসুন্দরী কখনো প্রকাশমণি, পিয়ারা চরিত্রে চারুশীলাকে অভিনয় করতে দেখি।

স্টার থিয়েটারে ১৯১৫-এর ৫ জুন থেকে 'সাজাহান' অভিনীত হতে থাকে। সাজাহানের ভূমিকায় কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, ঔরংজেবের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অভিনয় করেন। ওই দিন মিনার্ভা থিয়েটারেও 'সাজাহান' অভিনীত হয়। সেখানে সাজাহান ও ঔরংজেবের ভূমিকায় অভিনয় করেন যথাক্রমে প্রিয়নাথ ঘোষ ও দানীবাবু। দানীবাবু অভিনীত ঔরংজেব এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অভিনীত ঔরংজেবের তুলনামূলক আলোচনা করে রমাপতি দত্ত (হরীন্দ্রনাথ দত্ত) লিখেছেন—

> "সাজাহান নাটকের প্রথম অভিনয় হয় মিনার্ভায় ও তাহাতে ঔরংজেব সাজিয়া দানীবাবু বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু এখন অমরেন্দ্রনাথ সেই ঔরংজেবের ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হইয়া দর্শকগণকে এক নূতন ছবি দেখান। দানিবাবুর ঔরংজেব ছিল ক্রুর, ভণ্ড, কুটিল, চক্রী। সে বিবেককে চোখ ঠারিয়া বুঝায়। সে যখন বলে— "আকাশ মেঘাচ্ছন্ন— ঝড় উঠবে।" তখন দর্শকগণ দেখে ও বোঝে, এ প্রাকৃতিক দুর্যোগ নহে। ঔরংজেবের সিংহাসন লাভের পথে নানা বিপর্যয় উপস্থিত, তাই তাহার হৃদয়াকাশ চিন্তামেঘাচ্ছন্ন ইত্যাদি। সে যাহা করে, সমস্তের পিছনেই একটা Policy আছে। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের ঔরংজেব হইত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে যথার্থই প্রাকৃতিক দুর্যোগে পর্য্যুদস্ত, নদীপারের উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত। সে বিবেককে চোখ ঠারে না, কেননা সে যথার্থই ভগবানের হাতের ক্রীড়ানক মাত্র। সে নিজে সুযোগ তৈয়ারী করে না, বরঞ্চ সে-ই অবস্থার দাস। সে যখন বলে— "আমার হাত ধরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ খোদা! আমি এ সিংহাসন চাই নি। তুমি আমার হাত ধরে এ সিংহাসনে বসালে! কেন— তুমিই জান। "—তখন প্রত্যেক বর্ণই তাহার মর্মতন্ত্রী হইতে নির্গত হইয়া আসে। দারার মৃত্যুদণ্ড দৃশ্যে, দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যর্পণকালে তাহার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠে, কম্পিত শ্লথ হস্ত হইতে স্খলিত দণ্ডাজ্ঞা লইয়া জিহন আলি চলিয়া গেলে, পুনঃপুনঃ আর্তনাদ তুল্য চীৎকারেও তাহার সাড়া না পাইয়া, সে হতাশ হইয়া মাটিতে বসিয়া পড়ে। গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধির বশবর্তী হইয়া সে সিংহাসন ত্যাগ বা পিতার

মার্জনা ভিক্ষা করে না, যথার্থ অনুতপ্ত চিত্তেই সে এই সকল কার্য্য সম্পাদনে তৎপর হয়। তাই অমরেন্দ্র চিত্রিত ভাগ্যবিপর্য্যস্ত ঔরংজেবকে দেখিয়া, দর্শকগণ অনেক সময় চোখের কোণ হইতে জল মুছিয়া ফেলেন।”[১৭]

আর্ট থিয়েটারে ‘সাজাহান’ নাটকের ঔরংজেব চরিত্রাভিনয়ে দানীবাবু অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। তখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। ঔরংজেবের অভিনয় দেখে তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়— “একমাত্র দানীবাবুই আজ পর্যন্ত এই উৎকট চরিত্রের অভিনয় করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। দারার মৃত্যুদণ্ডাদেশ স্বাক্ষর করা ও আদেশপত্র জিহনকে দেওয়ার দৃশ্যে যে অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়াছি, তাহার তুলনা হয় না।”[১৮]

এই নাটকে সাজাহানের ভূমিকায় বেশ কয়েকজন শক্তিশালী অভিনেতা অভিনয় করেছেন। প্রিয়নাথ ঘোষ (মিনার্ভায়), কুঞ্জলাল চক্রবর্তী (স্টারে), অহীন্দ্র চৌধুরী (আর্ট থিয়েটারে), শিশিরকুমার ভাদুড়ি (নাট্যমন্দির ও আর্ট থিয়েটারে), চুনীবালা দেব (মনোমোহন থিয়েটারে) প্রমুখ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু কেউই অহীন্দ্র চৌধুরীর মতো দর্শকচিত্ত আলোড়িত করতে পারেননি। পুত্রের বিশ্বাসঘাতকতায় বিপর্যস্ত উন্মত্ত সাজাহানের নিষ্ফল আক্রোশ, গগনবিদারী হাহাকার এবং অসংলগ্ন কথা ও আচরণ অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ে প্রত্যক্ষ করে দর্শক স্তম্ভিত হয়ে যেত। কুঞ্জলাল চক্রবর্তীর অভিনয়ে সাজাহানের সম্রাট-মহিমা তেমন ফুটে উঠত না। শিশিরকুমার ভাদুড়ি সাজাহান চরিত্রে অভিনয় করে অহীন্দ্র চৌধুরীর মতো দর্শকদের আকর্ষণ করতে পারেননি।[১৯]

সাজাহানের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী ও শিশিরকুমার ভাদুড়ির অভিনয়ের তুলনামূলক আলোচনা করে নাট্য-সমালোচক বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী লিখেছেন—

> “...অহীন্দ্রবাবুর ‘সাজাহান’ অভিনয়ে সম্রাট সাজাহানের রুদ্ধ আক্রোশই নিষ্ফলতায় গর্জন করিয়া ওঠে। ‘আমি বৃদ্ধ, অসহায়, পক্ষাঘাতে পঙ্গু বটে, কিন্তু আমি সাজাহান’ অথবা ‘এই সাজাহান ভারতবর্ষকে এতদিন এমন শাসন করে এসেছে যে, একবার যদি সে তার প্রজাদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াতে পারে তো তাদের মিলিত ক্রুদ্ধ নিশ্বাসে শত ঔরংজেব ভস্ম হয়ে পুড়ে যায়’— এইরূপ উক্তি অহীন্দ্রবাবুর সাজাহান অভিনয়ের মূলসূত্র। তদুপতি ‘পক্ষাঘাতে পঙ্গু’ কথাটিকে তিনি বিশেষ কাজে লাগাইয়া থাকেন। সম্পূর্ণ দক্ষিণাঙ্গ অবশ্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত— এইরূপ ভাব দেখাইয়া মঞ্চে তিনি যে-ভাবে পা টানিয়া টানিয়া চলেন, সাধারণ দর্শকের নিকট সেই কসরৎ বা প্যাঁচটি অতি উপাদেয় বোধ হইয়া থাকে। শিশিরকুমার এসব কিছুই করেন না। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলেই যে অবশাঙ্গ হইবে এমন কোন কথা নাই। চিকিৎসাশাস্ত্রে প্যারেসিস্ (Paraisis)

বলিয়া একটা কথা আছে, যাহা পক্ষাঘাতেরই সমার্থক। উহাতে অঙ্গ অবশ হয় না, দুর্বল হয় মাত্র। শিশিরকুমার পক্ষাঘাতের সমর্থনে 'Dead Nurves' নয় 'Week Nurves'-এরই অনুসরণ করেন। তাছাড়া 'সাজাহান' নাটকের সাজাহানও অন্ধ পুত্রস্নেহকাতর অক্ষম বৃদ্ধ মাত্র। দেহের দিক হইতে নয়, মনের দিক হইতেই তিনি সম্পূর্ণ পঙ্গু অসহায়। শিশিরকুমারের অভিনয়ে প্রধান হইয়া ফুটে এই মানসিক পক্ষাঘাত।"[২০]

যাইহোক সমকালে 'সাজাহান' নাটকটি ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরও প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে নাটকটি সাদরে অভিনীত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রিয়নাথ ঘোষ, অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশিরকুমার ভাদুড়ি, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, মন্মথনাথ পাল, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, চুনীলাল দেব, তারাসুন্দরী, সুধীরাবালা (পটল), সুশীলাবালা, প্রকাশসুন্দরী, চারুশীলাকে, কুসুমকুমারী, তিনকড়ি, বসন্তকুমারী প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গমঞ্চে 'সাজাহান' নাটকে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের কুশলী অভিনয়ে 'সাজাহান' নাটকটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বহু অভিনীত নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত' মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুলাই। প্রথম অভিনয়ের ভূমিকালিপি ছিল[২১]—

চাণক্য— দানীবাবু

চন্দ্রগুপ্ত— প্রিয়নাথ ঘোষ

নন্দ— অহীন্দ্রনাথ দে

কাত্যায়ন— হীরালাল চট্টোপাধ্যায়

সেকেন্দার শাহ— হরিভূষণ ভট্টাচার্য

চন্দ্রকেতু— নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (থাকবাবু)

অ্যান্টিগোনাস— সত্যেন্দ্রনাথ দে

সেলুকাস— ননীবালা দত্ত

বাচাল— মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)

আত্রেয়ী— নীরদাসুন্দরী

মুরা— হেমন্তকুমারী

ছায়া— নরীসুন্দরী

হেলেন— সরোজিনী

অ্যান্টিগোনাসের মাতা— প্রকাশমণি

নাটকটির অভিনয় সম্পর্কে এদিন অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হয়েছিল। মিনার্ভা থিয়েটারে 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে বহুদিন অভিনীত হয়েছিল। প্রথম পাঁচ মাস প্রতি সপ্তাহে নাটকটি অভিনীত হয়। দানীবাবু, প্রিয়নাথ ঘোষ, নরীসুন্দরী প্রমুখের অভিনয় দর্শকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত মিনার্ভা থিয়েটারে 'চন্দ্রগুপ্ত' নিয়মিতভাবে অভিনীত হয়। মনোমোহন থিয়েটারেও 'চন্দ্রগুপ্ত' অনেকবার অভিনীত হয়েছিল। এখানেও নাটকটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়। যাঁরা মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করেছিলেন তাঁদের অনেকেই যেমন দানীবাবু, থাকবাবু (নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, অহীন্দ্রনাথ দে, হেমন্তকুমারী প্রমুখ মনোমোহন থিয়েটারে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে অভিনয় করেন। মিনার্ভা, মনোমোহন ছাড়া ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, ম্যাডান থিয়েটার, আর্ট থিয়েটারে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকটিকে বিভিন্ন সময়ে অভিনীত হতে দেখা গেছে।

এই অভিনয়গুলির মধ্যে দানীবাবুর অভিনয় বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। চাণক্যের ভূমিকায় তিনি ছিলেন অনবদ্য। ক্রোধ আক্রোশ জ্বালা প্রতিহিংসা ও উত্তেজিত আবেগের উদ্‌ভ্রান্ত প্রকাশে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চাণক্যের অভিনয় করার সময় দেখা যায় যেন তাঁর চোখ দুটি ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, গলার শিরাগুলি ফুলে উঠছে, মুখের পেশীগুলি প্রবল আবেগের তাড়নায় স্থানচ্যুত হচ্ছে। প্রচণ্ড হৃদয়বৃত্তি উত্তেজিত লীলাবৈচিত্র্য প্রকাশিত হচ্ছে। নন্দকে অভিশাপ এবং কন্যাকে ফিরে পাবার দৃশ্যে দানীবাবুর অসাধারণ অভিনয় দর্শকদের বিস্মৃত ও উত্তেজনায় চমৎকৃত করে রাখত।[২২] রসজ্ঞ ও নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য দানীবাবুর চাণক্যের অভিনয় সম্বন্ধে জানিয়েছেন যে, লোকমুখে দানীবাবুর প্রশংসা শুনে তিনি অভিনয় দেখতে যান। যে প্রত্যাশা নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন তার চেয়ে পেলেন বেশি। এরপর রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং অভিনয় সম্বন্ধে বিচার বুদ্ধি জাগ্রত হয়। তারপর দানীবাবুর সেই চাণক্যের অভিনয় আরও অনেকবার দেখেন কিন্তু আগের মতো আর চমৎকৃত হন না। অথচ দানীবাবু তাঁর অভিনয়-নিষ্ঠা থেকে একচুল কোনোদিন বিচ্যুত হননি। তিনি এমনভাবে অভিনয় করতেন যে চরিত্র বিচারের প্রয়োজন দর্শকচিত্তে উঠতে দিতেন না।[২৩]

দানীবাবুর চাণক্যের প্রশংসা করে অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন—

"চাণক্যের সে সজীব মূর্তি, সেই নিষ্ঠুর, দাম্ভিক, প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্রাহ্মণের যে সুস্পষ্ট ছবি দানীবাবুর অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে, তা যে একবার দেখেছে সে আর জীবনে কখনো ভুলতে পারবে না। এ রকম অপূর্ব অভিনয় বাংলাদেশে এক দানীবাবুর দ্বারা সম্ভব।"[২৪]

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনীত হয়। চাণক্যের ভূমিকায় শিশিরকুমার ও কাত্যায়নের ভূমিকায় নরেশ মিত্র অভিনয় করেন। তখন শিশিরকুমারের বয়স ছিল বাইশ বছর। তিনি চাণক্যের ভূমিকায় যে অভিনয় করেন তা সকলকে বিমুগ্ধ ও বিস্মিত করে। এর আগে মিনার্ভা থিয়েটারে চাণক্যের ভূমিকায় অভিনয় করে দানীবাবু আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয়কালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় শেষে তিনি শিশিরকুমারের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন: "শিশিরকুমারের চাণক্য বুদ্ধিদীপ্ত অসাধারণ অভিনয়। আমি কল্পনায় যে চিত্র এঁকেছি, তার চেয়েও এগিয়ে গিয়েছে— ইতিহাসের চাণক্য আমার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।"[২৫] দানীবাবুর চাণক্য ও শিশিরকুমারের চাণক্যের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে নাট্য-সমালোচক বীরেন্দ্র পালচৌধুরী তাঁর 'অভিনেতৃ আর অভিনয়' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, চাণক্যের ভূমিকায় শিশিরকুমার বুদ্ধিকেই প্রধান সূত্ররূপে অবলম্বন করেছেন। এমন কী স্থূল দর্শককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্য স্থূল অভিনয়কলার আশ্রয় পর্যন্ত গ্রহণ করে হাত দিয়ে মস্তিষ্কের প্রতি ইঙ্গিত করেন। আকারে, ভঙ্গিতে, চলাফেরায় এক বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালিত অতিমানবকেই পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরেন শিশিরকুমার। তাঁর অভিনয়ে চাণক্যের দৃঢ় প্রত্যয়, কূটবুদ্ধি ও প্রভুত্বগর্বী মনোভাব বিশেষভাবে ফুটে উঠত। তিনি যেভাবে সংলাপ বলতেন, সেই বলার ভঙ্গিতে চাণক্য চরিত্র-বিশ্লেষণ স্পষ্ট হয়ে উঠত। অপরদিকে চাণক্যের ভূমিকায় দানীবাবু সংলাপ বলতেন আবেগপূর্ণ কণ্ঠস্বরে। তাতে গমক, কম্পন ও স্বরের আরোহণ এতই মনোহর হত যে, দর্শকগণ মুগ্ধ হয়ে আনন্দে তাঁকে অভিনন্দন জানাতেন। কিন্তু দানীবাবুর অভিনয়ে চরিত্র-বিশ্লেষণের প্রয়াস ছিল না বলে কেবল সুন্দরভাবে বলে যেতেন।[২৬]

১৯২২ সালের ১ জুলাই থেকে ম্যাডান থিয়েটারে 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনীত হতে থাকে। ১৯২৪ সালে আর্ট থিয়েটারে 'চন্দ্রগুপ্ত' মঞ্চস্থ হয়। এই থিয়েটারে চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত, সেলুকাস, কাত্যায়ন ও অ্যান্টিগোনাসের ভূমিকায় যথাক্রমে দানীবাবু, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র ও ইন্দু মুখোপাধ্যায় অভিনয় করেন। দানীবাবুর (১৮৬৮-১৯৩২) বয়স তখন ছাপান্ন বছর। কণ্ঠস্বরে কোনো পরিবর্তন নেই, আগের মতোই রয়েছে—

মেঘমেদুর— মেঘ গর্জনের মতো। যেখানে যেখানে কণ্ঠ উচ্চে নিয়ে যাবার প্রয়োজন হত, সেখানে অনায়াসে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন কণ্ঠস্বর। যেমন, বিখ্যাত অভিসম্পাত দৃশ্যে যখন বলতেন— 'ভগবতী বসুন্ধরে, দ্বিধা হও!' তখন এমন বাজ-ডাকার মতো স্বর-প্রক্ষেপণ করতেন যে, দর্শক কেঁপে উঠত। তাছাড়া তাঁর গতিভঙ্গি ছিল দৃপ্ত, সজীব ছিল চলাফেরার ভঙ্গিমা— কোথাও কোনো জড়তা নেই,— সাবলীল, স্বচ্ছন্দ। চাণক্য— বেশী দানীবাবুর নন্দকে অভিসম্পাত দানের পর প্রস্থান দৃশ্যটির অভিনয় দেখে অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন—

> "এখানে যখন তিনি প্রস্থান করছেন, তখন দেখবার জিনিস এই ছিল যে, তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রস্থান করতেন না। পইতেটা হাতে করে যখন অভিশাপ দিচ্ছেন, সারা শরীরটা তখন তাঁর থরথর করে কাঁপত। এবং এই কাঁপতে কাঁপতে সারা দেহটা পিছু হটতে থাকত। পিছু হটতে হটতে কেমন করে যে হঠাৎ উইংস-এর ভিতরে ঢুকে পড়তেন, ঠিক ধরতে পারতাম না। এই দৃশ্যে, সে যুগে যখন প্রথম ওঁর 'চাণক্য' দেখেছিলাম, প্রচুর হাততালি পড়ত এবং ওটা ধরব কী, আবেগে ভাসিয়ে দিতেন একেবারে!"[২৭]

চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেলুকাসের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ও ছিল আকর্ষণীয়। প্যাঁচ দেখিয়ে আসর মাত করার প্রবণতা তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে ছিল। সেলুকাস চরিত্রের অভিনয়েও তা লক্ষ্য করা যায়।

যাইহোক বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে 'চন্দ্রগুপ্ত' বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়। বিভিন্ন সময়ে নানা রঙ্গমঞ্চে নাটকটির অভিনয় লক্ষ করা যায়। সমকালে বহু নামজাদা অভিনেতা-অভিনেত্রী এতে অংশ নিয়েছিলেন এবং উৎকৃষ্ট অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

বিশ শতকের শুরু থেকে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ঐতিহাসিক বা ইতিহাস নামধারী কিংবা সামান্য ইতিহাস অনুষঙ্গ আছে এমন নাটকের অভিনয় ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ যুগ কালের প্রেক্ষাপটে এই নাটকগুলি দেখতে দর্শক রঙ্গমঞ্চে উপচে পড়ত। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ ছিলেন সেই সময়ের প্রধান নাট্যকার। তাঁদের ঐতিহাসিক নাটকগুলির সমকালীন রঙ্গমঞ্চে রাতের পর রাত অভিনয় হয়েছিল। প্রধান নাট্যকারদের পাশাপাশি মনোমোহন গোস্বামী, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন রায় প্রমুখ অপ্রধান নাট্যকারদের ঐতিহাসিক নাটকগুলিও সেই সময় পেশাদার মঞ্চে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকগুলি সমকালীন পেশাদার মঞ্চে ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। ইউনিক, স্টার, মিনার্ভা, মনোমোহন, ম্যাডান, আর্ট প্রভৃতি থিয়েটারে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি দিনের পর দিন অভিনীত হয়েছিল। এছাড়া ন্যাশনাল, গ্র্যান্ড

ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারেও তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় লক্ষ করা যায়। জনপ্রিয়তার জন্য একই রাতে ভিন্ন ভিন্ন থিয়েটারে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় ছিল একটি সাধারণ বিষয়। একই রজনীতে তাঁর পর পর দুটি নাটকের অভিনয়ও লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের জনপ্রিয়তা নাট্যকার হিসাবে তাঁকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পরও বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি সমকালীন রঙ্গমঞ্চে সাদরে অভিনীত হয়েছিল। এ থেকে সহজেই তাঁর জনপ্রিয়তা বোঝা যায়।

তথ্যসূত্র

১. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৯০১-১৯০৯)— শঙ্কর ভট্টাচার্য, ১ম সং, ১৯৯৪, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, কলকাতা, পৃ. ৩৬৮

২. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর— অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নভেম্বর ১৯৯১, প্যাপিরাস সংস্করণ, স্বপন মজুমদার সম্পাদিত, কলকাতা, পৃ. ৭৫

৩. রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী— অমিত মৈত্র, ২০০৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৩৮৮

৪. দ্বিজেন্দ্রলাল— দেবকুমার রায়চৌধুরী, জগন্নাথ ঘোষ সম্পাদিত, ২য় মুদ্রণ ২০১২, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ২৫৩

৫. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর— অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ৯৩

৬. তদেব, পৃ. ৯৪-৯৮

৭. দ্বিজেন্দ্রলাল— দেবকুমার রায়চৌধুরী, ঐ, পৃ. ২৭৩

৮. রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী— অমিত মৈত্র, ঐ, পৃ. ২৮৬

৯. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৯০১-১৯০৯)— শঙ্কর ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ৭১

১০. তদেব, পৃ. ২৩৭ এবং বেঙ্গলি পত্রিকা, ২ নভেম্বর ১৯০৭

১১. নিজেরে হারায়ে খুঁজি (১ম)— অহীন্দ্র চৌধুরী, আগস্ট ২০১১, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৭১-৭২

১২. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর— অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ. পৃ. ১৫৭

১৩. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৯০১-১৯০৯)— শঙ্কর ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ২৫৬

১৪. বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস— অজিতকুমার ঘোষ, ১৯৯৮, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ৭০

১৫. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৯১০-১৯১৯)— শঙ্কর ভট্টাচার্য, ১৯৯৬, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, কলকাতা, পৃ. ৫১০
১৬. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৯০১-১৯০৯)— শঙ্কর ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ২৬৪
১৭. রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ— রমাপতি দত্ত, দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, জুন ২০০৪, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৩৪০-৪১
১৮. শিশির (পত্রিকা), ১৫ নভেম্বর, ১৯২৪
১৯. রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ— অজিতকুমার ঘোষ, জুন ১৯৯৪, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১৭৯-৮০
২০. নাট্যাচার্য শিশিরকুমার— শঙ্কর ভট্টাচার্য, ১৯৯৩, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, কলকাতা, পৃ. ১৬৩-৬৪
২১. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৯১০-১৯১৯)— শঙ্কর ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ৩৮৯
২২. বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস— অজিতকুমার ঘোষ, ঐ, পৃ. ৭২-৭৩
২৩. নাট্যাচার্য শিশিরকুমার— শঙ্কর ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ৬৮
২৪. নিজেরে হারায়ে খুঁজি (১ম)— অহীন্দ্র চৌধুরী, ঐ, পৃ. ৩৪২
২৫. বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার— হেমেন্দ্রকুমার রায়, নূতন সংস্করণ ১৯৯১, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, পৃ. ১৪
২৬. নাট্যাচার্য শিশিরকুমার— শঙ্কর ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ. ৭২-৭২
২৭. নিজেরে হারায়ে খুঁজি (১ম)— অহীন্দ্র চৌধুরী, ঐ, পৃ. ৩৪৩

কালের দ্বন্দ্বে—চাঁদ সদাগর ও চাঁদ বণিক—একটি পাঠ প্রতিক্রিয়া

রামশঙ্কর প্রধান

'চাঁদ সওদাগর' চিরন্তন এক প্রতিস্পর্ধী চরিত্র। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের, কিংবা বলা যায় সর্বকালের প্রেক্ষাপটে। একদা মঙ্গলকাব্য পাঠে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, সে কালের কবি কী বিস্ময় ক্ষমতার প্রতিভা বলে এমন চরিত্র কল্পনায় আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। শুধু প্রাচীন-মধ্যযুগেই নয়, উনিশ-বিশ তথা একবিংশ শতাব্দীতে চাঁদ চরিত্রের মুক্ত চিত্তের স্বাধীন পুরুষের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে চাঁদ সদাগরই অন্যতম পুরুষ, যিনি দেবমহিমার ভক্তি বিগলিত ভাব পরিবেশে অতিলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মনসা দেবীর বিরুদ্ধে অনবনত চিত্তে সংগ্রাম করে গেছেন। সেই প্রাচীনকালে যেমন অন্ধকার রূপী মনসার আরাধনায় সমাজ ব্যাপৃত থেকেছে; আজও অন্ধকার রূপিনী পাতাল বাসিনী মনসার বন্দনায় সমাজ মুখরিত। চাঁদ সেই প্রাচীনকাল থেকেই জ্ঞান রূপী-মঙ্গলরূপী-সত্যরূপী শিবের পূজায় ও মঙ্গল সাধনে রত। এ প্রসঙ্গে ড. ক্ষেত্র গুপ্তের মতটি স্মরণ যোগ্য— "মঙ্গল কাব্যই একমাত্র কাব্য যার অন্তর বাহির ব্যপ্ত করে একটা তীব্র সংগ্রাম আদ্যান্ত প্রসারিত। সে সংগ্রাম কেবল ঘটনাগত দ্বন্দ্ব বা রাজায় রাজায় যুদ্ধের পর্যায়ভুক্ত নয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের, নীতির সঙ্গে শক্তির বলা যেতে পারে মুক্ত বুদ্ধির সঙ্গে যুগ সঞ্চিত অন্ধভক্তির।" (প্রাচীনকাব্য— সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন)।

চাঁদ চরিত্রের জীবন দর্শন আমরা পূরাণ ও বর্তমানের প্রেক্ষিতে বোঝার প্রয়াস পেতে পারি। কবি বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, কিংবা কেতকাদাস ক্ষোমানন্দের কাব্যের বিষয় বস্তু ও কাহিনী বিন্যাসে সামঞ্জস্য বিদ্যমান। চাঁদ সদাগর সেখানে মনসা-বিরোধী বা দেব-বিরোধী। তখন সমাজে তথা লেখক-কবিদের মনে মা মনসা ভক্তির বা দৈবভক্তির প্রভাব দারুন ভাবে বিদ্যমান থাকায় সমাজ-মন লোভে দৈবভীতিতে মজে ছিল। মানুষ নীতি বা

আদর্শের উপর আস্থা রাখতে পারেনি। চাঁদের আদর্শ বোধে ক্ষণিকের জন্য হলেও বিচ্যুতি এসেছিল। ক্ষেমানন্দের চাঁদ শেষ পর্যন্ত মনসা পূজা করতে গিয়ে নীতির বিরুদ্ধে আদর্শের বিরুদ্ধে হেঁটেছে—

"সাবিত্রী সমান হৈল পুত্রবধূ মোর।
ঘরেতে পাইলু মুই চৌদ্দ মধুকর ।।
হেন মনসার পূজা নাহি করি যদি।
বিপাকে হারাই পাছে হাতে পায়্যা নিধি।।

বিজয় গুপ্তের চাঁদ বাণিজ্য তরী-ছয় পুত্র ও লক্ষ্মীন্দরকে হারিয়ে জগৎ ও জীবনের হিসেব নিকেশ করতে গিয়ে এক নিঃস্ব মানুষে পরিণত হয়। কিন্তু নীতি বোধের তাড়নায় সে দ্বন্দ্ব মহিত। শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিত্বের উত্তরণে সে সমস্ত প্রতিকূলতার বিপরীতে একা দাঁড়িয়েছে। সেক্ষেত্রে চাঁদ আদর্শবাদী এবং জীবনবাদীও বলা চলে। সমগ্র সমাজ মনসায় (লোভের প্রতীক, অজ্ঞানতার প্রতীক) নিমজ্জিত হলেও চাঁদ কিন্তু ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তায় সত্যের, জ্ঞানের ও মঙ্গলের অর্থাৎ শিবের আরাধনা করে গেছেন।

সমাজের প্রতিটি মানুষই চায় স্ত্রী পুত্র পরিজন নিয়ে সুখী পরিবার। চাঁদ সওদাগর বণিক সমাজের আধিপতি। সুদূর দক্ষিণ পাটনের বানিজ্যে সফল হয়ে সপ্তডিঙ্গা মধুকর আহরিত বিচিত্র রত্ন রাজি ও ঐশ্বর্যে চাঁদ সেকালের সফল মানুষ। তার এই সুখী সংসার কামনা তো অমূলক নয়। কিন্তু সমাজে তখন উল্টো রথের পালা আরম্ভ হয়ে গেছে। চাঁদের বিজয়ে মানুষ ব্যক্তিচাঁদের সুখে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। প্রাচীন মধ্যযুগের সমাজ বাস্তবতা যেমন সত্য ছিল, সমকালের বাস্তবতাও তেমনি সত্য হয়ে দেখা দেয় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়র 'সওদাগরের নৌকায়' কিংবা শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালায়'। অবশ্য অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাঁদ রূপী প্রসন্ন নিজেই সমাজের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে নিরাপত্তা হীনতায় বিধ্বস্ত হয়েছে। সংসার পুত্র স্ত্রী কাউকে সুখী করতে পারেনি। যৌবনে চাঁদের ভূমিকায় প্রসন্নর অভিনয়— চাঁদরূপী প্রসন্নর অভিনয় অনেকের ঈর্ষার কারণও হয়েছে। হাজার হাজার দর্শকের মনোরঞ্জন করেছেন। খ্যাতির শিখরে পৌঁছে বে-হিসেবী জীবন যাত্রায় সে আজ নিঃস্ব। জীবনের অনেক চড়াই উৎরাই বেয়ে সে জীবন নদীর অন্তিম ঘাটে এসে জীবনের আসল সত্য উপলব্ধি করেছে। কর্মই জীবন কর্মই সত্য। শুধু অর্জন নয়— বিসর্জনের মধ্য দিয়েও— জীবনে সত্য বোধের উত্তরণ ঘটে। তাই প্রসন্ন রূপী চাঁদ সেই আদিমতম পরমতম ঘরছাড়ার ডাকে সাড়া দিয়ে জীবনের নৌকা ভাসিয়ে দেয়। যেখানে হারলেও জিত। জিতলেও জিত।

'চাঁদ বণিকের পালায়' শম্ভু মিত্র দেখিয়েছেন -চাঁদকে তার বণিক সমাজ সর্বান্তকরণে

বিশ্বাস করে না। সমাজ আজ দ্বিধাবিভক্ত, কারণ চাঁদের সুখ খুবই ক্ষণস্থায়ী। মনসার প্রকোপে একে একে তার সপ্তডিঙ্গা মধুকর, ছয় পুত্র ও চাঁদের বানিজ্যসঙ্গী বণিক সমাজের অনেকেরই অকাল প্রয়াণ ঘটেছে। রাজতন্ত্রের পেষণে চাঁদের প্রভাব ও খানিক ক্ষীণ হয়ে গেছে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে চাঁদের ক্ষমতার ডানাও ছাঁটা হল। মহামান্ডলিক বেনীনন্দন ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করতে চাঁদকে বানিজ্য যাত্রায় বাধা দেয়। চাঁদের এতদিনের সুপরামর্শদাতা গুরু বল্লভাচার্যও সমাজের চোরাস্রোতে গা ভাসিয়ে চাঁদকে সৎপথ ত্যাগের পরামর্শ দেন। "ভুল্যে যাও, চন্দ্রধর, মহৎ কার্যের কথা ভুল্যে যাও। শুধু কোনোমতে নিজেরে বাঁচেয়্যা রাখো। আদর্শের পাশে ছুট্যে কোন লাভ নেই।...অর্থহীন জীবনের এই কালীদহে শুধু যেন ঘূর্ণচক্র ঘোরে। সেই চক্রে সূর্য বলো, চন্দ্র বলো, সব যেন বুদুরের মতো মুহূর্তেই লুপ্ত হয়্যা যায়। সত্য শুধু অন্ধকার। মনসার সর্পিল আন্ধার। এই অভিযান তুমি ছেড়্যে দেও চন্দ্রধর। আদর্শের পাছে ছুট্যে কোনো লাভ নাই।" চাঁদের নিজের সমাজের তথা দলের মধ্যেও আজ নেতৃত্বের প্রতি অসম্মান লক্ষ্য করা যায়। সবচেয়ে বড় আঘাত আসে চাঁদের নিজের অন্তঃপুর থেকে। চাঁদ আচমকা আবিস্কার করেন, এতদিন যাকে সহধর্মিনী বলে জানেন সেই সনকা গোপনে পূজা করে অন্ধকার রূপিনী মনসার। চাঁদের চিত্তে হাহা কার মথিত হয়। বাইরের প্রতিকূলতার সাথে চাঁদ এতক্ষণ যুক্তির জালে সমস্ত প্রতিরোধ করে আসছিলেন। কিন্তু এখন তিনি নিজেই অবিশ্বাসের অন্ধকারে নিমজ্জিত। হাহাকারের গাঢ় বেদনায় চাঁদের আর্তনাদ— "ধর্মপত্নী যদি বিশ্বাস ঘাতিনী হয়- হায় ভগবান, মানুষের মন তবে কোথায় ভরসা পাবে ? —যে সংসারে ধর্মপত্নী গণিকার মতো ছলা কর্যে স্বামীরে ভুলায়, সে সংসারের সর্বনাশ হয়্যা গেছে।" চাঁদের সপ্তডিঙ্গা মধুকর, সঙ্গী সাথী কালীদহের ঘূর্ণাবর্তে তলিয়ে গেছে। ছয় পুত্র মনসার প্রকোপে মারা গেছে। চাঁদ আজ নিঃস্ব রিক্ত। তবুও চাঁদ সত্যকে, তার ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেয়নি। সেই প্রাচীন-মধ্যযুগেও নয়, বর্তমানেও। তাই তো চাঁদের সমগ্র জীবন ব্যাপী তার অর্জিত যা কিছু সম্পদ ঐশ্বর্য পুত্র সংসার মহাজ্ঞান একে একে বিসর্জিত হলেও ব্যক্তিত্বের অটল মহিমায় সে তার আরাধ্য দেবতার মতোই সত্য হয়ে, আলো হয়ে সমাজের বুকে, অন্ধকারে বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকে।

সময় চিরকাল একই ভাবে বয়ে চলে না, পট পরিবর্তন হয়। অজিতেশ বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'সওদাগরের নৌকা'-তে সেই পরিবর্তনের রূপ অঙ্কন করেছেন। সওদাগরের আজ আর চাঁদের গৌরব নেই। মানুষও আজ চাঁদের গৌরব মহিমায় আবেগ মথিত হয় না। সবাই খুব অল্প আয়াসে অধিক কিছু অল্প সময়েই পেতে চায়। সময়ের স্রোতে সমাজ পট এই ভাবে পাল্টে যায়। পূর্ববর্তী প্রজন্মের আদর্শ নিষ্ঠা অধ্যাবসায় নীতিবোধ সময়ের চোরাস্রোতে কোথাও ম্লান, আবার কোথাও হারিয়ে যায়। পৌরাণিক চাঁদের আদর্শের কদর

লোকের কাছে ধীরে ধীরে অবসৃত হয়ে স্মৃতিতে বিরাজ করে। তবুও এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ খুব অল্প সময়েই ক্ষণিক সুখস্মৃতির মোহ থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। এর পরিণামও খুব অল্প সময়েই মানুষের প্রত্যক্ষ গোচর হয়। কারণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উদ্ভুত সময়ের ভিত্তিতে কোথাও নীতিবোধ, সত্যবোধ বা মানুষের মঙ্গলবোধের চিরস্থায়ী ভিত্তি ছিল না। ছিল ক্ষণিক ভালোথাকার লোভ। অপরকে বঞ্চিত করে নিজের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির লোভ। তাই এই পরিবর্তন ছিল অনিবার্য। আবারও সমাজ যেন চাঁদের মানস পটে পরিবর্তিত হয়। 'চাঁদ বণিকের পালা'য় সমাজের যিনি অধিপতি হিসাবে নিজেকে জাহির করে, তার অত্যাচারে মানুষ আজ তিতিবিরক্ত। ক্ষমতার লোভে বেনীনন্দনের আসনও নড়বড়ে হয়। তার নিজের দলের লোকের আক্রমণ অরক্ষিত মানুষের মনে কোথাও সুপ্ত চেতনা যেন ফিরে ফিরে আসে। এই অরাজকতার অবসান কল্পে তারাও চাঁদের নীতিতে ও বিশ্বাসে ফিরে আসতে চায়। তারা এখন এও বুঝেছে দেশ এখন 'মনসার' পূজারীদের কুক্ষিগত কিন্তু সত্যকার দেশের অন্তর তো চাঁদ সদাগরের মতো নীতিবান আদর্শনিষ্ঠ পুরুষকারের অন্তরে বেঁচে আছে। তাই তো শিবাদাস বলে "চলো-চলো পাপচিন্তা ধুয়্যে মুছ্যে ফেল্যে পুনরায় ডিঙ্গি নিয়্যা রড় দেও। ওঠো-ওঠো। জমিতে বোসোনা বাপা, শিকড় গজাবে। আকাশে ওড়ার সাধ, পাতালে সিঁধাবে। চলো-চলো-বলো ভাই, সবে উভরায় হাঁক দিয়্যা বলো, চাঁদের নাবিক যায়— হে ঈয়াঃ—" । চাঁদের গুরু বল্লভাচার্য যিনি এই সেদিন ও সত্যের পথ হারিয়েছিলেন, তিনি চাঁদকে পরামর্শ দেন ' আশা রেখো, মনে আশা রেখো, চন্দ্রধর। আশালুপ্ত হয়্যা গেলে সর্বনাশ হয়। "

সর্বস্ব হারানো চাঁদ আবার আশায় বুক বাঁধে— আপন মনে ভাবে— "পুনরায় সমুদ্দর ? আবার আমার সংকীর্ণ আকাশ দিগন্ত বিস্তৃত হবে ?" তার মনের আশা ক্রমে প্রত্যয়ে পর্যবসিত হয়, তার ইষ্টদেবতার প্রতি সেই অবিচল ভক্তি ও সত্য নিষ্ঠা আবার ফিরে আসে। প্রত্যয়ী কণ্ঠে সে বলে ' আছে আছে, কোথাও নিচ্চয় এট্টা মানে আছে কিছু। জীবনের মূলে ? কেন্দ্রে ? এটা কিছু নীতির নিয়ম নিচ্চয় রয়েছে। নাইলে জীবনটা আকস্মিক।' তাই চাঁদ কর্তব্যে স্থির হয়, চরৈবেতি মন্ত্রে দীক্ষিত চাঁদ আবার সকলকে ডাক দেন— 'আমাদের পথ সত্য, চিন্তা সত্য, কর্মসত্য। আমাদের জয় কেউ ঠেকাতি পারে না।' চাঁদ নাস্তিক নন। কিন্তু চ্যাংমুড়িকানীর ভিক্ষুক বৃত্তি, ছলনাময়ী অভিনয়ে বিরূপ চাঁদ তাকে পূজা দিতে অসম্মত হয়। তার আরাধ্য শিব যোগী শ্রেষ্ঠ। যিনি সৃষ্টি, স্থিতি মঙ্গলের প্রতীক। তাঁর কাছেই চন্দ্রধর সমষ্টি তথা রাষ্ট্রের মঙ্গল ও হিতের জন্য বাঁচার মন্ত্র শিখেছেন। যে কারণে সমাজকে তিনি মনে করিয়ে দেন মানুষের গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যের কথা। মানুষের বেঁচে থাকার সার্থকতা হল হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার মধ্যে, লুপ্ত সমৃদ্ধি তথা পূর্ব পুরুষের নাম উজ্জ্বল করার পরম্পরায়। এই জন্য চাঁদের সমুদ্র যাত্রা বা পাড়ি দেওয়া।

শম্ভু মিত্র এই নাটকে মনসামঙ্গলের নিজের গল্পটিকে বহিরঙ্গে ধারণ করেছেন, অন্তরঙ্গে সমকালের সংকটময় বাস্তবতার পূর্ণর্বয়ান করে 'পুরাণের নবজন্ম' দিয়েছেন । নাটকটির প্রকাশ ১৯৭৭-সাল। নাটকের অন্তরঙ্গে তৎকালীন তথা সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট বিদ্যমান। চাঁদের সহচর ন্যাড়ার বক্তব্যে সমাজের স্বরূপ উন্মেচিত।— " জানো তুমি কী কথা শুন্যেছি ? ঐ বেনীনন্দনের বিশ্বাসের ভৃত্য ছিল যারা, তারা ঐ বনের ভিতর দিয়া অন্য রাজ্যে পালাল এখনি। সেই যে সুবল— বেনীনন্দনের ছেল্যে— সে নাকি নিজের বাপেরেই হত্যা কর‍্যা সিংহাসন কেড়্যে নিছে। আর অনুগত যে সব লোকের বেনীনন্দন নানা স্থানে ভুইঞ্যা কর‍্যা দিয়্যেছিল। তারা বেশি ভাগ নাকি আজ সুবলের পক্ষে গেছে। ছি! ছি ছিঃ। মনসা, মনসা সর্বত্র। শিব নাই সদাগর, শুধু মনস্যা রয়্যেছে।"— এই অবক্ষয়িত সামাজিক পটভূমিতে লক্ষ্মীন্দর যে কোনো আদর্শে স্থিত হতে পারে না। জন্মের মুহূর্তে পিতা দেশান্তরী ছিল। সুবিধাবাদী সমাজ সে সুযোগে তার কপালে জারজ সন্তানের তকমা লাগিয়ে দেয়। লক্ষ্মীন্দর নিজেকে সমাজের কৃমি কীটেরও অধম মনে করে। তার গলা বেয়ে জমাট বাঁধা ঘৃণা যেন উগরে ঠেলে বেরিয়ে আসে— সে তার মা কে বলে— ' মাগো আমি নিজেও জানি না কোনটা যে সত্যকথা।...কোনটা আমার সত্যকার অনুভব ? আমি কিছু বুঝি না মোটেই। আমি যেন কতগুল্যা প্রতিক্রিয়া খালি।.. কিন্তুক আমি কে ? আমারে তো খুঁজে আমি পাইনা কখনো। তাই, মাগো, বড়ো কষ্ট হয়, —না, কষ্ট নয়— লোকে যারে কষ্ট বলে সেটা নয়,— কিন্তুক, কী এটা হয় যেন— অত্যন্ত অস্থির লাগে— (আরো বলতে গিয়ে থেমে যায়। অস্থিরভাবে বলে) বল্যে কোন লাভ নাই— বোঝানো যাবে না।' লক্ষ্মীন্দর এই সমাজ পটে নিজের অস্থিত্বের সঙ্গে লড়াই করে। সমাজের সঙ্গে একা লড়ে রক্তাক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত সেও বুঝেছে সমাজে সত্যের জন্য মঙ্গলের জন্য, হিতের জন্য লড়াইয়ে পাশে কাউকে পাওয়া যায় না, একাই লড়তে হয়। যেমন করে চন্দ্রধর আজ নিঃস্ব হয়ে একা। তবুও সমাজ চাঁদ কে নিয়ে স্বপ্ন দেখে— " সদাগর আমরা সামান্য লোক। জীবিকার তরে আমরা যা কিছু হয় কর‍্যে যেতে পারি। কিন্তুক, তুমি তো আদর্শবাদী। তুমি মর‍্যে গেলে কত লোক কত যুগ ধরে তোমার কাহিনী গেঁথ্যে গ্রামে গ্রামে গান গায়্যা যাবে। চম্পক নগরী ধন্য হবে ইতিহাসে তোমার স্মরণে। অবশ্য একথা নিচ্চয় আমরা তোমারে কোন সহায়তা দিতে তো পারি না। কিন্তুক, আমরা যে কল্পনায় চাঁদ বণিকের এক মূর্তি গড়্যে নিছি। আমাদের সেই কল্পনার মূর্তিটারে চূর্ণ করে দেওনের কোনো অধিকার নাই তোমার বণিক। তুমি তো কেবল তোমার নিজের নও। তুমি মানুষের কল্পনার। তোমার সে দায় তুমি মনে রেখো, চন্দ্রধর সদাগর।" লক্ষ্মীন্দরও বাপের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়— পিতাকে বীর বলে মানে। আদর্শ পিতার সুযোগ্য সন্তানের মতো পিতাকে বলে— "পিতা— আশৈশব কল্পনার পিতা তুমি— বীর পিতা— ধন্য লক্ষ্মিন্দর তুমি তার

পিতা— পাড়ি দেও পিতা, আমি অনুচর হয়্যা সাথে-সাথে যাব। আমারে তোমার অনুচর কর্যা নেও পিতা।”

লোহার বাসর ঘরে সর্পদংশনে মৃত্যুর পর বেহুলা যেভাবে স্রোতের বিপরীতে লক্ষ্মীন্দরের জীবনের জয়টীকা পরিয়ে দিল, বোধকরি বেহুলার জীয়ন কাঠির মন্ত্রে চাঁদ উজ্জীবিত হয়েছিল। “আমাদের মনে হয় এ স্বপ্ন চাঁদ সদাগরের ব্যর্থ বার্ধক্যের স্বর্ণ দিগন্ত দর্শন, ... সমগ্র জীবনের সাধনার ধন যেন চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর পূর্ণ করে তার প্রাসাদ সংলগ্ন নদীঘাটে ভিড়েছে। শুধু বরণ করে ঘরে তুলে নেবার অপেক্ষা।” (প্রাচীন কাব্য— সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা নব মূল্যায়ন)। এ তো সত্যি নয়। চাঁদের মনো ভূমিতে মরীচিকা দর্শন। শম্ভু মিত্রের চাঁদ বণিকও সে সত্য সম্যকভাবে অবহিত। তবু বৃথা আশা মরিতে মরিতে ও মরে না’—জানে মৃত্যুর পর পারে কিছু নেই, তবু ‘জীবনের আশা হায় কে ত্যাজে সহজে’— বেহুলার শর্তে ক্ষণিকের জন্য হলেও রাজি হয়েছিল।

নাটকের পরিণতিতে বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দরের আত্ম হত্যা যেন সমকালীন প্রজন্মের অবক্ষয়িত পরিণামেরই ইঙ্গিত বাহী। (মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া)। তাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। আজন্ম সমাজের ব্যঙ্গ বাণে, সমাজ প্রতিবেশ ও আত্মীয় স্বজনের কুৎসিৎ আচরণে লক্ষ্মীন্দর জর্জরিত। সে যেন মূর্তিমান অপদার্থ। অথচ এই অবক্ষয়িত যুব সমাজের কাছে নতুন কোন আদর্শও বেঁচে নেই; যাকে আঁকড়ে ভবিষ্যতের পথ চলবে তারা। বরং পিতৃ পিতামহদের আদর্শের মহত্তে আজও তারা উদ্বুদ্ধ হয়। তাদের সামনে আজ যেন কোন আলো নেই— জীবনানন্দীয় ভাষায়— ‘কোথাও কোন আলো নেই/কোন কান্তিময় আলো’। স্বামীর প্রাণ ফিরে পেতে বেহুলাকে শেষপর্যন্ত সমস্ত দেবতাকূলের মনোরঞ্জন করতে হয়েছে। যে সভায় চাঁদের আরাধ্য শিবও বিদ্যমান (সত্য-মঙ্গলের প্রতীক ?) পতির প্রাণ পেতে বেহুলাকে তার জীবনের তথা সতীত্বের চরমতম মূল্য দিতে হল। চাঁদকে সে বলে— “ তেত্রিশ কোটির সেই কামোৎসুখ চোখের সুমুখে যে নাচ নেচেছি— শ্বশুর, সে বড় অশ্লীল।...আর সেই নাচের ভিতরে সায় বণিকের কন্যা, সেই যে বেহুলা— সেই যে, তুমি যারে দেখ্যেছিলে বিবাহের দিনে, সে বেহুলা মর্যাগেল।” বর্তমানের এই আবক্ষয়িত সমাজ ও সময়ের প্রেক্ষাপটে আজকের লক্ষ্মীন্দর ও বেহুলা বোঝে জীবনের সমস্ত নীতি, বিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র বিসর্জন দিয়ে লক্ষ্মীন্দরের এই যে পুনরুজ্জীবন লাভ সে তো মৃত্যুরই নামান্তর। বেহুলা বলে— “আমারে বাঁচ্যালে আজ আমারেই হত্যা করা হবে।”—আর লক্ষ্মীন্দর বলে — “আর আমি ? আমরি কারণে মোর পিতা মনসার পূজা দিল তার পাছে সসম্মানে বেঁচে রব আমি। মনসার দোরে যায়্যা অসম্মানে ভিক্ষা কর্যা তুমি ব্যাঁচালে আমারে। তারে পরে নিজে মর্যে গেলে। সেই জ্ঞান শিয়রে বহন কর্যা খুশী মনে বেঁচ্যে রব আমি ? আমার সেই মৃত দেহট্যার গন্ধ যেন প্রত্যেক নিঃশ্বাসে পাই। ...

অবিরাম এই কষ্ট বয়ে-বয়ে কতোদিন কেমন মানুষ হয়্যা-বেঁচ্যে রব আমি। ” বর্তমান সমাজের যূপকাষ্ঠে তাদের মৃত্যু অনিবার্য হয়ে যায়। বর্তমানে আমরা লক্ষ্মীন্দরের মতো দৈহিক বাঁচি আত্মিক ভাবে ক'জনা পারি বাঁচতে ? নিজের তুচ্ছ জীবনের বিনিময়ে তার পিতার আদর্শ চ্যুতি ঘটিয়ে বেঁচে থাকা মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণাদায়ক। বেহুলা— সেও কি এই ব্যাভিচারী সমাজের যূপকাষ্ঠে এই ভাবে প্রতিদিন— দিন প্রতিদিন নিজের, সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে দিয়ে বেঁচে থাকবে ? —মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাদের সেই কাঙ্খিত জগতে তাই তাদের অভিসার ঘটে—“বাসরের রাত্রে তুমি যেই বেহুলারে দেখেছিলে, সেই পরিচয়টাই যেন থাকে চিরকাল”। জীবনানন্দীয় বোধের তাড়নায় তাই লক্ষ্মীন্দর ও বেহুলা আদর্শকে বাঁচিয়ে জীবন থেকে বিদায় নেয়।

চাঁদ শেষ পর্যন্ত ক্ষণিকের জন্য হলেও আদর্শ বিচ্যুত হয়। সেও তো রক্তমাংসের মানুষ। সে বেদনায় মথিত হয়, তার জীবন কামনা, সে কি সকল মানুষের নয়! সে ও তো স্বপ্ন দেখেছিল বস্তু সম্পদ পরিপূর্ণ জগৎ সংসারের। কিন্তু সমাজে বেশির ভাগ মানুষ যেখানে সুবিধাবাদী চাঁদ সেখানে ব্যক্তিত্ববাদী। পৌরুষবাদী এখানেই— তার দ্বন্দ্ব।। সমস্ত জীবন ব্যাপী কামনা ও সাধনার ধন যখন চাঁদের কাছ থেকে একে একে বিসর্জিত হয় তখন চাঁদের প্রানে হাহাকার জেগে ওঠে। সর্বস্ব হারানো চাঁদ আজ জীবনের অন্য এক বোধে উত্তীর্ণ হয়, তা হল শুধু সত্যের সপক্ষে দাড়ালেই জয়ী হওয়া যায় না,। জেতার জন্য ক্ষমতা ও কৌশলে চতুর পথেরও স্মরণ নিতে হয়। বৃদ্ধ চাঁদ আজ নিঃস্ব রিক্ত নাগরিক, পুনঃ পুনঃ বিষাক্ত ছোবলে শুধু বোধ নিয়ে বেঁচে থাকে। তবু সত্য বিচ্যুত নয়—। শিবাই (শিব)-এর পূজার উপচার বেলপাতা দিয়ে চ্যাংমুড়ি কানিকে পূজা দিয়েছিল। বিফলে যায় সে পূজা। বেহুলা লক্ষ্মীন্দর বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়। চাঁদের ভবিষ্যৎ কল্পনা— স্বপ্ন আবার বিনষ্ট হয়। সব হারিয়েও চাঁদ একক ক্ষমতায় চম্পক নগরী রূপ সমাজের দাঁড় ধরে এগিয়ে নিয়ে চলে। এখানেই চাঁদ আধুনিক ট্র্যাজিক মানুষ। শিরদাঁড়া সোজা রেখে সমস্ত প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে চাঁদ সত্যের সন্ধানে, মঙ্গলের সন্ধানে, শিবের সন্ধানে অন্ধকার থেকে আলোয় চম্পক নগরীকে নিয়ে যাবার জন্য দাঁড় বায়—‘ পাড়ি দেও পাড়ি দেও’।

তথ্যসূত্র

১. অজিতেশ নাট্য সংগ্রহ, সম্পদনা : সন্ধ্যা দে, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কল-৯

২. চাঁদ বণিকের পালা, শম্ভু মিত্র, এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রা. লি., ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কল-৭৩

প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্প : দেশভাগের আলেখ্যদর্শন

বল্লরী মুখার্জ্জী

প্রফুল্ল রায়ের গল্প শুধু গল্প নয়— ছেচল্লিশের দাঙ্গা, স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ, ছিন্নমূল মানুষের জীবন যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু সমস্যা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সমকালের দলিল। প্রফুল্ল রায়ের নিজের দেশ পূর্ববাংলার ঢাকার একটি গ্রামে। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ, বিশ্বযুদ্ধ, মহামারী ও মন্বন্তর সমস্ত কিছুকে সঙ্গে নিয়ে কেটেছে তাঁর জীবন। নিজ বাসভূমি থেকে উৎখাত হয়ে অন্য দেশের বাসিন্দা হয়ে জীবন কাটানোর যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে লেখককে। একদিকে ভারতবর্ষের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা অন্যদিকে রক্তাক্ত মানচিত্র বদলে দিয়েছিল অনেকের জীবন। ঘনিয়ে এসেছিল বাঙালির চিরকলঙ্কের দিন দেশভাগ। ১৯৪৭ সাল ভারতবর্ষে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দাঁড় টেনেছিল। সেই মানুষগুলির অনিশ্চিত জীবনের ভবিষ্যতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে আছে প্রফুল্ল রায়ের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে।

অনুপ্রবেশ : গল্পের নায়ক ফরিদ ও তার পরিবার দূর সম্পর্কের চাচা 'দূরদর্শী অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান' শওকতের সাহায্যে নির্দিষ্ট বাসস্থান নিজস্ব পরিচয় খুঁজে ফেরার গল্প 'অনুপ্রবেশ'। সমালোচক সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে— 'অনুপ্রবেশ গল্পে গাঁথা হয়ে আছে ছেচল্লিশের দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা, দেশত্যাগ, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের স্বপ্নভঙ্গ ও অবিরাম দেশ বদলের ইতিহাস।'[১]

'বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেখতে দেখতে সতের বছর কেটে যায়। ইন্ডিয়ার পার্টিশানের সময় বিহারী মুসলমানেরা তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে চলে এসেছিল। তাদের বেশিরভাগই এখনো স্বপ্ন দেখে, লাহোর, করাচি বা ইসলামাবাদ থেকে যে কোনদিন প্লেন এসে তাদের তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু কিছু মানুষ আছে, এখন তাদের বিশ্বাসে রীতিমত চিড়

ধরে গেছে। আর তারা করাচি লাহোরের প্লেনের ভরসা করে না। রাত্রে মিরপুরে উর্দুভাষীদের এলাকায় বসে গোপনে পরামর্শ করে ইন্ডিয়াতে পূর্বপুরুষের ভিটেয় ফিরে গেলে কেমন হয়।'[২] গোপন পরামর্শকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে গভীর রাত্রে ফরিদের পরিবার, রাশেদের পরিবার ও চাচা শওকত বেরিয়ে পড়ে। গল্পে আছে— 'এখনো ভালো করে ভোর হয়নি, রোদ উঠতে অনেক দেরি, এই সময় দলটা নর্থ বিহারের উঁচু হাইওয়ে থেকে নিঃশব্দে, পোকার মতো চুপিসাড়ে কাচ্চি অর্থাৎ কাঁচা সড়কে নেমে আসে।'[৩] স্বাধীন এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া সহজ ব্যাপার না হলেও টাউট বা দালালের সাহায্য ও পরামর্শে নিরাপদে একটা ফাঁকা মাঠে আশ্রয় নেয়। ঘুশপেঠিয়া বা অনুপ্রবেশকারীর সাহায্যে কাঁটাতারের সীমানা পেরিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেও পরিচয়হীন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাদের ভাবিয়েছিল। ফরিদ শুনেছে— 'সাতচল্লিশে ইন্ডিয়া দুভাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দাদা অর্থাৎ ঠাকুরদা মুদাসসর আলী বিবি এবং ছেলে মেয়ে নিয়ে বিহার থেকে ঢাকায় চলে যায়। ছেচল্লিশে বিহারে যে মারাত্মক দাঙ্গা হয়েছিল, সেই সময় তাদের বাড়ি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ফরিদের কেউ মারা না গেলেও চেনা জানা অনেকেই খুন হয়েছিল। তখন চারিদিকে শুধু হত্যা, আগুন, রক্তস্রোত, লাশের পাহাড়, অবিশ্বাস-ঘৃণা আর উন্মত্ততা। আর এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় আতঙ্কে মুদাসসরদার শ্বাস আটকে আসছিল। একটা মুহূর্ত আর নিপারদ মনে হচ্ছিল না। পুরুষানুক্রমে দুশো বছর ধরে যেটা তাদের স্বদেশ, তা ফেলে এক শীতের রাতে তারা পালিয়ে যায়। পেছনে পড়ে থাকে জমিজমা এবং পোড়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপ।'[৪] ফরিদের ঠাকুরদা ও বাবা রহমতকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল পিতৃপুরুষের দুশো বছরের ভিটেমাটি ছেড়ে। কূটনৈতিক রাজনৈতিক নেতা যারা স্বপ্ন দেখিয়েছিল তারা আজ নেই, তীর হারা নাবিকের মতো ছুটে চলেছে তারা শুধুমাত্র এক টুকরো ভূখণ্ড, একটা পরিচয়ের জন্য। প্রথমে নিজ বাসভূমি থেকে উৎখাত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ অবিভক্ত বাংলায়, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবার জন্মভূমি ভারতে আর এখন তারা অনুপ্রবেশকারী। বিহারী উর্দুভাষী মুসলিমরা বারবার উৎখাত হয়েছে তারা মাইগ্রেট হয়েছে।

গল্পের নায়ক ফরিদের জন্ম মিরপুরে। স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে কলেজে গেছে। বি.এ. ডিগ্রি নিয়েও কোন চাকরি তার বাংলাদেশে হবে না। এক অনিশ্চয়তা পিতা রহমতের মৃত্যু ও আর্থিক সংকট ফরিদকে কলেজ ছাড়তে বাধ্য করে। তাছাড়া তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাশেদার জীবন। বাংলাদেশে তাদের বিয়ে ঠিক হয়েছিল কিন্তু বিয়েটা হয়নি কারণ ফরিদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে সঙ্গে নিয়ে ফরিদ চলেছে সপ্তপুরুষের ভিটার টানে শিকড়ের খোঁজে বিহারের মনপহুলে। এই যাত্রায় সঙ্গী হয় তুখোড় জেদি তার চিরসাথী রাশেদা। দুপুরের অনেক পূর্বে তারা পৌঁছায় বারহৌলিতে। সেখানে খাবার নিয়ে মনপহুলে যাওয়ার পথে বহু মানুষের চিৎকারে থেমে যায় তারা। কিছুক্ষণ পরে দেখতে পায় স্লোগান

দিয়ে এক মিছিল আসছে। এই নির্বাচন মিটিং-মিছিল তাদের কাছে সবই অতিপরিচিত। এরপর তারা মোহনপুরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে।

মনপহুলে পৌঁছায় দুপুরের কাছাকাছি সময়। একদিন বিহারের একখণ্ড জমির জন্য ফরিদ চিন্তা করেনি, কিন্তু আজ এখানে এসে সে উদাসীন হয়ে যায়, পূর্বপুরুষের ভিটেমাটির প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশিত হয়। উদাসীন হলেও ফরিদ সচেতন, রাশেদাকে মনে করিয়ে দেয় ঢাকার প্রসঙ্গ না বলার। গ্রামে তারা খোঁজ করে ফরিদের দাদা মুদাসসর আলী এবং রাশেদার দাদা শামসুদ্দিন হোসেনের কিন্তু কেউ বলতে পারে না ওই নামে কেউ ছিল কিনা। তবে তারা শুনছে আগে এই গ্রামে মুসলমান পট্টি ছিল। 'একগুঁয়ে অভিযানকারী' ফরিদ শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বৃদ্ধ লোকটিকে খুঁজে বার করে। প্রাচীন লোকটি জানায় সে জানত তাদের। উত্তেজনায় আবেগে ফরিদের গলা কাঁপতে থাকে। কিন্তু তারপর যা দেখে তাতে নিশ্চুপ হয়ে যায়। যে আবেগ নিয়ে মনপহুলে এসেছিল এক আকাশ হতাশা নিয়ে তারা সেখান থেকে আবার ফিরে যায়। ফেরার পথে আবার চুনাও এর মিছিল। রামবনবাস যার চিহ্ন পেড়, এবং অন্যদিকে যাবার পথে আজিবলালের মিছিল যার চিহ্ন হাতি ছাপ। এদুটো মিছিল তারা সামনে থেকে দেখল। এরপর একদিন চাচা শওকতের সঙ্গে ফরিদ চলল পলিটিক্যাল লিডারের কাছে— 'শওকত খুবই দূরদর্শী, অভিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান। ষাট বছরের জীবনে ভারত পাকিস্তান আর বাংলাদেশে অজস্র দাঙ্গা গণহত্যা দেশভাগ অস্থিরতা আর উন্মাদনার সাক্ষী সে। জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শিখিয়েছে।'[৫] আসলে শওকত জানে পলিটিক্যাল লিডার ছাড়া তাদের জীবনের গতিপথ কেউ বদলাতে পারবে না। এত বছরের জীবনে সে দেখেছে কিভাবে রাজনৈতিক নেতারা সাধারণ মানুষের জীবন পরিচালিত করে। রাষ্ট্র নিজের খেয়াল-খুশি মতো বর্ডার বা সীমানা এঁটে দেয় আর মানুষ এক মুহূর্তে তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। রাজনৈতিক নেতারা সাধারণ মানুষদের নতুন আলোর স্বপ্ন দেখায়, কিন্তু একদিন যারা পাকিস্তানে শান্তিপূর্ণ জীবনের আশ্বাস দিয়েছিল তারা আর থাকেনা। বিহারী উর্দুভাষী মুসলিমদের বারবার উৎখাত হতে হয়েছে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে। কোথাও তারা আশ্রয় পায়নি। শওকত বুঝেছে পলিটিক্যাল লিডারের আশ্রয় নিতে পারলে তাদের জীবনের গতি বদলাতে পারে, কারণ বারহৌলিতে এখন নির্বাচন। পলিটিক্যাল লিডার রাম বনবাসের কাছে পৌঁছে ভেতরে প্রবেশের জন্য দারোয়ানকে অনেক কাকুতি-মিনতি করে। নিজের পরিচয় খুঁজে পাওয়ার কাকুতি-মিনতি দেখে স্মৃতিপটে ভেসে আসে 'একটা দেশ চাই' উপন্যাসের নায়ক বিহারী উর্দুভাষী কলিমউদ্দিনের কথা। সেও উৎখাত হয়ে পরিচয় হারা, তাই পরিচয়ের জন্য পলিটিক্যাল লিডারের দ্বারস্থ হয়েছিল। কলিমুদ্দিনের শেষ আকুতি— 'মেহেরবানী করকে একঠো দেশ দিজিয়ে'।[৬]

রামবনবাসকে ফরিদরা সবই জানায়। অনুপ্রবেশকারী হিসেবে অনেক কথা শুনতে হয় তাদের। তবু তারা হার মানে না, কিছুক্ষণ আগে রাম বনবাস বেআইনি বলেছিল যাদের নিজের স্বার্থের কথা ভেবে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বিদায় দেয়। কিছুদিন পর নির্বাচন, সবার মতে আজীবলাল জিতবে, অন্যদিকে রামবনবাস ফরিদের কাছে জানতে পারে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী প্রায় সাতশ আর তাদের ভোটার কার্ড করাতে পারলে সে হবে জয়ী প্রার্থী। রাম বনবাস রেশন কার্ড ভোটার কার্ডের বন্দোবস্ত করে তবে জানিয়ে দেয়— 'সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে লেকেন হুশিয়ার আমাকে ভোট না দিলে তোমরা জিন্দা করে চলে যাবে।'[৭] নিজের স্বার্থের উদ্দেশ্যে রামবনবাস তাদের পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা করে।

অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। অন্যদিকে নির্বাচনের পূর্বে সে অঞ্চলের আবহাওয়া বদলাতে থাকে। একদিন দুপুরে তাদের ভাগ্যের গতি বদলায় দুটো লোক এসে ভোটার লিস্টে তাদের নাম তুলে দেয়। কিন্তু দুশ্চিন্তা তাদের পিছু ছাড়ে না, একদিন আজিবলালের লোক এসে গোলমাল করে যায় অথচ উত্তেজিত হয়না। সে জানায়— 'ভোটার লিস্টে তোমার নাম উঠেছে রেশন কার্ড হয়ে গেছে। এখন তোমরা ইন্ডিয়ান কোন ভূচ্চরের ক্ষমতা নেই তোমাদের চামড়ায় হাত ঠেকায়। চিন্তা মত করনা। শুধু তোমরা ভোটের কথাটা মনে রেখো।'[৮] স্বার্থান্বেষী রামবনবাস এতগুলো লোকের ভারতের পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রফুল্ল রায় অনুপ্রবেশের মধ্যে দেখিয়েছেন কিভাবে রাজনৈতিক নেতারা সাধারণ মানুষের জীবন পরিচালিত করে। চার দশক ধরে তিন প্রজন্ম কিভাবে একটা পরিচয়, একটা ভূখণ্ডের জন্য ঘুরে বেড়িয়েছে কিন্তু কোথাও তারা আশ্রয় পায়নি। স্বাধীন ভারতবর্ষে যেখানে ছিল পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি সেখানে তারা প্রবেশ করেছে ঘুষপেঠিয়ার সাহায্যে। এখন তারা অনুপ্রবেশকারী। রাজনৈতিক নেতাদের নিজস্ব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষেরা পেয়েছে ভারতীয় পরিচয় পত্র। কিভাবে রাজনৈতিক নেতারা চার দশক ধরে তিন প্রজন্মের মানুষের জীবনকে পরিচালিত করেছে তারই গল্প 'অনুপ্রবেশ'।

শিকড়: 'শিকড়' গল্পটি দেশভাগের প্রেক্ষাপটে রচিত এক অন্য ধারার সংযোজন। দেশভাগ পরবর্তী বহু মানুষকে বাসস্থান হারা হতে হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের সাথে শিকড় ছাড়া হয়ে অন্য দেশে চলে যেতে হয়েছে। তবে এই ছিন্নমূল মানুষগুলো অন্য দেশে গিয়ে বাসস্থান খুঁজে পেলেও জন্মভূমিকে ভুলতে পারেনি। শেকড়ের টানে কখনো তাদের ফিরে আসতে হয়েছে।

এই গল্পটি রচিত হয়েছে তেমনই রাজামোহন এবং করিম সাহেবের বাড়িবদলের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে। রাজমোহনের আদি বাড়ি ছিল ঢাকায় এবং করিম সাহেবের বাড়ি

ছিল ভারতে। দেশভাগের পর তারা ছিন্নমূল হয়ে একে অপরের সঙ্গে বাড়ি আদান-প্রদান করে এবং সেখানের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর অবসরপ্রাপ্ত জীবনে পূর্বের স্মৃতি রোমন্থন মনে পড়ে— 'সেগুনবাগিচার প্রায় এক বিঘে জায়গার মাঝখানে ছিল তাদের মাঝামাঝি মাপের তেতালা। সামনের দিকে বিরাট বাগান, পেছনে পুকুর। এখানেই রাজামোহনের জন্ম। জীবনের মূল শিকড়টা ঢাকার বাড়িতেই থেকে গেছে।'[৯] অন্যদিকে এই বাড়িটা ভেঙে হাইরাইজ করার জন্য প্রোমোটার রাজমোহনের কাছে যাওয়া আসা করছে। তার ছেলে মনির বিরাট অংকের টাকার বিনিময়ে বাড়ি বিক্রি করতে চায়, তবে রাজামোহন জানিয়ে দেয় এ বাড়ি ভাঙতে দেবেনা।

এমনি একদিন এলোমেলো ভাবনার মাঝে পড়ন্ত বিকেলে করিমের আগমন ঘটে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে তার নাতি, নাতনি তাহমিনা ও শামীমকে। এ যেন এক ট্যালিপ্যাথি। পূর্বস্মৃতি রোমন্থনে তাদের দিন কেটে যায়। আর তহমিনা ও শামিমা সঙ্গী পায় রাজমোহনের নাতি-নাতনি রাজা ও বুনাকে। দীর্ঘ জীবন অভিজ্ঞতায় ও স্মৃতি রোমন্থনে রাজমোহন ও করিম ক্লান্ত। পূর্বের কথা ও বর্তমান অবস্থা তাদেরকে কষাঘাত করে। পুরনো বাড়ি দেখানোর জন্য নাতি-নাতনিদের করিম এনেছিল তবে তারা গুরুত্ব দেয়নি, পুরানোর প্রতি অবজ্ঞা মানুষগুলিকে অবসন্ন করেছে।

ঢাকায় যাওয়ার জন্য করিম সাহেব রাজমোহনকে অনুরোধ করেছে কারণ সেখানেও কনস্ট্রাকশন কোম্পানির লোক জ্বালিয়ে মারছে। আর নতুন প্রজন্মের প্রতি ভরসা নেই কারণ তারা যেকোনো সময় বাড়িগুলোকে বিক্রি করে দিতে পারে। তাই এক হতাশার সুর শোনা যায়। রাজমোহন বলে— 'দিনকাল পুরোপুরি বদলে গেছে। পূর্ব পুরুষদের স্মৃতির প্রতি একালের ছেলেমেয়েদের আর কোন ফিলিংস নেই।'[১০] গাঢ় বিষাদ জড়িয়ে করিম সাহেবের মধ্যে— 'পূর্বপুরুষের বাড়িঘর ওরা ভালো করে দেখলই না। নিজের ওরিজিন সম্পর্কে ওদের কোনো টানই নেই। একেবারে রুটলেসের দল।'[১১] একদিকে শেকড়ের প্রতি টান অন্যদিকে শিকড় হীনতা। দুই প্রজন্মের মধ্যে এক দ্বান্দ্বিকতার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ শিকড়হীন মানুষগুলো শেকড় ছেঁড়া মানুষের দুঃখগুলোকে বুঝতে পারেনি। দেশভাগের ফলে ছিন্নমূল মানুষগুলো গাঢ় বিষাদের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে অথচ দ্বিতীয় শিকড়কে ছাড়তে চায়নি, তাকে আশ্রয় করে তারা বেঁচে থাকতে চেয়েছে।

দেশনেই : 'দেশ নেই' গল্পটি শুরু হয়েছে এক নতুন স্বপ্নকে বুকে নিয়ে। গল্পের প্রধান চরিত্র আসাদের জীবনে নতুন স্বপ্ন এসেছে তার বিবাহকে কেন্দ্র করে। আসাদের পরিচয় দিলে বলতে হয় তার পূর্বপুরুষ কেউ বেঁচে নেই। আসাদের জন্মভূমি পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ। দেশভাগের ফলে বাস্তুহারা হয়ে পাঁচ বছর বয়সে পিতা-মাতার সঙ্গে

আসাদ ভারতে আসে। আজ তিরিশ বছর কঠোর পরিশ্রম করে জীবন যাপন করেছে সে এবং পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে নিজের জীবনসঙ্গী খুঁজে পেয়েছে, মাত্র পনের দিনের ব্যবধানে তার বিয়ে তাই হবু স্ত্রীকে নিয়ে সংসার গুছিয়ে নিতে চায়।

কিন্তু হঠাৎই স্বপ্নভঙ্গ ঘটে আসাদের, সহকর্মী রাজিজুল জানায় পুলিশ আসাদের নামে তল্লাশি চালাচ্ছে। এই সংবাদ বজ্রাঘাতের মতো কঠোর হয় আসাদের কাছে। রাজিজুলের কাছে সে উদভ্রান্তের মত জানতে চাই তার অপরাধ কি ? গল্পে আছে— ‘আসাদের শ্বাস আটকে আসে কাঁপা গলায় সে বলে— ‘ কি কসুর আমার ? কেন আমাকে তলাশ করছে ?’[১২] উঠে আসে তিরিশ বছর পূর্বের দেশভাগের কথা, যে আসাদ পাকিস্তানের লোক। তিরিশ বছর আসাদ ভারতে থেকেছে, এটাই তার মাতৃভূমি। পাকিস্তানের কোন স্মৃতি তার নেই অথচ আসাদ ভারতের কেউ নয়। সঠিক বাসস্থানের জন্য রাজিউল তাকে ঘাটকোপর পট্টিতে যেতে বলে সেখানে বাংলাদেশের তাদের গ্রামের অনেকেই রয়েছে। তাই পরের দিন কাজের পর সে আইনুল, কলিমউদ্দিনের বাড়িতে ওঠে। অন্যদিকে শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে জহুরার বাবা নিয়ামতের কাছে অনুরোধ জানায় বিয়েটা পিছিয়ে দেওয়ার জন্য।

ঘাটকোপর পট্টিতে কিছুদিন থাকার পর কাজের জায়গা থেকে যাতায়াতের অসুবিধা এবং অত্যধিক খরচের কারণে পুলিশের খানাতল্লাশি কমলে আবার ফিরে আসে নিজ বাসস্থান ধারায় পট্টিতে। বিশ্রাম নিয়ে যখন আবার নতুন স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়িত করার চিন্তায় মগ্ন তখন ভারী বুটের শব্দ শোনা যায়! তারপর কড়ানাড়ার শব্দ। পুলিশ আসাদের কাছে ভারতের পরিচয় পত্র রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড দেখতে চায় কিন্তু কোন পরিচয় পত্র নেই আসাদের কাছে কারণ— ‘কতকাল যে তার স্থায়ী ঠিকানা ছিল না! ঠিকানা না থাকলে রেশন কার্ডটা হবে কি করে ? তাছাড়া ওটা যে খুবই জরুরী সেটা কখনো সে ভাবেনি।’[১৩] তাই পরিচয়হীন হয়ে এখন আসাদকে জেলে যেতে হয়। সে এখন অনুপ্রবেশকারী। শত চেষ্টা সত্ত্বেও রাজিজুল আসাদের জন্য কিছু করতে পারে না। তার মধ্যে এক প্রবল হতাশার সুর শোনা যায়। অন্যদিকে নিয়ামত তার মেয়ে জহুরার হবু স্বামীর এই অবস্থায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে, দুই হাতে নিজের মাথা ধরে ঝাপসা গলায় বলতে থাকে— ‘কি হবে আমার লেড়কির’ এমনভাবেই কত জীবনের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দাঁড় টানা হয়ে যায়।

দিন তিনেক আগে পুলিশ যাদের নিয়ে এসেছিল ট্রেনে করে তাদের পশ্চিমবাংলার বর্ডারে দিয়া আসে এবং বলে আসে ঘুসপেটিয়া দিয়ে তারা ভারতে প্রবেশ করেছিল, এই অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দিতে। উৎকণ্ঠিত আসাদ এখন উদভ্রান্ত— ‘আসাদ যেন আচমকা পরিচিত পৃথিবী থেকে অন্য এক অজানা গ্রহে চলে এসেছে। বার বার

একজোড়া লাজুক চোখ তার সামনে ভেসে উঠছিল। নাঃ জহুরার সঙ্গে এ জীবনে আর দেখা হবে না। বুকের ভেতরটা তার চুরমার হয়ে যাচ্ছিল।'[১৪] একদিকে স্বপ্নভগ্ন অন্যদিকে দেশছাড়া স্বজনহারা হয়ে আসাদ উদভ্রান্তের মতো বর্ডারের দিকে এগোতে থাকে— 'এত কাল বাদে দেখা যাচ্ছে সে ভারতীয় না বাংলাদেশীও না তার কোনও দেশ নেই।'[১৫]

'দেশনেই' গল্পের মধ্যে প্রফুল্ল রায় দেখিয়েছেন দেশভাগের প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী। রাষ্ট্র নিজের খেয়াল-খুশি মতো বর্ডার বা সীমানা এঁটে দেয় আর মানুষ এক মুহূর্তে তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। দেশভাগের আসাদের পিতা-মাতাকে পাকিস্তান থেকে ভারতে আসতে হয়েছে আর আজ দেশভাগের চল্লিশ বছর পরেও আসাদ কিভাবে বাসস্থান হারা হয়েছে তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে আছে 'দেশনেই' গল্পের মধ্যে। দেশভাগের ইতিহাসে আসাদের মত বহু নির্দোষ, নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষদের উদ্বাস্তু হতে হয়েছে। এমন ভাবে বহু মানুষ মাতৃহারা-গৃহহারা-দেশহারা হয়ে উদভ্রান্ত হয়েছে।

বর্তমানে এই সমস্যা আরো গভীর প্রভাব ফেলেছে। এ শুধু ভারতের সমস্যা নয় সমগ্র পৃথিবীতে এই সমস্যা আমরা দেখতে পাই। মাইগ্রেটেড পিপলসদের লক্ষ করি। বর্তমানে একটি বড় সমস্যা রোহিঙ্গা সমস্যা। আমেরিকাতেও অনেক বিদেশী জাতির অভিবাসন ঘটেছে কিন্তু মার্কিন সরকারের নতুন অভিবাসন নীতির ফলে তারাও পরিচয়হীন নাগরিকত্বহীন ছিন্নমূল মানুষে পরিণত হয়েছে। সিরিয়াতে এই সমস্যা আমরা লক্ষ্য করি শিয়া ও সুন্নি দুটি জাতির মধ্যে গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি হয়েছে এবং যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখা দিচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন দেশ আফগানিস্তান, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান প্রভৃতি দেশের মানুষেরা মাইগ্রেট হয়েছে। মাইগ্রেট সমস্যা বিভিন্ন দেশে বৃহৎ আকার ধারণ করেছে, আজও মানুষের মধ্যে দেশ হারিয়ে ফেলার সংকট প্রকট হয়ে উঠছে। প্রফুল্ল রায়ের মতো সচেতন সাহিত্যিকেরা দেশভাগের যন্ত্রণা ও ভয়াবহতা চিহ্নিত করেছেন তাঁদের গল্প উপন্যাসের মধ্যে।

প্রফুল্ল রায়ের লেখায় উঠে এসেছে সাধারণ মানুষের কথা। মানুষের প্রতি গভীর আকর্ষণে তিনি ছুটে গেছেন আন্দামানে। দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন দেখার জন্য তিনি বেরিয়ে পড়েছেন। তিনি বলেছেন— 'আমার লেখার প্রথম এবং শেষ কথা হল মানুষ। মানুষের দুঃখ সংগ্রাম, তীব্র প্যাশন আর আনন্দ, তাদের অস্তিত্বের সংকট আর আত্মানুসন্ধান— এসবই আমাকে লেখক হবার প্রেরণা দেয়। আজীবন মানুষ নামক এক মহাদেশকে আমি বারবার আবিষ্কার করে যাব।'[১৬] আর দেশভাগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাধারণ মানুষের জীবন। দেশভাগের সমান্তরালে সাধারণ মানষের কথা লিপিবদ্ধ আছে তাঁর লেখায়। প্রত্যক্ষদর্শী লেখক প্রফুল্ল রায় দেশভাগের ভয়াবহতা ও যন্ত্রণার চিত্র অঙ্কন করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এক সতর্ক বার্তা দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১. সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্প : প্রসঙ্গ দাঙ্গা দেশভাগ' 'ঐক্য' (পত্রিকা), গৌরীশংকর সরকার (সম্পাদক), অক্টোবর ২০১৮।

২. প্রফুল্ল রায়, 'গল্প সমগ্র ১', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ মার্চ ১৯৫১, পৃষ্ঠা ১০৩

৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৯৯

৪. তদেব, পৃষ্ঠা ১০১

৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১১৩

৬. প্রফুল্ল রায়, 'একটা দেশ চাই', পত্র ভারতী, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা ২০০

৭. প্রফুল্ল রায়, 'গল্প সংগ্র ১', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ মার্চ ১৯৫১, পৃষ্ঠা ১১৮

৮. তদেব, পৃষ্ঠা ১১৮

৯. প্রফুল্ল রায়, 'সেরা ৫০টি গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রকাশক সুভাষচন্দ্র দে পৃষ্ঠা ১৬

১০. তদেব, পৃষ্ঠা ২১

১১. তদেব, পৃষ্ঠা ২৩

১২. তদেব, পৃষ্ঠা ১২২

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৪

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৫

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৫

১৬. প্রফুল্ল রায়, 'আয়নায় নিজের মুখ', ঐক্য পত্রিকা, সম্পাদক গৌরীশংকর, পৃষ্ঠা ৪৫

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী' : প্রসঙ্গ ভাষা

সান্ত্বনা দেওঘরিয়া

ভ্রমণ হচ্ছে মানব জীবনের এমন এক অপরিহার্য উপাদান যা আনন্দ ও শিক্ষার সমন্বয়ে সুন্দর। প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে প্রত্যেকেই এর প্রতি সমানভাবে আকর্ষণ অনুভব করেছে। কর্মক্লান্ত জীবনের একঘেয়েমি ও বৈচিত্র্যহীনতার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই ভ্রমণ। এই ভ্রমণের ফলে মানুষের মন ও দেহের উন্নতিসাধন হয়। সাহিত্যের বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ শাখার মধ্যে অন্যতম একটি হল ভ্রমণ সাহিত্য। যে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে লেখক ও পাঠক উভয়েই একটা ভ্রমণের তৃপ্তি অনুভব করেন। ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতিগুলি যখন সকলের অভিজ্ঞতা হয়ে উঠে তখনই সেই ভ্রমণ সাহিত্যও সার্থক হয়ে উঠে।

উনিশ শতকে আমরা বহু গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ সাহিত্য পাই যেগুলি পরবর্তী সাহিত্যেও অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। যদুনাথ সর্বাধিকারী, রোগে পড়ে তিনি তীর্থভ্রমণ শুরু করেছিলেন। সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাগুলিকেই তিনি দিনলিপি হিসাবে লিখে রেখেছিলেন, যা পরবর্তীকালে 'তীর্থভ্রমণ' হিসাবে প্রকাশিত হয়। এরপর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী', সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' ইত্যাদি ভ্রমণ সাহিত্য রচিত হতে থাকে যার পরিধি আজও বিস্তৃত হয়ে চলেছে। এই ভ্রমণ সাহিত্যগুলি সবদিক থেকেই উৎকৃষ্ট। যেমনই সুন্দর ঝর্ণা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা, মানুষের আচার-আচরণ, রীতিনীতি ফুটে উঠেছে তেমনি সেগুলির বর্ণনায়, ভাষায় তা অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম একটি প্রধান কারণ হল এর মধ্যে ভাষার যথাযথ ব্যবহার। ভাষার গুণাগুণ ও তার যথার্থ প্রয়োগ এবং এর ব্যবহারের কারণেই সাহিত্য উৎকৃষ্ট সাহিত্য হয়ে উঠে। ভাষা হল সাহিত্যের কারিগর, ভাষার দ্বারায় সাহিত্য লেখা হয়। ভাষা ছাড়া মনের ভাব ব্যক্ত করা যায় না। ভাষা হল মানুষের মন ও চিন্তাজাত

ক্রিয়ারাজির ফসল। উনিশ শতকের সাহিত্যে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল, যার মধ্যে অন্যতম ছিল ভ্রমণ সাহিত্য। ভাষার সঙ্গে মানুষের একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। ভাষা মানুষের কাছে এমনই একটা দিক যার ফলে অন্য প্রাণীর থেকে মানুষ স্বতন্ত্র। সাহিত্য হল একটি শিল্পকলা বা আর্ট, আর ভাষা হল তার প্রকাশ মাধ্যম। তাই এই প্রসঙ্গে বলা যায়— "Literature is an art form, like painting, sculpture, music, drama and the dance, Literature is distinguished from other art - forms by the medium in which it works : Language."[১] এই ভাষা হল মানুষের আত্মা আর তার এই আত্মায় হল ভাষা আমরা আমাদের সেই ভাবটাকেই ভাষায় পরিস্ফুট করি যা আর্টে বা শিল্পে পরিণত হয়।

উনিশ শতকের ভ্রমণ সাহিত্যে আমরা লক্ষ করি বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাঙালির সার্বিক উন্নতি সাধন ঘটাতে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আত্মজীবনী' রচনাতে অনন্য-সাধারণ ভাষা সৃষ্টি ও প্রয়োগ করেছেন। যার ফলে আমরা তাঁর সুনিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠা করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রিত করে বাংলা গদ্যের একটি সাধুরীতি গড়ে তুলতে দেবেন্দ্রনাথের অবদান অপরিসীম। উনিশ শতকের এক বিরল প্রতিভার অধিকারী তিনি।

বাংলায় প্রচুর ভ্রমণরস সমৃদ্ধ কাহিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় সম্ভবত প্রথম পাওয়া যায়। তাঁর 'আত্মজীবনী' গ্রন্থে অনেকগুলি ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে। ১৮৪৬ সালে শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষাতে নৌকাযোগে দেবেন্দ্রনাথ বেড়াতে বার হন এবং কয়েকদিনের ভেতর ঝড়জলের দুর্যোগের মধ্যে পতিত হন। তাঁর সেই ভ্রমণ অভিজ্ঞতাটি ভ্রমণরসে সমৃদ্ধ। "অনেক কষ্টে একটা দড়ি কাটিল, দুইটি কাটিল। তৃতীয়টি কাটিতেছে, আমি আর রাজনারায়ণবাবু স্তব্ধ হইয়া জলের দিকে তাকাইয়া আছি। এ নিমেষে আছি, পর নিমেষে আর নাই, জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি। রাজানারায়ণবাবুর চক্ষু স্থির, বাক্য স্তব্ধ, শরীর অসাড়। এদিকে দাঁড়ীরা দড়িই কাটিতেছে। আবার একটা ভারি দমকা আইল। দাঁড়ীরা বলিয়া উঠিল, 'আবার তাই রে তাই!' বলিতে বলিতে শেষ দড়িটা কাটিয়া ফেলিল। বোট নিষ্কৃতি পাইয়া তীরের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে চলিয়া গেল এবং পাড়ের সঙ্গে সমান হইয়া দাঁড়াইল। আমি এমনি বোট হইতে ডাঙ্গায় উড়িয়া পড়িলাম; রাজনারায়ণবাবুকেও ধরাধরি করিয়া তুলিলাম।"[২] এরপর ১৮৪৭ (আশ্বিন)-এ কাশীতে বেদপাঠ শ্রবণ মানসে যাত্রা এবং বিন্ধ্যাচল, মির্জাপুর, ভ্রমণ করে প্রত্যাবর্তনের পথে কুমারখালীতে জমিদারী প্রদর্শন করে ঘরে ফেরেন।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে তার সরস এবং জীবনানুগ বৃত্তান্ত

'আত্মজীবনী' তে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন, কাশী (১৮৪৭), বর্ধমান, বর্মা (১৮৫০), উড়িষ্যা (১৮৫১), নৌকায় কাশী ও গাড়ী দিয়ে অমৃতসর (১৮৫৬-৫৭), সিমলা (১৮৫৭), ভজ্জী (১৮৫৮), এলাহাবাদ (১৮৫৮) প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করে নানান অভিজ্ঞতার কথা যেমন পাঠককে জানিয়েছেন— "তেমনি প্রকৃতির সৌন্দর্য-উপলব্ধির মধ্য দিয়ে এক গভীর সত্যাণ্বেষণ করেছেন, কখন-কখন দার্শনিক জিজ্ঞাসায় সে ভ্রমণরস সাহিত্যের আনন্দলোকে পাঠককে পৌঁছে দেয়।"[৩]

দেবেন্দ্রনাথ যে মনে-প্রাণে একজন পথিক বা পর্যটক তা আমরা তাঁর ভ্রমন কাহিনি পাঠ করলেই বুঝতে পারি— "এবার কোথায় বেড়াইতে যাই, তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। জলের পথেই বেড়াইতে বাহির হইব, এই মনে করিয়া গঙ্গাতীরে নৌকা দেখিতে গেলাম। দেখি যে, একটা বড় স্টিমারে খালাসীরা তাহার কাজকর্মে বড়ই ব্যস্ত রহিয়াছে... যথাসময়ে তাহাতে চড়িয়া সমুদ্র যাত্রায় বহির্গত হইলাম।"[৪] তবে শুধুমাত্র যাত্রাপথের বর্ণনা, প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়া দেবেন্দ্রনাথের ভ্রমণ কাহিনির একমাত্র লক্ষ ছিল না। তিনি যেখানেই গেছেন সেখানেই লোকেদের আচার, ব্যবহার, তাদের রীতিনীতি সমস্ত কিছুকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন। যখন তিনি ব্রহ্মদেশ বেড়াতে গেছিলেন সেখানকার মানুষদের তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের ভ্রমণগুলি যেন ভ্রমণের জন্যই ভ্রমণ। তাই কাহিনিগুলি ভ্রমণরসে পরিপূর্ণ। প্রকৃতির শোভার বর্ণনা ভ্রমণরসকে ছাড়িয়ে যায়নি কোথাও- তা অতিরঞ্জিতও নয়। তবে মাঝে মাঝে যে অধ্যাত্মভাবুকতা বা দর্শন উঁকি মেরেছে তা ভ্রমণকারীর নিবিড় উপলব্ধিজাত বলেই তা বানানো সত্যের অলংকারের ভার হয়ে উঠেনি। তাঁর 'আত্মজীবনী' রূপে, গুনে, মানে বেশ সমৃদ্ধ। উৎকৃষ্ট ভ্রমণকাহিনির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনি এটি। এই কাহিনিতে কাশী, উড়িষ্যা, সিমলা, ভজ্জী, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের সুনিপুন বর্ণনা দিয়েছেন। আর সেই বর্ণনা প্রসঙ্গই এসেছে ভাষার সৌন্দর্য। ভাষার গুণে তাঁর সাহিত্য হয়ে উঠেছে অনেকখানি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য।

'আত্মজীবনী'-তে আমরা অসাধারণ ভাষার প্রয়োগ দেখতে পাই। সেখানে তিনি অনন্যসাধারণ ভাষা সৃষ্টি ও প্রয়োগ করেছেন যা তাঁর সুনিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য বহন করে। তিনি অত্যন্ত সহজ সরল ভাষার মাধ্যমে গভীর ব্যঞ্জনাময় ভাব ও গভীরতাকে ব্যক্ত করেছেন যা নিটোল সমৃদ্ধিতে ভরপুর। আসলে মনের চিন্তনশীল ভাব-ভাবনা সাহিত্যের মাধ্যমে বাণীরূপ লাভ করে। তবে মনের অভ্যন্তরের নির্যাস, সাহিত্য প্রকাশের মাধ্যমই হল ভাষা। অর্থাৎ ভাষার মাধ্যমেই লেখক তাঁর অন্তর্নিহিত মনন, চিন্তন, অনুভূতিকে বাইরে প্রকাশ করেন। তাই হুমবোল্টের ভাষায় বলা যায়-"

Three sprache its ihr Geistund ihr Geist ihre sprache."[৫] অর্থাৎ মানুষের ভাষায় হল তার আত্মা। আর তার আত্মায় হল তার ভাষা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ভাষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন কারণ সাহিত্য ভাষার মাধ্যমে গড়ে ওঠা এক শিল্প। সেই ভাষা যে সাহিত্যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ সেই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য বেশ প্রাসঙ্গিক– "সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।"[৬] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যকে এক শিল্পকলা হিসাবেই তুলে ধরেছেন, যার প্রকাশ মাধ্যম হিসাবে সহজ, সরল, প্রাণবন্ত ভাষাকেই ব্যবহার করেছেন।

সাহিত্য সমাজের সঙ্গে পাঠকের একটা যোগ লক্ষ্য করা যায়। তাই ভাষাকেও হতে হয় জীবনসম্পর্ক যুক্ত, এ প্রসঙ্গে W.H. Hudson এর মন্তব্য বেশ প্রাণিধানযোগ্য "A Great book grows directly out of life; in reading it, we are brought into large, close and fresh relation with life : and in that fact lies the final explanation of its power.[৭] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আত্মজীবনী" সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। সেখানেও ভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মানুষের ছবিও আমরা নিখুঁতভাবে দেখতে পাই– "দু-ধারী দোকানে কেবল স্ত্রীলোকেরাই নানা প্রকার পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করিতেছে... বাজার দেখিতে দেখিতে একটা বাজারে প্রবেশ করিলাম। দেখি যে বড় বড় টেবিলের উপরে বড় বড় মাছ সব বিক্রয়ের জন্য রহিয়াছে।"[৮] এই গ্রন্থখানিতেও আমরা জীবনেরই ভাষা খুঁজে পাই। এখানে তিনি বর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মধ্যে জানতে পারেন যে তারা কুমীর খায়। অহিংসা বৌদ্ধধর্ম কেবল তাদের মুখে মুখেই, কিন্তু পেটে কুমীর।

দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির শোভাবর্ণনা যথাযথ এবং উচ্ছ্বাসহীন; সহজ সরল এবং ঝর্ণার জলের মতো স্বচ্ছ–যা আমরা পরবর্তীকালে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখাতেও দেখতে পাই। 'আত্মজীবনী' এক ভ্রমণরসে পূর্ণ সাহিত্য। "দেবেন্দ্রনাথ ভ্রমণরসকে ক্ষুণ্ণ করেননি কোথাও, অধ্যাত্মভাবনার ক্ষেত্রটুকু বাদ দিলে।"[৯] তাঁর 'আত্মজীবনী'র দুয়ের তিনভাগই হল ভ্রমণকাহিনি। তার মধ্যে আবার হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশের ভ্রমণকাহিগুলি সম্ভবত হিমালয় সম্পর্কে বাংলায় প্রকাশিত প্রথম ভ্রমণকাহিনি বলে চিহ্নিত করতে পারি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর এক বিরল প্রতিভা। তিনি বিষয়কর্মে বেশ দক্ষ ছিলেন। সংসারী হয়েও তিনি ধর্ম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতেন। সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি বাংলা গদ্যচর্চার সুযোগ পান। অবশ্য এর পূর্বে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভায় গৌড়ীয় সাধুভাষা আলোচনার্থ' শীর্ষক বক্তৃতা

দিয়ে তিনি বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর প্রথম অনুরাগ প্রকাশ করেন। তিনি ছিলেন একজন যুক্তিসিদ্ধ ও ভাবুক প্রকৃতির। তাঁর বক্তৃতা ও ধর্ম আলোচনা তথ্যভিত্তিক নয়, প্রগাঢ় অনুভূতিমূলক ও হৃদয়গ্রাহী। ধর্ম, ঈশ্বর ও আত্মচিন্তামূলক বিষয়কে কেন্দ্র করে তাঁর বাংলা গদ্যে অন্তর্মুখীন ভাবধারার গভীরতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মুগ্ধতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা গদ্যকে তিনি গভীর ভাবুকতায় এক আশ্চর্য স্থির দ্যুতি দান করেছেন। সাধু গদ্য কত ধীর স্থির ও ভাস্কর্য লাভ করতে পারে তার প্রমাণ আমরা পাই 'আত্মজীবনী' মূলক ভ্রমণকাহিনিতে। এখানে সাধুগদ্যের সৌন্দর্যতা নিয়ে 'আত্মজীবনী'র কিছু অংশ তুলে ধরা হল—

ক) "আমরা এখন নৌকাতে বসিয়াছি ; হে অনুকূল বায়ু, তুমি উঠ। হয়তো আবার আমাদের সেই দর্শনীয় বন্ধুকে দেখিতে পাইব।"[১০]

খ) "সন্ধ্যার সময়ে আমি এই বাগানে গঙ্গাতীরে বৃদ্ধদিগের সঙ্গে বসিতাম। বর্ষার ঘন মেঘ আমার মাথার উপরে আকাশ দিয়া উড়িয়া চলিয়া যাইত।"[১১]

গ) "এখানে যাঁহারা আমার অঙ্গস্বরূপ, যাঁহারা আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যে আর কোন ধর্মভাব ও নিষ্ঠাভাব দেখিতে পাই না। কেবলি নিজের নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার লড়াই, কোথাও মনের মত সায় পাই না। আমার বিরক্তি ও ঔদাস্য অতিশয় বৃদ্ধি হইল।"[১২]

ঘ) "তাহার পরদিন প্রাতঃকালে এই পারে নৌকা শিথিল ভাবে চলিয়া, বেলা দুই প্রহরের সময় ওপারে পহুছিল। দেখি যে কেল্লার নীচে গঙ্গারচড়াতেঅনেকগুলি ছোট ছোট নিশান উড়িতেছে...।"[১৩]

এইভাবে আমরা দেখবো সাধুরীতির মধ্য দিয়ে ভাষার সৌন্দর্যকে বেশ সুন্দরভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলা গদ্যকে তিনি ভাবুকতায় এক সৌন্দর্যদান করেছেন যা আমরা 'আত্মজীবনী'র ছত্রে ছত্রে দেখতে পাই। ধর্ম ও সমাজচিন্তা তাঁর মনোজগতকে নিয়ন্ত্রণ করেছে অনেকখানি। তিনি গভীর ধর্মভাবনা আত্মপ্রত্যয়ে ভাবমগ্ন হয়ে জীবনসত্যে উপনীত হতে প্রয়াসী ছিলেন। আত্মভাবনাকে আশ্রয় করেছিলেন বলে তাঁর রচনায় আত্মকথন ভঙ্গি এসেছে– "আমি অমৃতসরে রামবাগানের নিকট যে বাসা পাইয়াছিলাম, তাহা ভাঙ্গা বাড়ি, ভাঙ্গা বাগান, এলোমেলো গাছ-জঙ্গলা রকম। কিন্তু আমরা নবীন উৎসাহ, তাজা চক্ষু, সকলি তাজা সকলি নূতন সকলি সুন্দর করিয়া দেখিত"[১৪]

তাঁর বর্ণনায় আমরা নিসর্গের এক অপরূপ বর্ণনার ছবি দেখতে পাই। সেখানেও তিনি যেধরনের ভাষার প্রয়োগ করেছেন তা এককথায় অনবদ্য, "ফাল্গুন মাস চলিয়া গেল,

চৈত্র মাস মধুমাসের সমাগমে বসন্তের দ্বার উদ্ঘাটিত হই এবং অবসর পাইয়া দক্ষিণ বায়ু আম্র-মুকুলের গন্ধে সদ্য প্রস্ফুটিত লেবু ফুলের গন্ধ মিশ্রিত করিয়া কোমল সুগন্ধের হিল্লোলে দিগ্বিদিক, আমোদিত করিয়া তুলিল।"[১৫] উনিশ শতকে এ ধরনের ভাষা ব্যবহার সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। এইরকমের মনোরম বর্ণনা, সুদৃশ্য আমরা 'আত্মজীবনী'র পাতায় পাতায় দেখতে পাই।

দেবেন্দ্রনাথের বর্ণনা প্রত্যক্ষগম্য খুঁটিনাটি বিষয়বস্তুতে পূর্ণ, হাস্যপরিহাসে স্নিগ্ধ কোমল ও বৈচিত্র্যে বর্ণদীপ্ত। তাঁর রচনা ছন্দঝঙ্কারময়, আবেগধর্মী, সাবলীল, উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত এবং কোথাও কবিত্বের স্পর্শে মনোরম ও চিত্তাকর্ষী। তিনি সর্বত্র মিতভাষী এবং সংযত। বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট ধর্মচিন্ত বলে ভাষায় অলংকৃত শব্দাড়ম্বর নেই, কৃত্রিম বেগ নেই। দেবেন্দ্রনাথের গদ্যভাষায় তরঙ্গের উত্থান-পতন নেই। নদীর ধারার মত তা সহজভাবে একমুখীন প্রবাহিত হয়ে চলে— "আমি অমৃতসরে রামবাগানের নিকট যে বাসা পাইয়াছিলাম, তাহা ভাঙ্গা বাড়ি, ভাঙ্গা বাগান, এলোমেলো গাছ-জঙ্গলা রকম। কিন্তু আমার নবীন উৎসাহ, তাজা চক্ষু, সকলি তাজা, সকলি নূতন, সকলি সুন্দর করিয়া দেখিত। অরুণোদয়ের প্রভাবে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত পীত লোহিত ফুলসকল শিশির জলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসের রজত কাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যান-ভূমিতে জরির মছনদ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইথে বায়ু আসিয়া বাগানে মধু বহন করিত, যখন দূর হইতে পাঞ্জাবীদের সুমধুর সঙ্গীত-স্বর উদ্যানে সঞ্চরণ করিত, তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্বপুরী বোধ হইত।"[১৬]

দেবেন্দ্রনাথ তথ্যসঞ্চয়ী ছিলেন না, আর তাঁর ভাষাও প্রাবন্ধিকের ভাষা নয়, তিনি ছিলেন যুক্তিনিষ্ঠ ভাবুক প্রকৃতির। আমরা তাঁর ব্যবহৃত ভাষার মধ্যেও ভাবুকের ভাষায় দেখতে পাই। তাঁর ধর্ম ব্যাখ্যাগুলি ঔপনিষদিক সত্য ও তত্ত্বের আলোচনাতে পরিপূর্ণ হয়েছে। ধর্মব্যাখ্যা করতে গিয়েও তিনি নিজের অন্তরের উপলব্ধির কথাকেই বলেছেন। 'আত্মজীবনী' তেও আমরা বারংবার সেই উপলব্ধির কথাকে দেখতে পাই— "যে মোট ১১ খানি উপনিষদ আছে এবং তাহা শঙ্করাচার্য ভাষ্য করিয়াছেন। এখন দেখি, শঙ্করাচার্য যাহার ভাষ্য করেন নাই এমন অনেক উপনিষদ আছে। অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম যে, ১৪৭ খানি উপনিষদ রহিয়াছে।"[১৭] তাঁর সেই উপনিষদের ঋষির কল্পনার কবিত্বপূর্ণ সৌরভ ও মাহাত্ম্য থাকার জন্য ভাষা যথেষ্ট সুন্দর হয়ে উঠেছে।

সংস্কৃত ভাষার শব্দগুলিকে তিনি সযত্নে ব্যবহার করেছেন। যার ফলে বাংলা গদ্যের পদবিন্যাস সার্থকভাবে বজায় থেকেছে। আর তাঁর 'আত্মজীবনী'তে সেই পদবিন্যাস পরিপূর্ণ। গ্রন্থটি একাধারে আত্মজীবনী আবার ভ্রমণবৃত্তান্তও। আত্মকথা প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ

আপনার মনের ভাণ্ডার থেকে স্মৃতির মালা গেঁথে পাঠককে উপহার দিয়েছেন।"[১৮]

তিনি যখন হিমালয়ের উত্তুঙ্গ পার্বত্য প্রদেশের বর্ণনা করেছেন তখন সেখানে ভাষার গুণে রচনাটি একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্য হয়ে উঠেছে, "তবে কি আমাকে এই পুণ্যভূমি হিমালয় হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে ?"[১৯] বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি একটি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর এই ভ্রমণ সাহিত্যটির ভাষা জলের মত স্বচ্ছ এবং তা স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। তিনি যে একজন সত্যিকারের পর্যটক তা আমরা তাঁর লেখার মধ্যেই দেখতে পাই।

বাংলা ভাষার মাধ্যমেই বাঙালির সার্বিক উন্নতি সম্ভব। তাই সেই সময়কার মনীষীরা চেয়েছিলেন বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে, বাঙালি মননের পরিবর্তন ঘটাতে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মানতেন ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা এই পরিবর্তন কখনই সম্ভব নয়, তাই তিনি বলেছিলেন— "যে সকল কারণে সুশিক্ষিত বাঙ্গালির উক্তি বাংলা ভাষাতেই হওয়া কর্তব্য।"[২০] আমরা দেবেন্দ্রনাথের রচনাতেও একিরকমের ভাষার ব্যবহার লক্ষ করি। সেখানে ভাষা একেবারে সকল মানুষের উপযুক্ত এবং যথোচিত। ভাষা সেখানে এতটাই সহজ, সরল ও সাবলীল হয়ে উঠেছে যা ঝর্ণার জলের মত স্বচ্ছ।

দেবেন্দ্রনাথ মূলত সাধুভাষাকেই মান্যতা দিয়েছিলেন। দাবানলদগ্ধ বনানীর ভাষাচিত্র অঙ্কনে গ্রন্থটি আজও প্রশংসার যোগ্য। সংস্কৃত শব্দের তথা ভাষায় যে বৈশিষ্ট্য তা অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। জটিল সমাসবদ্ধ শব্দ, প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি তাঁর লেখায় আমরা দেখতে পাই। যা দেখতে পাওয়া যায় বহু সাহিত্যিক ভাষাতেও। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার সকলের রচনাতেই আমরা সাধুভাষা লক্ষ্য করি। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচনাতেও এই রকম সাধুভাষা লক্ষ্য করা যায়— "রাশি রাশি অঙ্গার বিকীর্ণ রহিয়াছে; অঙ্গারে অর্ধপূরিত চুল্লী; অর্ধদগ্ধ বংশখণ্ড; অর্ধভঙ্গ, অল্পভঙ্গ, সচ্ছিদ্র, অচ্ছিদ্র মৃৎকলস কত গড়াগড়ি যাইতেছে..."[২১] 'আত্মজীবনী' গ্রন্থটিরও বিরাট অংশই এই সাধুভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে এখানে যে শুধু কঠিন দুর্বোধ্য সাধুভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে তা নয়। এখানে ভাষার সহজ-সরলতাও আমরা দেখতে পাই। এখানে আমরা লৌকিক ও বিদেশি শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই। কমা, কোলন, সেমিকোলন ইত্যাদির যথাযথ ব্যবহার আমরা দেখতে পাই।

গ্রামজীবনের প্রতি তাঁর যে সহানুভূতিশীলতার সঙ্গে মুগ্ধ দৃষ্টিপাত আমরা দেখতে পাই তা এককথায় অসাধারণ। ভাষা এখানে হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট। তাঁর রচনার প্রকাশভঙ্গী বিশেষ সংযত, ভাষার মধ্যে লক্ষ করা যায় সরলতা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী' আজও প্রশংসার দাবী রাখে।

তথ্যসূত্র

১। Hocket, Charles, F : A Course of modern Lingustics, Newyork, p.553
২। ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ, আত্মজীবনী, সাহিত্যবিহার, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ; ১৮৯৮, পৃ. ৩১
৩। চক্রবর্তী, বনানী, বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের রূপ ও রূপান্তর, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, মাঘ ১৪১৯, জানুয়ারি, ২০১৩, পৃষ্ঠা-৮৮
৪। ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তদেব, পৃ. ৬৬
৫। Humboldt, Wilhelm von : uber die verschienheit desmens children sprachbaues, Darmstadt 1949, p. 41
৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যের সামগ্রী, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় বর্ষ, পৃ. ৩২২
৭। Hudson W.H. : An Introduction of the study of Literature, Chapter I, 2nd edition 1913, london, p. 11
৮। ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথ, তদেব, পৃ. ৬৬
৯। বনানী, চক্রবর্তী, বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের রূপ ও রূপান্তর, তদেব, পৃ. ৮৯
১০। ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ, তদেব, পৃ. ৭৭
১১। তদেব, পৃ. ৭৬
১২। তদেব, পৃ. ৭৫
১৩। তদেব, পৃ. ৭৮
১৪। তদেব, পৃ. ৮২
১৫। তদেব, পৃ. ৮৩
১৬। তদেব, পৃ. ৮২
১৭। তদেব, পৃ. ৫৩
১৮। ক্ষেত্র, গুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, এক বিংশতি সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬, পৃ. ২৪০
১৯। ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ, তদেব, পৃ. ১০৩
২০। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শনের পত্র- বঙ্গদর্শন, প্রথম বর্ষ, ১৮৭৩ খ্রি. পৃ. ৫
২১। সরকার, অক্ষয়চন্দ্র, উদ্দীপনা, বঙ্গদর্শন, প্রথম খণ্ড, প্রথম বর্ষ, ১৮৭৩ খ্রি. পৃ- ৪৭

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 13. October, 2021

ভারতের সংবিধানে নারীর অবস্থান

শ্যামল মাহাত

মোজাহিদ আনসারী

শারীরিক দুর্বলতা ও মাতৃত্বের কারণে স্মরণাতীত কাল থেকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা অবহেলিত হয়ে আসছে। এই দিকটি লক্ষ্য করে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা ও বিভিন্ন ধারা ও উপধারায় নারীদের সমান অধিকারেরও কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া সময়ের সাথে সাথে পার্লামেন্ট একের পর এক আইন প্রণয়ন করে চলেছে, তার সঙ্গে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে একের পর এক রায় দিয়ে চলেছে সেগুলি এককথায় ঐতিহাসিক যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এখানে মূলত ভারতের সংবিধানে নারীদের সমান অধিকার ও বিশেষ অধিকারের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলি ধারা অনুসারে তার সঙ্গে পার্লামেন্ট যে সব আইন প্রণয়ন করেছে যেমন পণপ্রথা রদ আইন, পারিবারিক হিংসা আইন, কর্মস্থানে যৌন নির্যাতন বন্ধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিশাখা বনাম রাজস্থান রাজ্য মামলার রায়, তার সঙ্গে ভারতের বস্ত্র সংহিতায় ইভটিজিং, সমহারে বেতন আইন, মাতৃত্বকালীন সুবিধা ১৯৬১ ও সংশোধিত (২০১৬) আইন, ভ্রূণের জন্মপূর্ব লিঙ্গ নির্ধারণ (নিয়ন্ত্রণ অপব্যবহার নিবর্তন) সংশোধন সংক্রান্ত আইন-২০০২ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট যেসব ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে সেগুলো স্থান দেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবনা : ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটি হল— ‘‘আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়িয়া তুলিতে উহার সকল নাগরিক যাহাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা ও অভিব্যক্তির ধর্ম বিশ্বাসের ও উপাসনার স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং তাহাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতির আশ্বাসক ভ্রাতৃত্ব ভাব

বর্ধিত হয়, তার জন্য ,সত্যনিষ্ঠার সহিত সংকল্প করিয়া আমাদের সংবিধান সভায় ২৬শে নভেম্বর ১৯৪৯ তারিখে এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করেতেছি বিধিবদ্ধ করিতেছি এবং আমাদেরকে অর্পণ করিতেছি।''

এই প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নারী পুরুষের সমান অধিকার ও স্বাধীনতার ধারণা লিপিবদ্ধ রয়েছে। কেননা প্রস্তাবনায় সকল নাগরিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, বিশ্বাসের ধর্মের উপাসনা স্বাধীনতা মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্যের কথা বলা হয়েছে। সকল নাগরিক বলতে এখানে নারী ও পুরুষ উভয় কে বোঝানো হয়েছে।

সংবিধানের তৃতীয় অংশ (Part-III) এ (১২-৩৫) নং ধারায় মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। মৌলিক অধিকারের নিম্নলিখিত ধারাগুলিতে নারীর বিষয় উল্লেখ আছে—

ধারা-১৪ : সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে ভারতের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে আইনের দৃষ্টিতে সাম্যতা কিংবা আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়ার থেকে বঞ্চিত করবে না। সাধারণভাবে এর অর্থ স্বাভাবিক বলে মনে হলেও ১৪ নং ধারা টিতে নারীদের পুরুষদের সমান সামাজিক রাজনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত করেছে।

১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার বনাম আনোয়ার আলী সরকার মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিতে গিয়ে বলেন কোনো আইন যদি সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করে তাহলে আদালত সেই আইনকে অবৈধ বলে বাতিল করে দিতে পারে।

ধারা-১৫ : ১৫(১) ধারায় বলা হয়েছে যে জাতি— ধর্ম-বর্ণ স্ত্রী-পুরুষ জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। অর্থাৎ নারীদেরকে মহিলা হওয়ার কারণে রাষ্ট্রীয় পদ ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এছাড়া ১৫(৩) ধারায় আরও বলা হয়েছে যে স্ত্রীলোক ও শিশুদের উন্নতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

১৯৫৪ সালে Yusuf Abdula Aziz Vs. State Bombay Case মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিতে গিয়ে মন্তব্য করেন যে ভারতীয় দণ্ডসংহিতায় ৪৯৭ ধারা অনুযায়ী ব্যভিচারে লিপ্ত পুরুষ ব্যক্তিকে অপরাধী বলে গণ্য করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হলেও এই অপরাধে মহিলাদের বিরুদ্ধে প্ররোচনার অভিযোগ আনা যাবে না এবং তাকে ব্যভিচারের শিকার বলে গণ্য করে শাস্তি দেওয়া যাবে না।

ধারা-১৬ : ১৬(১) নং ধারায় বলা হয়েছে যে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সব ভারতীয় নাগরিক সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। সব ভারতীয় অর্থাৎ মহিলারা

সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে। ১৬(২) ধারায় আরো বলা হয়েছে যে জাতি ধর্ম বর্ণ স্ত্রী-পুরুষ জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে কোনো নাগরিককে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে তার প্রতি কোনো বৈষম্য করা যাবে না।

১৯৯৫ সালে State of Ap Vs. P. B. Vijayakumar Case মামলায় রায় দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্চ মন্তব্য করেন যে সংবিধানের ১৬(২) ধারাটি মহিলাদের বিশেষ অধিকার বিষয়ক ধারা নয় তবুও সংবিধানের ১৫(১) নং ধারা অনুসারে মহিলাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ও সমমর্যাদার স্বার্থে সংবিধানের ১৬(২) ধারাটি মহিলাদের বিশেষ বিশেষ অধিকার-এর ধারা হিসেবে গণ্য করা হবে।

ধারা-২১ : ২১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তিকে তার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। অর্থাৎ এই ধারা অনুসারে কেউ বেআইনি ভাবে মহিলাদের জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

এই ধারা অনুসারে কেউ মহিলাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না কিন্তু পণপ্রথা পারিবারিক হিংসা ইভটিজিং কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা মহিলাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ স্বরূপ। তাই পার্লামেন্ট নারীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। যেমন—

প্রণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন-১৯৬১ : পণ প্রথার কুফল থেকে সমাজকে মুক্ত করার প্রয়াসে পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৬১ প্রণয়ন করা হয়েছে। ১৯৬১ সালের জুন মাসের ২০ তারিখে থেকে এই আইন চালু হয়।

পণ কি : বিয়ের মূল্য স্বরূপ চাওয়া ও দেওয়ার সম্পত্তিকে পণ বলে। এই পণ বিয়ের সময় বিয়ের আগে অথবা পরে চাওয়া ও দেওয়া হয়। পণ নেওয়া ও পণ দেওয়া দুটোই অপরাধ। পণের জন্য যে কোন প্রকার যুক্তি বেআইনি। এই অপরাধের জন্য পাঁচ বছরের জেল এবং ১৫ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে। পণের দাবি করা অপরাধ। শাস্তি দুই বছরের জেল এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে। পণ নিতে বা দিতে অনুপ্রাণিত করেন কিংবা মধ্যস্থতা করেন তিনিও অপরাধী। এই অপরাধের জন্য সাজা ৫ বছরের জেল ও ১৫ হাজার টাকা জরিমানা তবে আদালত যুক্তিযুক্ত কারণ দেখিয়ে এর কম সাজা দিতে পারেন।

পাত্রীর অভিভাবকেরা যদি স্বেচ্ছায় বিয়ে উপলক্ষে নগদ টাকা কিংবা মূল্যবান সম্পত্তি পাত্রপক্ষকে প্রদান করে তবে তা পণ বলে গণ্য হবে না এবং বিয়েতে পাওয়া উপহার পণ বলে গণ্য হবে না। বিয়ের সাত বছরের মধ্যে যদি কোন মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে

আগুনে পুড়ে কিংবা দৈহিক আঘাতের কারণে বা যেকোন প্রকার অস্বাভাবিক কারণে এবং দেখা যায় মৃত্যুর আগে স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়-স্বজন পণের দাবি করেছিল বা এই দাবি নিয়ে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল বা হয়রান করেছিলেন যার কারণে ওই মহিলা মৃত্যুবরণ করেছেন এরূপ মৃত্যুকে পণজনিত মৃত্যু বলা হবে। এই মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তির সাত বছরের কারাদণ্ড এমনকি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে।

পণের অভিযোগ কোথায় জানাতে হবে : থানায় FIR করা যাবে। জামিন অযোগ্য অপরাধ, পুলিশ ওয়ারেন্ট কিংবা বিচারকের আদেশ ছাড়াই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন। পাত্রী নিজে কিংবা তার পিতা-মাতা, অভিভাবক বা যে কোনো স্বীকৃত সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা আদালতে অভিযোগ জানাতে পারেন। মামলার বিচার করবেন একজন প্রথম শ্রেণির বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট।

পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ আইন ২০০৫ : পারিবারিক হিংসা হল— কোন মহিলাকে পরিবারের কোন ব্যক্তি দ্বারা যদি শারীরিক, মানসিক, আবেগজনিত বা যৌন হেনস্থা করা হয় যার ফলে তার দৈহিক, মানসিক, আর্থিক ক্ষতি হয় বা হতে পারে তবে তাকে পারিবারিক হিংসা বলা হয়। যেমন পনের জন্য শারীরিক মানসিক নির্যাতন, পুত্র সন্তান না হওয়া বা সন্তান না হওয়ার জন্য মহিলা কে দায়ী করে প্রতিনিয়ত তার প্রতি কুমন্তব্য করে মানসিক যন্ত্রণা দেওয়া, যৌননিগ্রহ, সম্পত্তির অধিকার ও স্ত্রীধন এর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি পারিবারিক হিংসা হিসেবে গণ্য হয়।

কোন মহিলার ওপর পরিবারের কোনো ব্যক্তির আক্রমণের নিম্নলিখিত ঘটনাগুলো পারিবারিক হিংসা হিসেবে গণ্য হবে :

❒ যদি দৈহিক আক্রমণের ফলে মহিলাটির অঙ্গহানি ঘটে, শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, সে নিরাপত্তা অভাব বোধ করে, যদি তার জীবনের ঝুঁকি থাকে।

❒ যদি পণের জন্য অথবা মহিলার নিজস্ব বা পারিবারিক সম্পত্তি বেআইনিভাবে আদায়ের জন্য কোন মহিলাকে তার আত্মীয় পরিজনকে বাধ্য করার লক্ষ্যে আঘাত বা অপমান করা হয় বা বারবার বিরক্ত করা হয়।

❒ যদি উপরের উল্লেখিত কারণে কোন মহিলাকে আক্রমণের হুমকি দেওয়া হয়।

❒ যদি অন্য কোনভাবে বা যে কোন কারণে কোন মহিলাকে শারীরিক বা মানসিকভাবে আঘাত করা হয়।

কারা এই আইনের সুযোগ নিতে পারেন : এই গৃহে বসবাসকারী কোন নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে নির্যাতিতা মহিলা এই আইনে অভিযোগ করতে পারেন। উক্ত মহিলা

নির্যাতনকারীর স্ত্রী, কন্যা, মা, বোন বা আত্মীয় হতে পারেন, দত্তক গ্রহণের দ্বারা সম্পর্কিত হতে পারেন আবার আত্মীয় না হয়েও দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতনকারীর সঙ্গে একই সঙ্গে একই গৃহে বসবাস করছেন এরা সকলে আইনটির সুযোগ নিতে পারেন।

এই আইনে নির্যাতিতা মহিলা কি কি সুরাহা পেতে পারেন :

- ❒ নির্যাতিতা মহিলা তার ও তার শিশুর জন্য নির্যাতনকারীর কাছ থেকে জীবন মানের উপযুক্ত খোরপোষ পেতে পারেন।
- ❒ তিনি যে গৃহে বাস করছেন সেই গ্রহটির ওপর তার মালিকানা স্বত্বের অধিকার না থাকলেও তিনি ওই গৃহে বসবাস করতে পারেন, প্রয়োজনে নির্যাতনকারীকে সেই গৃহ থেকে বহিষ্কার করার আদেশ আদালত দিতে পারে।
- ❒ নির্যাতনের ফলে নির্যাতিতার যদি আয় উপার্জিত সম্পত্তির বা স্থাবর ধনের ক্ষতি হয় তাহলে তিনি ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন।
- ❒ নির্যাতিত মহিলা পতিগৃহে অসুরক্ষিত বোধ করলে পিতার আশ্রয় থাকার সুযোগ পেতে পারেন।
- ❒ নির্যাতনের ফলে শারীরিক ক্ষতি হলে নির্যাতিত মহিলা ক্ষতিপূরণ হিসেবে চিকিৎসার খরচ পেতে পারেন।

পারিবারিক হিংসার বিরুদ্ধে কে অভিযোগ জানাতে পারেন : নির্যাতিত মহিলা নিজে অথবা তার পক্ষে অন্য কেউ যিনি পারিবারিক হিংসার ঘটনা ঘটেছে বলে জানেন তিনি সুরক্ষা আধিকারিক বা বিডিও-র কাছে অভিযোগ করতে পারেন।

নির্যাতিত মহিলা এই আইনের সুবিধা পাওয়ার জন্য কার সাহায্য নিতে পারেন : নির্যাতিতা মহিলা এই আইন অনুযায়ী সুরাহা পাওয়ার জন্য প্রতিটি ব্লকে সরকার দ্বারা নিয়োজিত সুরক্ষা আধিকারিক অর্থাৎ সিডিপিও-এর সাহায্য নিতে পারেন। সুরক্ষা আধিকারিক নিম্নলিখিত উপায়ে নির্যাতিতা মহিলাকে সাহায্য করতে পারেন—

- ❒ নির্যাতিতা মহিলা চাইলে তাকে অভিযোগ লেখার জন্য সাহায্য।
- ❒ নির্যাতিতা মহিলা ও তার শিশুকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেওয়া ও চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা।
- ❒ প্রয়োজন হলে অভিযোগকারী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয় গৃহে থাকার ব্যবস্থা করা।
- ❒ অভিযোগকারী পরিষেবা প্রদানকারী ও পুলিশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা।

- পারিবারিক হিংসার ঘটনা সম্পর্কে আইন নির্ধারিত পদ্ধতিতে পারিবারিক নির্যাতন রিপোর্ট দাখিল এবং এর প্রতিলিপি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও নির্দিষ্ট পরিষেবা প্রদানকারী এনজিও কে পাঠানো।
- সুবিধা সংক্রান্ত আদালতের আদেশ কার্যকরী করা।

কত দিনের মধ্যে অভিযোগের নিষ্পত্তি হয় : লিখিত আবেদন পাওয়ার দিন থেকে তিন দিনের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শুনানির দিন ধার্য করবেন। আবার আবেদনকারী নির্যাতিতা মহিলা যে বিষয়ে সুরাহা চান সেটি প্রথম শুনানির দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আইনগত আদেশ দিয়ে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করবেন।

পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধের জন্য আবেদনকারী মহিলা কি বিশেষ সুরক্ষা পেতে পারেন ?

নির্যাতিতা মহিলার অভিযোগ পাওয়ার পরে ম্যাজিস্ট্রেট অপর পক্ষকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ দেবেন। উভয় পক্ষকে নিয়ে শুনানির পর ম্যাজিস্ট্রেট যদি প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হন যে পারিবারিক হিংসার ঘটনা ঘটেছে তা হলে মহিলার সুরক্ষার জন্য তিনি নির্দেশ জারি করতে পারেন। এ নির্দেশে আজ্ঞা থাকবে যে নির্যাতনকারী—

- আর কোন পারিবারিক হিংসার ঘটনা ঘটাবে না।
- পারিবারিক হিংসার ব্যাপারে কাউকে সাহায্য করবেন না বা উৎসাহ দেবেন না।
- নিগৃহীত মহিলার সাথে কোন ভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন না অর্থাৎ নির্যাতিত মহিলা কে চিঠি লেখা টেলিফোন করা বা কথা বলা থেকে বিরত থাকবেন।
- নির্যাতিতা মহিলার সম্পত্তি বিক্রি করবেন না। কোনো যৌথ ব্যাংক একাউন্ট বা লকার থেকে লেনদেন করবেন না। মহিলার স্ত্রীধন কিংবা যৌথ মালিকানার কোন সম্পত্তি ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া হস্তান্তর করবেন না।
- নির্যাতিতা মহিলা যদি কর্মরত হন তাহলে মহিলার কর্মস্থলে নির্যাতনকারীর যাওয়া নিষিদ্ধ হতে পারে। নিগৃহীত মহিলার শিশুর স্কুলে যাওয়ার ওপরও ম্যাজিস্ট্রেট নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারেন।
- নির্যাতিতা মহিলার কোন আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তি, মহিলা বা তার শিশুকে পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধে সাহায্য করেছেন এমন কোন ব্যক্তির উপর অত্যাচার করতে পারবেন না।

ভারতীয় দণ্ড সংহিতা ও ইভটিজিং প্রতিরোধ বিধান : ইভটিজিং আমাদের জনসমাজে একটি বারোমাসি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইভটিজিং মৌখিক, শারীরিক, মানসিক ও যৌন হেনস্থা নানা প্রকারের হয়ে থাকে। ইভটিজিং এর শিকার নারীরা পুলিশের কাছে যে অভিযোগ দায়ের করে সেটা নথিভুক্ত হয় ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ২৯৪ ধারার আইনে অথবা ৫০৯ ধারার অধীনে।

ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ২৯৪ নং ধারা : এ ধারায় যদি কেউ কোন প্রকাশ্য জায়গায় অশ্লীল কাজ করে থাকে, অশ্লীল গান, কবিতা আবৃত্তি বা ছবি প্রদর্শন করে থাকে যা নারীর বিরক্তির কারণ হয়ে উড়তে পারে সে ক্ষেত্রে যে বা যারা একাজ করে থাকবেন তাদের জন্য অনধিক তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা বিধান দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৫০৯ নং ধারা : এ ধারায় বলা হয়েছে যে যদি কেউ কোন স্ত্রীলোকের শ্লীলতাহানি বা অসম্মান করার অভিপ্রায়ে কোন কথা বলে থাকে, কোন শব্দ বা অঙ্গভঙ্গি করে থাকে আর যদি সেই স্ত্রীলোক দ্বারা সেটা শ্রুতি পরিদর্শিত হয়ে থাকে এবং পাশাপাশি কোন মহিলার গোপনীয়তারও যদি কোন অনধিকার প্রবেশ ঘটে থাকে তার জন্য অনধিক এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড করা হবে অথবা তাঁকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাঁকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের উপর যৌন হেনস্থা (প্রতিরোধ নিষিদ্ধকরণ এবং প্রতিকার) আইন-২০১৩: এই নতুন আইন প্রণয়নের প্রেক্ষাপট ১৯৯২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ভারতের কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বিশাখা এবং কয়েকটি নারী সংগঠন সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়। দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় ১৯৯৭ সালের ১৩ আগস্ট কেন্দ্র সরকারকে নির্দেশ দেয় যে কর্মক্ষেত্রে মহিলারা যাতে সুরক্ষিত থাকে এবং সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশে কাজ করতে পারে তার জন্য বিশাখা গাইডলাইন অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করতে। সেই অনুযায়ী আইন প্রণীত হয় এবং ২০১৩ সালের ২২ এপ্রিল এই নতুন আইনটি কার্যকর হয়। গোটা ভারতবর্ষে সরকারি-বেসরকারি যে কোন প্রতিষ্ঠানে এই আইনটি প্রযোজ্য।

কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতন কোনগুলোকে বোঝায় ?

- ❒ কর্মক্ষেত্রে কোন প্রকার যৌন আবেদন।
- ❒ অপমান বা অসম্মানজনক কোনো আচরণ বা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য।
- ❒ যৌন হেনস্থা বা শ্লীলতাহানি।
- ❒ জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা।

কর্মক্ষেত্র বলতে কোন ক্ষেত্রগুলো কে বোঝায় ?

- যেকোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকার অধিকৃত সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সমবায় সংস্থা, কল-কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।
- হাসপাতাল অথবা নার্সিংহোম
- খেলাধূলার স্টেডিয়াম
- অসংগঠিত ক্ষেত্র
- বাসস্থান

কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা প্রতিরোধের উপায় :

- কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য সুস্থ ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্র তৈরি করা।
- বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাকরির পদ মর্যাদার ক্ষেত্রে যাতে কোন প্রকার আঘাত না লাগে সে দিকে নজর রাখা।
- কোন প্রকার যৌনতার কারণে যাতে কারো মানসিক-শারীরিক স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না হয় সেই বিষয়ে নজর রাখা।

অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি গঠন প্রণালী : নিয়োগকর্তা কর্তৃক মনোনীত নিম্নলিখিত সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হবে। প্রতিটি সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেখানে ন্যূনতম ১০ জন কর্মচারী নিয়োজিত, সেই প্রতিষ্ঠান এই কমিটি গঠন আবশ্যক।

ক) একজন প্রিসাইডিং অফিসার যিনি দপ্তরের মহিলা কর্মচারি হবেন। যদি এরকম সিনিয়র মহিলা কর্মচারী না পাওয়া যায় তাহলে ওই নিয়োগকর্তার অধীনে যে কোন দপ্তর অথবা অন্য কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে একজন মহিলা কর্মচারি কে মনোনীত করা হবে।

খ) ন্যূনতম দুই জন সদস্য অথবা সদস্যা থাকবেন যারা সামাজিক কাজ এবং আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ হবেন।

গ) একজন সুপরিচিত ব্যক্তি (স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের) এই কমিটিতে থাকবেন। যদি কোন কারণে কাউকে কমিটি থেকে সরে যেতে হয় অথবা অব্যাহতি নিতে হয় তাহলে সেখানে নতুন সদস্য বা সদস্য নিয়োগ করা হবে।

ঘ) এই কমিটির অর্ধেক হবেন মহিলা।

ঙ) এই কমিটির মেয়াদ তিন বছরের বেশি হবেনা।

তদন্ত রিপোর্ট : অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটিকে তদন্ত রিপোর্ট ৯০ দিনের মধ্যে নিয়োগকর্তার কাছে দাখিল করতে হবে।

নিয়োগকর্তার নিকট সুপারিশ পেশ : বিবাদী অথবা নির্যাতিতা মহিলাকে বদলির সুপারিশ করা যাবে', নির্যাতিতা মহিলাকে তিন মাসের ছুটি সুপারিশ করা যাবে, অন্যান্য ধরণের সুবিধা নির্যাতিতা মহিলাকে দেওয়ার সুপারিশ করা যাবে।

স্থানীয় অভিযোগ কমিটি গঠনের নিয়মাবলী : যেসব প্রতিষ্ঠানে দশজনের কমসংখ্যক কর্মচারি নিয়োজিত সেসব প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থানীয় অভিযোগ কমিটি গঠন করা হবে। গৃহ পরিচারিকা যদি নির্যাতিত হন তাহলে এই কমিটিতে অভিযোগ জানাতে পারেন। এই কমিটির সদস্য/সদস্যাদের মনোনীত করবেন জেলাশাসক।

ক) মহিলাদের জন্য সামাজিক কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন একজন দায়িত্বশীল মহিলা এই কমিটির চেয়ারপারসন হবেন।

খ) একজন মহিলা যিনি ব্লক, তহসিল, ওয়ার্ড বা মিউনিসিপালিটি তে কাজ করেন তিনি এই কমিটির সদস্য হবেন।

গ) দুজন সদস্যের মধ্যে একজন হবেন মহিলা যিনি সুপরিচিত অথবা এন জি ও-তে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই দুই সদস্যের মধ্যে একজনের আইন বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মহিলা সদস্য অবশ্যই হবেন উপজাতি, তপশিলি জাতি বা সংখ্যালঘু অংশের।

ঘ) জেলা শহরের একজন সমাজ কল্যাণ দপ্তর অথবা মহিলা এবং শিশু উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক সদস্য হিসাবে কমিটিতে থাকবেন।

এই কমিটির মেয়াদ তিন বছরের বেশি হবে না। উপরে উল্লেখিত ক এবং খ ছাড়া অন্যান্যরা তাদের কাজের জন্য ভাতা পাবেন।

স্থানীয় অভিযোগ কমিটি অভিযোগ গ্রহণ করার পর ৭ দিনের মধ্যে পুলিশের কাছে রিপোর্ট পাঠাবে।

ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ কিভাবে হবে ?

ক) নির্যাতিতা মহিলার মানসিক আঘাত এর ফলে সৃষ্ট ক্ষত বা আবেগজনিত যন্ত্রণার কারণে ক্ষতি হলে।

খ) যৌন হেনস্থার ঘটনায় কর্মস্থলে উন্নয়নের ব্যাঘাত ঘটলে।

গ) শারীরিক বা মানসিক ক্ষতির জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হলে।

ঘ) বিবাদীর কর্মস্থলে পদমর্যাদা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

ঙ) ক্ষতিপূরণ এককালীন বা কিস্তিতে দেওয়া যাবে।

ধারা-২৩ : সংবিধানের ২৩ নং ধারা অনুসারে মানুষ নিয়ে ব্যবসা অর্থাৎ মানুষ ক্রয়-বিক্রয় ও বেগার খাটা বা অনুরূপভাবে বলপূর্বক সন্ধানে বাধ্য করা নিষিদ্ধ।

অর্থাৎ এ ধারাটি অসৎ ব্যবসার উদ্দেশ্যে নারী সংগ্রহ করা আইন সঙ্গতভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি : ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অংশের ৩৬-৫১ নাম্বার ধারাগুলিতে রাষ্ট্রপরিচালনার নীতিসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। নির্দেশমূলক নীতির যেসকল ধারায় নারীর বিষয় উল্লেখ আছে সেগুলি হল—

ধারা-৩৯ (ক) : স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিক পর্যাপ্ত জীবন ধারণের সমান অধিকার ভোগ করতে পারবে।

ধারা-৩৯ (খ) : এ ধারাটিতে নারী-পুরুষের একই কাজের জন্য সমান মজুরির কথা বলা হয়েছে।

সমহারে বেতন আইন, ১৯৭৮ : সংবিধানের ৩৯ (খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত সমকাজে সম বেতন নীতি কার্যকর করার লক্ষ্যে পার্লামেন্ট এই আইন প্রণয়ন করে। এই আইনে সমকাজ অথবা একই রকম কাজ বলতে বোঝানো হয়েছে যে কাজে সমান দক্ষতা প্রয়াস এবং দায়িত্ব প্রয়োজন হয়। সমবেতন আইনে বলা হয়েছে যে নিয়োগের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য হলে বা মহিলা কর্মীদের পুরুষ কর্মচারীর সমান বেতন না দিলে নিয়োগকারীর ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে। আরও বলা হয়েছে যে নিয়োগকারীকে কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত ওই জাতীয় প্রমাণপত্র রাখতে হবে। সমবেতন আইনে গঠিত কর্তৃপক্ষ যেকোন সময় সেসব প্রমাণপত্র চাইতে পারে এবং তা না দেখালে নিয়োগকারীর ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। তবে যেসব আইনে বা বিধি দ্বারা মহিলাদের স্বাস্থ্যহানির কাজে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে এই আইনের কোনো প্রয়োগ হবে না।

ধারা-৩৯ (ঙ) : অর্থনৈতিক প্রয়োজনে নারী ও পুরুষ শিশু শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, শক্তি, বয়স ও সামর্থের পক্ষে অনুপযুক্ত কোন কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না।

ধারা-৪০ ও ধারা ২৪৩ (ডি) ও ধারা ২৪৩ (টি) : সংবিধানের ৪০ নং ধারা অনুসারে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ২৪৩ (ডি) ও ২৪৩ (টি) অনুসারে যথাক্রমে পঞ্চায়েত ও

পৌরসভা গুলিতে এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ধারা-৪২ : ৪২ নং ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র কাজের জন্য ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক পরিবেশ সৃষ্টি করবে এবং মাতৃত্বকালীন অবস্থায় সবেতন ছুটির ব্যবস্থা করবে।

মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন ১৯৬১ ও সংশোধীত ২০১৬ : মাতৃত্বের বেনিফিট অ্যাক্ট আইন ২০১৬ এর সংস্কার অনুযায়ী মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় কাল আগের ১২ সপ্তাহের পরিবর্তে এখন ২৬ সপ্তাহ করা হয়েছে। জন্ম পূর্ববর্তীপ্রসবকালীন মাতৃত্ব ছুটির সময় সীমা ১২ সপ্তাহ ধার্য করা হয়েছে। দুই বা তার অধিক সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে এই মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় সীমা কম থাকে এক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় সীমা হয় ১২ সপ্তাহ এবং জন্ম পূর্ববর্তী প্রসবকালীন ছুটির সময়সীমা হয় ৬ সপ্তাহ। মাতৃত্বের বেনিফিট আইনের যোগ্য হতে হলে একজন মহিলাকে গত ১২ মাসের মধ্যে অন্তত কমপক্ষে ৮০ দিন ওই সংস্থায় কর্মরত অবস্থায় নিযুক্ত থাকতে হয়।

ভ্রূণের জন্ম পূর্ব লিঙ্গ নির্ধারণ (নিয়ন্ত্রণ ও অপব্যবহার নিবর্তন) সংশোধন সংক্রান্ত আইন-২০০২: মাতৃগর্ভে ভ্রূণের অবস্থা জানার প্রকৌশল বিজ্ঞান আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। এই প্রকৌশলের দ্বারা ভ্রূণের অস্বাভাবিক কোন অবস্থা শারীরিক বৃদ্ধি ও রোগ নির্ণয় যেমন সম্ভব হয় তেমনি ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় করা যায়। মাতৃগর্ভে সন্তান ছেলে না মেয়ে জন্মের অনেক আগেই তা জানা যায় কিন্তু পণপথা এবং অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কার এর জন্য আমাদের দেশে বহু মাতা-পিতা এখনো কন্যা সন্তান চান না। ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়ের কৌশল আবিষ্কারের ফলে দ্রুত গতিতে প্রচুর সংখ্যক পরীক্ষাগার হয়েছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য ১৯৯৪ সালে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করেছে।

লিঙ্গ নির্ধারণে বাধা : ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কোন গর্ভবতী মহিলাকে তার গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ নির্ণয়ের জন্য যে কোন প্রকার পরীক্ষা বে আইনি। যে সমস্ত আলট্রাসাউন্ড মেশিন যা রেজিস্টার নয় তা কোন ক্লিনিক বা ল্যাবরেটরিতে বা পরামর্শ কেন্দ্রের বিক্রি করা নিষিদ্ধ মূলক। ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় ছাড়া কোন দেশে যেমন ভ্রূণের রোগ বা শারীরিক কোনো অসংগতি নির্ণয়ের জন্য কোন পরীক্ষার বা কেন্দ্র খুলতে গেলে এই আইনে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। যেসব মহিলার বয়স ৩৫ বছরের বেশি তাদের উপর ভ্রূণ লিঙ্গ নির্ধারণের কৌশল প্রয়োগ করা যাবে না। এ আইন ভঙ্গ করলে তিন বছরের কারাদণ্ড ১০০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। অপরাধের তালিকায় আছেন— ডাক্তার প্রকৌশলী এবং তাদের সাহায্য করে এবং আবেদনকারী। গর্ভবতী মহিলা যদি স্বেচ্ছায় এ পরীক্ষা করতে আবেদন করেন তবে তিনিও অপরাধী। যিনি তাকে পরামর্শ দেবেন বা বাধ্য করবেন লিঙ্গ পরীক্ষা করতে তিনিও অপরাধী। গর্ভবতী মহিলা যদি প্রমাণ করতে পারেন পরীক্ষায়

তার সম্মতি ছিল না স্বামী শ্বশুর-শাশুড়ি বা অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাধ্য হয়ে তাঁকে সম্মতি দিতে হয়েছে, সেক্ষেত্রে তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা হবে না।

ধারা-৪৪ (UCC) : সকল নাগরিকদের জন্য এই একই প্রকার দেওয়ানি বিধি অনুপস্থিতির কারণে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন দ্বারা মহিলারা শোষিত ও বঞ্চিত হচ্ছে। এই কারণে সংবিধান প্রণেতাগণ ৪৪ নম্বর ধারাটি যুক্ত করেছেন। এই ধারায় বলা হয়েছে যে ভারতের সকল নাগরিকদের জন্য একই দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের চেষ্টা করবে। ১৯৯৫ সালে Sarala Mudgal Vs. Union of India Case মামলায় রায় দানের সময় সুপ্রিম কোর্ট এই অভিমত ব্যক্ত করে যে Uniform Civil Code প্রতিষ্ঠিত করতে সমগ্র রাজ্য গুলি কে এগিয়ে আসতে হবে।

ধারা-৫১ক-(৫) : সংবিধানের ৫২ক(৫) নং ধারা অনুযায়ী সকল ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য হলো নারীর মর্যাদা হানিকর সমস্ত আচরণ পরিহার করা অর্থাৎ এ ধারায় নৈতিক দিক থেকে নারীর মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনতাকেই তুলে ধরেছে।

উপসংহার : ভারতীয় সংবিধানে নারীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে তার সঙ্গে পার্লামেন্ট নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য একের পর এক আইন প্রণয়ন করে চলেছে। ভারতীয় দণ্ড সংহিতায় নারী সুরক্ষার বিধান রয়েছে। তবু আমাদের দেশে সংবাদপত্র টিভিতে নজর দিলেই নারী নির্যাতনের ঘটনা চোখে পড়ে। কর্মক্ষেত্রে বাসস্ট্যান্ডে বাসে-ট্রেনে মহিলাদের হেনস্থার শিকার নজর এড়িয়ে যায় না।

ভারতের সংবিধান ও পার্লামেন্ট প্রণীত আইনে নারীদের সুরক্ষার জন্য একাধিক ব্যবস্থা রয়েছে তা সত্ত্বেও নারীদের হেনস্থা, পুড়িয়ে মারার ঘটনা কমছে না। নারী নির্যাতনের ঘটনা যাতে কমে এবং দোষীরা যাতে উপযুক্ত কঠোর শাস্তি পায় তার জন্য ভারতীয় সংবিধানে বিশেষ অধিকার এর পাশাপাশি যেসব নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য আইন প্রণয়ন করেছে ও করছে সেগুলি আরও কঠোর হওয়া প্রয়োজন। তার সঙ্গে দোষী প্রমাণিত হওয়ার পর শাস্তি প্রদানের সময় দীর্ঘসূত্রতা যাতে না থাকে সেদিকেও আইন প্রণেতাদের নজর দেওয়া প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

1. Laxmikant, M (2016). Indian Polity (Fifth Edition): Chennai Mc Graw Hill Education (India) Private Limited.
2. Basu, Durga Das (1984). Introduction to The Constitution of India

(10th Edition) South Asia Books.
3. State of West Bengal Vs. Anawar Ali Case-1952.
4. Yousuf Abdula Azia Vs. State of Bombay Case-1954.
5. State of Ap Vs. P. B. Vijayakumar Case-1955.
6. Dowry Prohibition Act, 1961.
7. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.
8. Indian Penal Code (ipc) by S. N. Mishra (Central Low Agency) 2018.
9. The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act-2013.
10. Immortal Traffic Prevention Act, 1956.
11. Ranadhirshing Vs. Union of India Case-1982.
12. Equal Remuneration Act, 1978.
13. Maternity Benefit (Amendment) Act, 2016.
14. The Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention Misuse) Amendment Act, 2002.
15. Sarala Mudgal Vs. Union of India Case-1995.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 13. October, 2021

ঔপনিবেশিক আমলে কার্জনের শিক্ষানীতি ও বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত : বাঙালী মানসে প্রতিক্রিয়া

ড. শিবানী দে

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন কোন কিছুই ব্রিটিশ সরকারকে দমিত করতে পারেনি। ফলস্বরূপ এই শতাব্দীর অন্তিম পর্বে ভাবাদর্শগত প্রেক্ষাপট এবং বাস্তব রাজনৈতিক পটভূমি জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই এক বিরুদ্ধ ধারার উত্থানের ক্ষেত্র তৈরী করেছিল। ঠিক এই সময়ে ভারতে ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধি রূপে কার্জনের আবির্ভাব ঘটে। অসীম আত্মবিশ্বাস এবং নিজের তথা ব্রিটিশ শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অগাধ আস্থা তাঁর শাসনকালকে অন্যান্য বড়লাটদের তুলনায় বিতর্কিত করেছে। যে শিক্ষিত বাঙালী তথা ভারতীয় সমাজ ইংরেজ শাসন নীতির একদা সমর্থক ছিল, তাদের সঙ্গে দূরত্ব বৃদ্ধিতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। কার্জন বিশ্বাস করতেন, যে শাসননীতি ভারতে গ্রহণ করা হয়েছে তা ব্রিটেনের স্বার্থরক্ষার জন্য, ভারতীয়দের জন্য নয়।

সুতরাং এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর ধারক ও বাহক কার্জন যে দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার একটি হল শিক্ষা সংস্কার এবং অপরটি বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত। ১৯০১ সালে কার্জন সিমলায় একটি শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার সাধন। এই সম্মেলনের সমস্ত প্রতিনিধি ছিলেন ইউরোপীয়। এই সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের সূত্র স্থির করা হয়। এই উদ্দেশ্যে র‍্যালের সভাপতিত্বে একটি শিক্ষা কমিশন তৈরী করা হয়। এই কমিশনে একমাত্র ভারতীয় সদস্য ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯০৪ সালে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তিযুক্ত অভিমতও প্রকাশিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকের প্রারম্ভে

তাঁর সমাবর্তন বক্তৃতাগুলির মাধ্যমে লর্ড বেন্টিঙ্কের আমল থেকে প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষা পদ্ধতির অসংখ্য ত্রুটিগুলির প্রতি একদিকে যেমন সরকারের, অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সব ত্রুটি দূর করার জন্য তিনি যে সুপারিশগুলি করেছিলেন তার মধ্যে ছিল— মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ দানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, প্রযুক্তিবিদ্যার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন ইত্যাদি। ইতিমধ্যে র‍্যালে কমিশনের সুপারিশে সমস্ত দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজগুলি এবং আইন কলেজগুলি তুলে দেবার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালীর প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজগুলি ও আইন কলেজগুলি রক্ষা পায়। যদিও আবার নতুন আইন পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ইউরোপীয় আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হল। সিদ্ধান্ত হয় যে, সেনেটের ১০০ জন সদস্যের মধ্যে ৮০ জন হবেন ভাইসরয় কর্তৃক মনোনীত। ইউরোপীয় সদস্য সংখ্যা হবে ৫৪। সিন্ডিকেটের হাতে কলেজের স্বীকৃতি দান ও হরণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সবার ওপরে একজন ইংরেজ শিক্ষা অধিকর্তা নিযুক্ত হলেন। এই বিলের বিরোধিতা করে গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলেছিলেন— ''স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষায় বিস্তার যত দ্রুত সম্ভব করতে হবে আর চালু করতে হবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা জনগণের জন্যে।...সরকারের পক্ষে একথা ভাবা ঠিক নয় যে কলেজীয় শিক্ষা সর্বোচ্চ মানের না হলে তা অর্থহীন, এমনকি ক্ষতিকর এবং দ্বিতীয়ত, মননের ক্ষেত্রে আমাদের স্নাতকদের কৃতিত্বই হল শিক্ষার উপযোগিতা বিচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি।''

শিক্ষাবিদ ও দেশনেতাদের দৃষ্টিতে যেমন, তেমনই কবি ও সাহিত্যিকের ধ্যানধারণাতেও প্রতিফলিত হয়েছিল প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অসম্পূর্ণ রূপ। সেইসব অগ্রবর্তী চিন্তানায়কদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম, যিনি প্রায় একই সময়ে মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণের দাবী জানিয়েছিলেন। 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটির মধ্যে তদানীন্তন দেশপ্রেমিক বাঙালীর হৃদয়ের গভীর আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হয়েছিল। এই প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখছেন— (১) 'বাঙালীর ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই।' (২) 'এক তো ইংরেজী ভাষাটি অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস, পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোন প্রকার মিল নাই। তাহার পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয় প্রসঙ্গও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ আরম্ভ করতি হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়।'

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটি 'সাধনা' পত্রিকায় (১২৯৯ বঙ্গাব্দ) প্রকাশের পর সে

যুগের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁদের মতামত জানান। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'আপনার শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং যদিও তাহার আনুষঙ্গিক দুই একটি কথা (যথা, ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি অনাস্থার কারণ) আমার মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে না, তাহার প্রধান প্রধান কথাগুলি আমারও একান্ত মনের কথা এবং সময়ে সময়ে তাহা ব্যক্তও করিয়াছি'। সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন 'পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয়ে আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।' 'ডন' পত্রিকার সম্পাদকরূপে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৯৮ সালে বিদেশী শিক্ষা পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করে বললেন— এই শিক্ষা আমাদের খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করতে পারেনি, আত্মবিশ্বাসী, আত্মনির্ভরশীল, আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিক রূপে আমাদের তৈরী করতে পারেনি। ১৯০৪ সালে দেশের জনমতকে উপেক্ষা করে কার্জনের ঔদ্ধত্য বিশ্ববিদ্যালয় বিল অনুমোদন করিয়ে নেয়। বিল নিয়ে দেশের জনগণের আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে আসে। এই ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ দুঃখ পান। বঙ্গদর্শনে ১৩১১ সনের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত প্রবন্ধ 'য়ুনিভার্সিটি বিল' এ তিনি লেখেন 'দেশের বিচার দুর্মল্য, অন্ন দুর্মূল্য, শিক্ষাও যদি দুর্মূল্য হয়, তবে ধনী দরিদ্রের মধ্য নিদারুণ বিচ্ছেদ আমাদের দেশেও অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া উঠিবে। আমরা নিজেরা যাহা করিতে পারি তাহারই জন্য আমাদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে।— সর্বাপেক্ষা এই জন্যই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে— নিজেদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থাভার নিজেরা গ্রহণ করা।'

কার্জনের শাসনকালে শিক্ষিত সমাজের একটা অংশ যাদের সাথে রাজনীতির কোন সম্পর্ক ছিল না তাঁরাও রাজনৈতিক চেনতার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। এরকমই একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন 'বীরবল' শ্রী প্রমথ চৌধুরী। তাঁর এই রাজনীতির বৃত্তে ঢুকে পড়ার প্রসঙ্গে তিনি নিজেই জানিয়েছেন 'দেশে যখন কার্জনের উপদ্রব হয়, তখন সে উপদ্রবে— যাঁদের চোখ ও মুখ একসঙ্গে ফোটে— তাদের মধ্যে আমি ছিলুম একজন'। বাংলাদেশের রাজনীতি এই সময় আবেদন-নিবেদনের পথ ছেড়ে জাতীয় যুগের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। বীরবলের মন্তব্যে এই বক্তব্যটিই পরিস্ফুট হয়েছিল। তাঁর এই সময়কার দুটি লেখা— 'গর্জন-সরস্বতী সংবাদ' এবং 'গুলীখোরের আবেদনপত্র' যা প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকায়, ১৯০২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে। এই দুটি রচনার মাধ্যমে তিনি কার্জনের শাসনকালের একটি চিত্র তুলে ধরেছিলেন। বীরবল তাঁর নিজস্ব বঙ্গিতে কার্জনের শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁর 'গর্জন-সরস্বতী সংবাদ' নামক লেখায়। ১৯০১

সালে সিমলায় কার্জন এবং তাঁর আমলারা যে বৈঠকে বসেছিলেন, সেই বৈঠকে তাঁদের মূল্য লক্ষ্য ছিল শিক্ষার বিস্তার সীমিত করা কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন দেশে শিক্ষার বিস্তার যত ঘটেছে, ততই বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেনতা দানা বাধছে। এই নীতি রূপায়িত করতে যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করা হয়, ১৯০৪ সালে তার রিপোর্ট অবশ্য প্রকাশিত হবার আগেই জানাজানি হয়ে যায় এবং বীরবল এর ভিত্তিতেই লেখেন ‘গর্জন-সরস্বতী সংবাদ’। ‘গর্জন-সরস্বতী সংবাদ’ কথোপকথনের ভঙ্গীতে লেখা। দেশে সাধারণ শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে জনগণের সামগ্রিক চেতনার, মানোন্নয়নের সম্পর্ক কতটা, বীরবাল অসাধারণ দৃষ্টিতে সেই সময়েই তার স্বরূপটি যথাযথ ধরতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে ‘গুলীখোরের আবেদন’ কার্জনের শাসনকালের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ঘটনা ‘দিল্লী দরবার’ প্রসঙ্গে লেখা। এই দুটি রচনাতেই বীরবল চেয়েছিলেন কার্জনী জমানার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে, ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী সমাজের মোহভঙ্গ করতে।

রাজপ্রতিনিধি হিসাবে কার্জনের যে পদক্ষেপটি সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা হল বঙ্গভঙ্গ। নানা কারণে বাঙালীর মনে অসন্তোষ ঘনীভূত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে তা ফেটে পড়ে। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ও সেই সংক্রান্ত পদক্ষেপ বাংলা তথা ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করেছিল। বিপিন চন্দ্রের ভাষায়— ‘বাংলাদেশের অঙ্গচ্ছেদ ঘোষণা চরমপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং জাতীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত ঘটায়।’ ১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত অসংখ্য আবেদনপত্র, স্মারকলিপি জমা পড়েছিল। এছাড়া বক্তৃতা, জনসভা ও সংবাদপত্রেও এর বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কংগ্রেসের নরমপন্থী মনোভাবাপন্নরা ভেবেছিলেন, এর দ্বারা সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু অচিরেই বোঝা গেল সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেনি। জাতীয়তাবাদীরা অনুভব করলেন এর বিরুদ্ধে ভিন্নতর পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। শীঘ্রই মফঃস্বল শহরগুলিতে যথা— দিনাজপুর, পাবনা, ফরিদপুর, বরিশাল, বীরভূম প্রভৃতি জায়গায় বিদেশী দ্রব্য বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। কলকাতার টাউন হলে ১৯০৫-র ৭ আগস্ট স্বদেশি আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হল এবং এই সভাতেই বিলেতি দ্রব্য বয়কট করার প্রস্তাব গৃহীত হল। ঔপনিবেশিক সরকার ১ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করল যে, বঙ্গব্যবচ্ছেদ ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর কার্যকর হবে। ফলে সারা বাংলা জুড়ে প্রায় প্রতিদিনই প্রতিবাদ সভাগুলি অনুষ্ঠিত হতে থাকল।

ইংরেজ শাসকরা বঙ্গবিভাগের মধ্য দিয়ে বাঙালী মানসে জাতীয় ঐক্যের যে ধারা

বহমান বলে মনে করেছিল, তাকেই প্রারম্ভিক পর্যায়ে বিনাশ করতে চেয়েছিল। এটা সত্য যে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙালীর প্রতিক্রিয়া যদি শুধু বাঙালী ভদ্রলোক শ্রেণির মধ্যে আবদ্ধ থাকত, তাহলে তা ইতিহাসে এত গুরুত্ব পেত না। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী যে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, তার পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলন। এই প্রসঙ্গে এটাও বলা যায় যে স্বদেশী আন্দোলন বাঙালী মানসে প্রথম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের চেতনা জাগ্রত করে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে দেশে এমন কোন গণ-আন্দোলন ঘটেনি যা এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে পথ দেখাতে পারত। দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কাছেও এমন কোন পথ জানা ছিল না যে, বঙ্গভঙ্গ যেদিন থেকে কার্যকর হবে সেদিন কীভাবে প্রতিবাদ করা হবে। সেই দায়িত্বভার তুলে নিয়েছিলেন রাজনীতির বৃত্তের বাইরের দুজন ব্যক্তিত্ব— একজন রবীন্দ্রনাথ, অন্যজন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ইংরেজ সরকার যেদিন বঙ্গভঙ্গের কার্যকরী দিন ঘোষণা করেছিল তার আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতার কিছু জনসভায় ঐ দিনটিকে জাতি, ধর্ম, শ্রেণি, বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিবাদের দিন হিসাবে উদ্‌যাপন করে রাখিবন্ধন উৎসব পালনের ডাক দিয়েছিলেন। রাখিবন্ধন উৎসবকে রবীন্দ্রনাথ কেবল পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, নারী সমাজের প্রতিও তিনি একই আহ্বান জানিয়েছিলেন। বাঙালী মনীষা স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আরো দুটি রাজনৈতিক পন্থা এদেশে ব্যবহার করেছিল যার একটি হল বয়কট এবং অন্যটি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রবক্তা ছিলেন অরবিন্দ। স্বদেশী যুগে বাঙালীর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতাকে একটা বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে পরিচালনার জন্যই অরবিন্দ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ধারণা প্রচার করেছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের অভিঘাত বাঙলার রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যমোদী ব্যক্তিত্বকেও প্রভাবিত করেছিল। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কলকাতায় নাটক অভিনয়ের একটা ধারা গড়ে উঠেছিল। বহু প্রতিভাবান নট ও নাট্যকার তখন থেকেই নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। এরকমই একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন অমৃতলাল বসু। এই সময় শিক্ষিত বাঙালীর আচার আচরণে বিকাশমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে উদাসীনতা এবং সরকারের অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য লোভী মনোভাব অমৃতলালকে উদ্বিগ্ন করেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতেই অমৃতলাল কলকাতার নাট্যপ্রেমী সমাজের সামনে 'বাহবা বাতিক' প্রহসনের মাধ্যমে বাঙালী মানসিকতার স্বরূপ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ বাঙালী সমাজকে উপলক্ষ্য করে ১৯০৫ সালে অমৃতলাল লেখেন তাঁর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী রচনা 'সাবাস বাঙালী'। শুধু নাটক বা প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমেই নয়, বাগ্মী হিসাবেও অমৃতলাল অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অমৃতলাল আবেদন নিবেদনের রাজনীতিতে

আস্থা রাখেননি। বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য যে কোন পন্থায় তাঁর সমর্থন ছিল এবং তিনি বয়কটের একান্ত সমর্থক ছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে প্রতিবাদী কর্মসূচীতে সমগ্র জনতাকে সামিল করার দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়েছিল। এই কাজে সংগীতের ব্যবহার প্রথম শুরু হয়েছিল এই সময় থেকেই। এই সময়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানগুলি কেবলমাত্র সেই যুগের চিত্র প্রতিফলিত করেনি, এর পাশাপাশি সনাতন বাংলার একটা ধারণাও তুলে ধরেছিল। শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ নন, বাঙলার কবি ও সংগীতকাররাও তখন সামিল হয়েছিলেন স্বদেশী মন্ত্রে। স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে যাঁরা বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মুকুন্দ দাস, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রমুখ। স্বদেশী আন্দোলন বাঙালী মনীষায় যে অভিঘাত সৃষ্টি করে, প্রাক স্বাধীনতা পর্বে তার অবদান জাতীয় জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়েছিল।

তথ্যসূত্র

১. Chand, Tara; History of Freedom movement in India, Vols. 1-11, New Delhi, 1974.

২. Cronin, R.P; British Policy in Bengal, 1905-1912 : Partition and the New Province of Eastern Bengal and Assam, Calcutta, 1977.

৩. Desai, A.R; Social Background of Indian Nationalism, Bombay, 1966.

৪. Sarkar, S; Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908, New Delhi, 1973.

৫. Sarkar, S; Modern India, 1885-1947, New Delhi, 1983.

৬. Tripathi, A; The Extremist Challenenge, Calcutta, 1967

৭. অমলেশ ত্রিপাঠী : স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, ১৮৮৫-১৯৪৭, কলকাতা, ১৩৯৭ (বঙ্গাব্দ)।

৮. জ্যোতির্ময় ঘোষ : বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন এবং রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ২০০৫।

৯. বাসব সরকার : বঙ্গজীবনের দুই শতক বাঙালীর মনন ও অন্বেষণ, কলকাতা, ২০০৮।

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 13. October, 2021

A Suitable Boy : A Class Study in Secularism

Sk Mustafa Md N Ehsanul Hoque

Abstract : Vikram Seth in his A Suitable Boy depicts the India in transition during the early 1950s. The country was gradually settling after the turmoil of the Partition and the novel tries to capture this development. The novel takes as its theme communal harmony and communal tension between Hindus and Muslims. The tranquillity of apparent communal harmony is disturbed by events like the plan to construct a temple by the side of a disputed mosque, communal riot and towards the end a communal election campaigning. This paper tries to interpret the complex dynamics of communal harmony or lack of it among the masses and elite classes.

A Suitable Boy (1993) shows the two sides of Indian society in the early 1950s, in terms of religious belief- one is upper class secular society and lower class masses governed solely by their own religious teachings. The absence of secular thought among the lower class masses is reducing the effectiveness of the process that India has adopted- secularism from above. The case of the masses seems to show feeble grip secularism and its practitioners had over the world of the masses where religion was the only dominant currency. While it will also be wrong to assume that people belonging to the upper strata of the society exhibit more nuanced

understanding of religion and secularism of which the Raja of Marh and Mr Agarwal, the Home Minister of Purva Pradesh are prime examples in the novel. Their blind pursuit for fulfilment of personal interest threatens the secular fabric of the society they live in.

The novel dwells mainly on the upper classes of the society. Thus it gives a closer picture of this society. It shows that this society is divided between reckless self-interest for personal gain and standing firm for the ideal of secularism and countering all odds to defend and establish it. As far as the masses are concerned, the novel portrays a faint and distant picture. We get a close view of the masses only once when Maan, son of Mr Kapoor is banished from home and spends his exile with Rasheed at the latter's village. This brief interlude gives us a comprehensive picture of the interreligious interaction in Rasheed's village.

If we look at the upper strata of the society, we can see that the two families of the Muslim Nawab of Baitar and Mr Mahesh Kapoor, Hindu Minister have very smooth relationships. They are good friends. One has chosen politics as his career and while the Nawab has his zamindari. Thus the two friends are leading different sorts of lives and are connected by a strong bond of friendship. Their difference in religion does not impair their relationship but on the contrary their religious difference enriches their relation with both sides participating in each other's religious festivals and enjoying them. It cannot be said that they are irreligious; but their mind is not preoccupied exclusively by religious laws. They consider the Muslimness or Hinduness of the Nawab or the Minister as secondary and their being human as primary. Thus, they can interact with each other as human beings first. It is important to note that, because of their giving precedence to humanity over religion, these families are not afraid that their imaan or dharma will be corrupted if they mingle with people from other religions. This, the novel shows to be the most significant difference between religious practices of the masses and the enlightened upper classes.

Unlike these enlightened upper classes, the rural religious masses of Rasheed's village do not exhibit such order of preference. In their case, their religious believes restrict their human interaction- both intracommunal and intercommunal. This rural life offers us an important insight into the heteroglossia of religious discourses at the villages of Debaria and Sagal and into the question of communal harmony and cohabitation among the masses. On the one hand there are Rasheed's jeering neighbours, who are very disappointed to see Man, a Hindu, in Rasheed's company. On the other hand there is the perennially evasive Mr Football, who finds enjoyment in setting people against each other. Rasheed's Brahmin neighbourhood has a good interaction with their Muslim neighbours, especially those belonging to the upper strata. But they cannot eat with non-Brahmins. As far as communal harmony is concerned the novel describes that unlike other villages Debaria and Sagal "took pride in the fact that feuds within each of the two communities dominated any friction between the communities". (Seth 746)

Thus we can see that although it is enshrined in our Constitution that the State shall not discriminate on the basis of religion and implies that the citizens should endorse the same viewpoint, in reality it has a chequered career. We see that people are interacting with each other following their own local customs. Mr Agarwal, the Home Minister's personal animosity towards the Muslims nearly endangers the secular fabric of the society. The Raja of Marh's personal hatred for Muslims and his plan to construct a temple by the disputed mosque vitiates the communal harmony at the local level. Towards the end Waris reaps the benefit by communally polarizing the masses. In this particular context Dr Ambedkar's last speech to the constituent assembly draws our attention. He in his last speech expressed his concern for the constitutional equality in theory and the caste hierarchy and resulting social inequality in practice in the then India. One could express the same concern in similar vein regarding Constitutional

secularism on the one hand and the communal attitude of Indian society resulting from the deep rooted religious division and animosity among people belonging to different religious practices.

K N Panikkar to rings the same alarm, but unlike Ambedkar he refers directly to secularism. He writes in 2010 :

> "If secularism is to be a reality, therefore, it is not sufficient to have a secular state, there must also be a secular society. If the society is not secular the state is likely to depart from secular principles, as happened on several occasions during the past 60 years." (Panikkar)

The family of Mann, Imtiaz and enlightened Rasheed represent the secular society while the village surrounding of Rasheed and the angry mobs in Bharat Milaap and Muharram represent the lower class unenlightened people. People who belong to the upper strata as well as the lower strata practice religion but their attitudes towards religion are different. People who belong to the upper strata of the society may not be always religious they are at times indifferent to the religious practice of the religious clan they belong to. When they practice they can break down the philosophy of religion into small parts and can analyse them and comprehend their subtle nuances. While the understanding of religion among the comparatively less educated or enlightened masses the concept and practice of religion is very gross. Their belief is simple reward and punishment. They have in their mind some set of good deeds as well bad deeds which are to be rewarded and punished respectively in the after world.

The two families of Khans and Mahesh Kapoors offer us a study of the practice of secularism among the elite society. The two families are united by the bonds of old friendship, espousal of secular principles and philanthropy. But this literate elite society fails to control the communal escalation following the injury of Imtiaz in the hands of Mann after which

Waris agitates the people along communal lines in order to win the election. This event seems a replica of what Ashis Nandy realises :

> "The Indian meaning recognizes that even when a State is tolerant of religions, it need not lead to religious tolerance in a society. For, tolerance by the State cannot guarantee tolerance in the society. State tolerance may ensure, in the short run, the survival of a political community; in the long run the community must go beyond it." (Nandy 36)

If we compare the relationship between Hindus and Muslims in the town of Brahmpur and at villages of Debaria and Sagal we can observe that in the town there is no intercommunal interaction between these two communities except among the upper classes. The existence of a mosque believed to be built on the rubble of a temple and a fanatic attempt to construct a temple at the immediate west of the said mosque indicate that intercommunal relation between these two communities is strained. Communal flare up at the smallest pretext during the procession of Muharram and Bharat Milaap serves as a corroborating evidence of that strain.

In peaceful societies having a similar heterogeneous population there exists an 'institutionalised peace system' consisting of doctors, teachers, traders, business entrepreneurs, lawyers and 'at least some cadre-based political parties (different from the ones that have an interest in communal polarization)' (Varshney 11). In the town of Brahmpur we do not see any. In the villages of Debaria and Sagal, even though there exist religious hotheads and trouble makers, there is a hierarchy and the people at the top from both the communities share a harmonious intercommunal relationship. These people sitting on the highest ladder of the social hierarchy serve as the 'institutionalised peace system'.

The intercommunal relationship at the village can be termed 'everyday' forms of civic engagement where intercommunal communications is

confined within informal everyday interaction. Varshney argues that though it is valuable in itself, it does not form 'the bedrock for strong civic organisations'. This form of engagement is weaker than 'associational' forms of civic engagement where intercommunity communications through such forms of civic organisations like business organisation, literary club etc. serve 'economic, cultural, and social needs' of both the community. (Varshney 11). The intercommunal bonding at the village is strong but because of its limited scope fails to successfully cope with Waris's communal election campaigning and eventually succumbs to it.

A truly secular relationship among the individuals is the type of relationship when one can mix with peoples belonging to other religions without any kind of distrust. The family of Khans and that of Kapoors were able to secularise their relations; and the family of Kabir and the Chatterjees also had a secular outlook towards the world they lived in. Because these families could mingle with each other freely where they do not identify themselves as belonging to this religion or that. They identified themselves by their professions or designations like the Minister or the Nawab or the professor. While if we turn towards such persons like the fanatic maharaja who is determined on constructing a temple in the vicinity of a mosque(Alamgiri mosque in old Brahmpur) or towards the masses (some of them are educated), they largely identify themselves as belonging to a religion and have a sort of distrust towards people belonging to other religions.

Works Cited

Nandy, Ashis. "An Anti-secularist Manifesto." India International Centre Quarterly 22.1 (1995): 35-64. Document. 09 August 2020. <http://www.jstor.com/stable/23003710>.

Panikkar, K N. “Short on Secularism.” Frontline 26 February 2010. Webpage. 07 August 2020. <https://frontline.thehindu.com/cover-story/article30179306.ece>.

Seth, Vikram. A Suitable Boy. New Delhi: Aleph Book Company, 2014. Print.

Varshney, Ashutosh. Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India. USA: Yale University Press, 2002. Print.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 13. October, 2021

Role Of The Journal(Patham) In The Development Of Modern Santali Literature

Sasi Kanta Majhi

Introduction

Santali is a language in the Munda Sub Family of Austroasiatic language. It is spoken and introduced in India as well as in the sub-continental countries includes Nepal, Bangladesh, Myanmar etc. So, as far as itsexpansion is concerned there shall be no wrong to give Santali language the status of international language. In fact Santali language retains the foremost place and is the most advanced language among the languages of Austric. Eminent empiric and researcher Griarson has mentioned that on his composition Linguistic Survey of India

Background

The foundation of studies and composition of Santali language has been laid by the foreign missionaries, the names includes Rev. k. Phillips, Rev. E.L. Purley, Rev. l.o. Skrefrud, Rev. P.O. Bodding. C.R. Lapsas, the chief of Santali Literary Society has prepared the Standard Roman Font for the upliftment of Santali language and literature.

The trend of the development of Santali literature has been divided

into three stages.

A. Early Era/ColloquialLiterature (Har Avater) : TILL 1854 AD.

B. Eccleriast Era/Fiction literature(KherwalAvater) : 1855–1947 AD.

C. Modern Era/Present literature (Santar Avater) : 1947 -Till now.

Modern Literature And Magazine

'BhasaBahti Nadi Jaisa' means language like a river moves forward and advances continuously at a smooth pace. The path of the advancement of Santali language has reached the gateway of modernity through a long stream. And the element that has played the most significant role on waving their glorious path is the Magazine. As the Magazine had taken the vital role in the course of the development of Santali language, its contribution to Modern literary studies and it's prolongation was not negotiable.

Pre-Independence Era

Christian Missionaries proceed with publication of magazine with the publication of various books in front of religion propaganda. Rev. P.O. Bodding published a Magazine named HAR HAPAN REN PERA (April 1890) for the first time. In later times DHARWA(1890), PERAHOR (1922) and MARSAL TABON (1946) has been disclosed. Originally authored by the society religion and discipline from the far past, the author highlighted actual Santal life in their literature and composition. That is the Santal-centric literature developed.

Post-Independence Era

At the later stage of independence the Santali literature become completely free from the Biblical religious turmoil and started to flow in it's own way. Eminent literary activist and researcher Sadhu Ramchand Murmu, Pundit Raghu nathMurmr, Nayke Mangal Saren,Sarada Prasad Kisku, Daman Sahu Samir, Nathalion Murmu, Bhagabat Murmu express their apprehension

thought ideas and cognition through different journals and magazines the names of the journals to be mentioned at this stage of the development of modern Santali literature are as follows—

Har Sambad : In 1947, the government of Bihar published this journal in Dev Nagari script. Dr. Daman Sahu Samir was the editor. In the journal, the short story was first introduced in Santali Literature Hriday Narayan Mandol wrote "Bapurichlin" (Two Helpless).

Galmaraw : On 20th Oct'1956, the official Santali magazine Galmaraw was published in Bengali script in the official name Kothabarta. In 1966 it'sname is changed and renamed as PachimBangla. The editor was Dhirendra Nath Baskey, a renowned litterateur, researcher and historian. All the composition and essays of all the famous writers and litterateurs of India are published in this.

Melo, Ahla, Arang, Kherwal Arang : Apart from this, AHLA published from Tata College and edited by Prof. Digambar Hansda, MELO published from Dumka and edited by Narayan Saren ARANG edited Natholeyon Murmu in 1957, Poet Sarada Prasad Kisku published KHERWAL ARANG. In the development of modern literature, HARIAR SAKAM edited by Dr. Suhrid Kumar Bhoumik, plays an important role. In addition to songs, poems, articles, this magazine introduced the Translation Literature.

Sagen Sakam, Jug Jarpa : Apart from this SAGEN SAKAM (published fromMayurvang) SAR SAGEN, EVEN, JUG JARPA also plays significant. JUG JARPA was the first Santali magazine to be published in ALCHIKI front in 1967-68.

Susar Dahar, Samabani, Tentre : In the seventies, HAS- HASIL published from B JB college(Orissa), BHONJ DISOM from MDC college (Baripoda) SUSAR DAHAR by Sarada Prasad Kisku, SAMABANI edited by researcher Dilip Saren near the first Bengali and Santali bilingual journal.it can be mentioned here that, Mahadev Hansda's TENTRE aerated an unique instance in a qualitative way in the realm of Santali literature .

Khandrandh, Sili, Rimil, Sanghariya, Ahla, Subarnanakha : In the later 80s , the Santali literature gets it's new-borns, for the language movement and Alchiki script, all the santal intellectuals, litterateurs and writers, got inspired. Parimal Hembram, Sarada Prasad Kisku, Sudhir Mitra, Ruplal Hansda, Jodumoni Besra composed many periodicals includes TENTRE, KHANDROND, FAGUNKOYEL, SILI, RIMIL, RAYBAR, KUHU, DEBONTINGUN, SILALIPI, SANGHARIYA, AHLA, SUBARNANAKA, Etc. In this phase, Novels (bharTikin), Poembook (sipahi, jawla, jiwejharna), Romantic Composition (sarisenasebengar rase, sagai sore)Anubad Sahityo (Bilitbalat) has been published.

Harhapan,Poha,Evensakwa,Taras,Sarsagun,Raybar,Santargira : In the 90s, HARHAPON has been published from Orissa. Probably this is the first children literature. Besides Shiuli Hembram's POHA also an instance of children literature. In this time , the name of RIMIL magazine has been changed into EVEN SAKWA .Which is known as the milestone in Santali literature in the end of the decade , a tension in the creation of literature is seen, but in the 21st century it's awakened again. The magazine plays important role in modern literature includes TARAS, SANTAR GIRA, DISA, (RAHI), SAR SAGUN, KHERWAL, AKILetc and gets appreciation from Dr. Binay kumar Saren, Subrata Baske, Surendra Nath Hembram, Baske Ram Sundaram.

Recent Mordern Era : The Santali language emerged in Eight Schedule in the constitution foindia as a result the horoscope of santal literature near unveiled many school, college and university begins reading Santali. The young generation gets attracted towards Santali literature. BHABNA, FURGAL,(JHRGRAM), PANGA(karandi),SAGEN SAKAM (Dumka), SINGAR SAKWA (Dhanbad), SAOHET ARANG (Baripoda), LAR SAKOM (Jharkhand), SAOTA LAURIYA, AKIL, SAR,KULHI DURUP, MANTAR, TENTANG, SARJOM UMUL, (W.B) has been published to develop positively towards the advancement of Santali literature. Shyam C Tudu,

Suchitra Hansda, Anpa Mardi, Rani Murmu, Parimal Hansda, Ganes Marandi, Maino Tudu, Biplab Saren, Gurai Kisku, Sandip Kr. Hembram has been publishing their articles through their magazines. In which SRJOM UMUL Gets The honour of ISSN and achieved the acceptability of many researcher and professor . As the quality of current magazine for improved likewise it's expansion too.

Conclusion

The role of magazine or PATHAM in the overall progression of Santali language and literature is undeniable and obvious. Of course, we have to acknowledge this, that the number of the magazine is increased drastically but failed to cater reader's attention. But as the creator creates his creation, the litterateur continues to keep on the development of Santal language and literature through their writing in his untiring efforts. Not only presently, the journal, magazine and periodicals will be able to preserve their own contribution for the enhancement of Santali literature.

References

1. Santali SahityerItihas : Parimal Hembram (2007), Nirmal Book Agency, Kol- 09.
2. Santali Bhasa o SahityerItihas : Dhirendra Nath Baskey (June1999), Baskey Publication. Kol-40.
3. Santali Onolia Kowa Jiyon Katha : Edited By Malinda Hansda.
4. Brief History Of Santali Literature &Writers : Ezicheal Hembram.
5. Directory Of Santali Jurnals&Magazines : Edited By All India Santali Writers Association.
6. History Of Santali Literature : Prof. Sanatan Hansda.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 13. October, 2021

Cholera in Colonial Bankura : Experience in Nineteenth Century

Jagannath Dalal

Abstract

In 1817-21, the Indian subcontinent was ravaged by a series of epidemics. The First Cholera Pandemic was started from the Bengal Presidency. Throughout colonial period, Bengal was the most cholera affected area in the Indian subcontinent. From the very beginning of the nineteenth century, the British government of India anxious about the Cholera Epidemics and its consequences. In Bengal, the history of Cholera disease and its relation with the colonial governmentwas discussed by the many prominent historians of health and medicine. But in their narratives, they either discussed the whole country or a particular province. They seldom discussed the remote district-region but regional study did not get proper attention. For example,Bankura as discussed earlier a remote district of Bengal which was periodically ravaged by the cholera epidemic. Possibly, the first cholera epidemic of this district occurred in the second decade of the nineteenth century, but there was no further information about this epidemic. Later, from the period to 1865-66, 1868 and 1894-97 cholera epidemic ravaged this district, but in the remaining time cholera was present in a sporadic form all over the district.

This article examines the cholera epidemic in colonial Bankura. This

paper will also asses the social and political impact of cholera in this district.This paper will also examine the roll of colonial government to counter the cholera epidemic from this district. Last but the notleast there will be a short discussion about the role of local intelligentsia.

Key Words : Cholera, Bankura, Bengal, epidemic.

Introduction

The series of Cholera Pandemicstarted from the Bengal in nineteenth-century.[1] According to contemporary medical authority of the nineteenth centurybelieve that, Bengalwas home of all-deadly diseases and from this place, diseases were spread to other parts of India, South-Asian countries, andeven other partsofglobe.[2] From global perspective in nineteenth-century cholera epidemics spread all over the world.But before that cholera was there, but their span has been restricted by particular region.[3] The white man always blamed Indians for the outbreak of epidemic. According to Europeans the most destructive form of cholera was 'Asiatic cholera' or 'Bengal Cholera' which originated fromIndia.Cholera is an acute diarrhoeal illness caused by toxigenic strains of Vibrio Cholerae serogroups O1 and O139, has the potential to appear in an explosive outbreak, epidemic, and even pandemic. Cholera was not a new disease; the Indians were familiar with this disease from ancient times. In ancient Sanskrit text, it was mentioned as Sitanga or Vishuchikaand the outbreak of cholera was known as Murree or Mahamurree.[4] But, since the early days of the colonial government, cholera spread as an epidemic form and Bengal was the mostaffected province of India. It was said that cholera was endemic in the Gangetic delta of Bengal province.

Cholera in Bankura Region : Bankura was a westernmost district of the Bengal province, it was far from theGangetic delta of the most prevalent cholera zone of the East Bengal. The most of the part of this district was

situated in a dry area of the eastern part of theChota Nagpur Plateau and the soil was very porous, though the eastern part of this district was very low and slowly attached to the Gangetic delta. That is why a colonial ICS officer L.S.S. O'Malley said that Bankura is a 'connecting link' between the Chotanagpur plateau and the Gangetic valley.[5] In the early phase of the government reports show that the district was mostly healthy except some places of Bishnupur Sub-division,[6] but epidemic cholera was not unknown to the people of this district. The religious belief and the worship of cholera deity OlaiChandi or other forms of Chandi as a remover of all Rog-Mahamari were proof that the epidemic cholera was present here for a long century.[7] Also,the term 'Olaotha' used by local people as a slang proves that cholera existed here for a long time.Though there were no such literary or written pieces of evidence to support that claim.

The first written document of the cholera outbreak in the Bankura district was available in 1819. This year a letter was sent from the district magistrate A. J. Colvin to the Acting Superintendent of Police. In this letter, it was mentioned that the incident of Sati was very high in the years 1815, 1816, 1817, and 1818 respectively.He considered that the number of Sati was increased because of the prevalence of the Cholera outbreak.[8]But, further information about how many were attacked or how many were died in this outbreak was not available. At the same time, Bengal was also suffered from her first cholera epidemic, which started in 1817 at the Kumbh Mela of Jessore.[9]Gradually it became the first cholera pandemic.

Although some reportsshowed that Bankura was a more or less healthy district,[10] but W.W.Hunter, in his illustrious work '*The Statistical Account of Bengal*',argued that Cholera was nearly present in the District in a sporadic form, and occasionally broke out as an epidemic. In 1855 a severe outbreak of cholera occurred in this district but no record exists of the number of persons attacked, or the proportion of the deaths, except in the jail, where, out of 32 prisoners attacked18 prisoners died, or 6.44 percent,

of the daily average prison population.[11] In 1860 cholera again attacked in this District and also in the jail population and at that time 3.54 percent of the daily average strength of prisoners died. This time cholera outbreak was started from the 18th of May and continued its severity till the 1st July of 1860.[12] Again, in 1864, epidemic cholera makes its appearance in Bankura jail on the 30th of January and lasted till the 28th March. During the outbreak, 40 prisoners or 11.66 percent of the daily average jail population, were attacked, and 15 or 4.37 percent of the average daily number of prisoners died.[13] A continued statistical data (see table No. 1) shows that every year cholera attacked the jail prisoners and sometimes the mortality rate was very high.[14] It seems that the general inhabitants of the District and the police were also suffered severely from the disease and that the mortality rate was very high.

YEAR	TOTAL STRENGTH	TOTAL ADMISSION	DEATH
1862	367	2	0
1863	427	2	0
1864	395	42	16
1865	480	30	8
1866	622	7	3
1868	496	5	2
1874	234	2	2
1875	303	2	2
1876	300	1	1
1878	168	1	0
1879	285	1	1

Table No. 1: Table was compiledby me, H. W. Bellew, Cholera in India, 1862-1881: Bengal Province, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1884

The cholera outbreak of 1866 ravaged all over the district. The Bishnupur sub-division and Bishnupur town were the most affected area. The mortality from the disease was again very high.[15]The great famine of 1866 increases the cholera epidemic in this region. The price of the rice was very high throughout the year 1865. Generally, the price of the rice was 31/32 ser per rupee, but suddenly, in September 1865 it rose to 15 ser per rupee and in July/August of 1866, it became 8 ser per rupee. All these was indirectly help for spreading of cholera epidemic. At this time cholera broke out at Bishnupur and from the early days of March average death rate was 11 per day. The severity of the disease continued till October. Someone described this rigorous outbreak as "when the cholera burst out, the people of Bishanpur, paralysed by panic and poverty-stricken to such a degree that they could not pay the cost of burning their dead, threw down the corpses just outside the town."[16]At the end of 1868, an epidemic of fever took place in Sonamukhi and after the fever epidemic, disease cholera appeared from January 1869 and lasted here until February, resulting in 63 deaths in seven days.The disease also spreadin the town of Bankura and Bishnupur in Marchand December accordingly. It took 17 lives in three weeks in Bishnupur town.[17] Cholera also appeared in this district from 1882 to 1883 and this time cholera perished 1954 and 464 lives respectively. The disease was most severe in only the Sonamukhi town and Sonamukhi thana where 5.70 and 1.73 per 1000 population died.[18]In 1889, 1647 people died from this district in cholera and this time the mortality rate was increased from the previous year. In 1888, 4.56 percent people were attacked by cholera and it was increased by 0.21 percent in 1889. This year's average mortality rate in the Bankura district was 1.58 per thousand against the previous year of 0.98 per thousand.[19] The disease was not prevalent in the whole district in the same manner. The mortality rate was very high in the town of Sonamukhi, Bankura, and the rural area of Gangajalghatithana.Whereas the mortality rate was very high from the month of February to August(1889).

Area	Mortality Rate
Bankura (town)	4.41
Sonamukhi (town)	5.9
Bishnupur (town)	2.17
Gangajalghati	2.61
Simlapal	1.08

Table No. 2: Twenty-Second Annual Report or the Sanitary commissioner For Bengal Year 1889 (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1890), 18

Table no. 3 shows that cholera was almost present in Bankura throughout the year andsometimes it was very high.From 1870 to 1881 the average number of deaths per month was 32.79. This data shows that March and June were the most affected and it was most prevalent from February to July. The greatest number of deaths occurred in 1873 and most of the cases were from the month of February to July,and in 1879 most of the cases were only from June and July. But in 1881 most of the deaths came from the months August to December which was generally rare for the outbreak ofcholera disease. In 1877, 1878, 1879, and 1880 out of 5136 villages 32, 74, 265 and 111 villages were affected respectively by cholera.

1903 people were succumbed to death by cholera mostly in the month of March in 1892.It was 1.77 per 1000 in the total population where the previous five years' average death ratio was only 0.85 per 1000. That year highest mortality rate came from Bankura Town with 4.16 per 1000 and therest were from Bankura (Rural), Gangajalghati (Rural), Sonamukhi (Rural), and Sonamukhi (Town) 3.36, 3.24, 2.57 and 2.37 per 1000 respectively.[20] Another worst epidemic of cholera of this district occurred in 1897 when 3.30 people died per mille. According to Malley the main reason for this cholera epidemic was the bad supply of drinking water and the mal-practices of local people to use the same tanks as a source of drinking water and other common

YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL
1870	11	13	118	105	72	94	69	10	1	1	1	...	495
1871	4	19	8	4	1	...	...	...	...	1	1	...	38
1872	34	16	...	1	44	50	53	20	17	...	2	31	268
1873	27	184	276	177	141	37	84	60	9	...	...	...	995
1874	1	1	3	7	26	15	7	2	4	...	...	...	66
1875	...	8	7	...	...	1	25	35	1	1	10	7	93
1876	...	...	124	23	2	1	2	...	...	...	4	...	156
1877	19	44	37	12	4	...	2	1	...	42	6	...	167
1878	...	11	67	106	78	3	16	14	...	...	2	41	338
1879	4	4	1	5	49	430	247	59	5	2	9	26	841
1880	83	185	133	16	37	...	5	8	1	...	1	9	478
1881	10	11	27	25	10	2	67	168	134	39	141	154	788
AVG	16.08	41.33	66.75	40.08	38.66	52.75	48.08	31.41	14.33	7.16	14.75	22.33	393.58

Table No. 3: Table was compiled by me, H. W. Bellew, Cholera in India, 1862-1881: Bengal Province (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1884)

purposes.[21]In the year 1891-1901 population of Bankura increased to 46743 or 4.37 percent only, but among the three-municipal town- Bankura, Bishnupur, and Sonamukhi,the population weredecreased or a little increased. In Bankura and Bishnupur population was increased to 1994 and 900 respectively, wherein the population of Sonamukhi was decreased to 14.[22]It was believed that the population growth rate was very slow or decreased because of cholera epidemic of 1897 and the famine of 1987.

YEAR	MALE	FEMALE	TOTAL
1872	158	110	268
1873	520	475	995
1874	33	33	66
1875	62	33	95
1876	77	79	156
1877	85	82	167
1878	187	151	338
1879	448	393	841
1880	224	254	478
1881	391	397	788
AVERAGE	218.5	200.7	

Table No. 4. Table was compiled by me, H. W. Bellew, Cholera in India, 1862-1881: Bengal Province (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1884)

A previous study showed that in the Bankura district cholera was always present throughout the year in a sporadic form. Let us discussed the main reason behind the cholera disease in Bankura. According to one opinionthe reason of cholera outbreak lies within Bankura. Although other pointed out that seeds of cholera were not originated from this place but

bring it by the pilgrim. The medical officer in charge of the Districtopined that the disease was introduced by the pilgrims going to or returning from the Orissa shrine of Jagannath.[23] In 1860 a severe outbreak occurred in Bankura jail and this time the disease was introduced by some prisoners who stopped at Bankura on their way from Cuttack to Ranchi.[24]. From ancient times pilgrims used to go on pilgrimage on their foot. In the colonial period, this pilgrim route was always very contagious. There were two routes through the Bankura District in which pilgrims were travelled.One of those routes wasthe famous Pilgrim Road[25]and second-one was the Rani Ahalya Bai Road.[26]After Chaitanya Mahaprabhu's trip toNilachal the number of pilgrims from Bengal to Puri was increased overnight. At that timethere were many roads one could travel from Bengal to Puri.One of those was via Bankura. Despite being impassable the road was convenient to the pilgrim due to less expense.[27] The road from Raniganj to Bankura-Lalbazar via Hindu School was known as Pilgrim Road. The pilgrims coming from northern India entered through Ahalyabai Road and went away throughBadshahiFauji Road.[28]Some taverns were built for the pilgrims and traveller by some local people. Sri Shashanka Sekhar Bandopadhyaymentioned such a 'tavern' in his writings.He recalled theexistence of such an inn at his villageShanbanda. The pilgrims took shelter here on their way to and from Puri. The descendants of Nandakumar of Shanbanda Village bore all expenses of the pilgrims.[29]But those pilgrims were the silentcarriers of the germs of cholera[30].Dr. U. C. Mookerjee, Civil Medical Officer of Bankura, says that"Cholera does not appear to be endemic here, but is imported from other places and spread."[31]He also said that though the cholera was Imported from the other side, the scarcity of good drinking water and local insanitary condition helped it for proper growth which created a favourable environment for the cholera epidemic.

From the very beginning, the British government was very cautious about contagious diseases. Because there were so many chances of getting infected the Army- the main pillar of the empire. That is why the government

took active initiative to control such contagious diseases. They try to discover a medicine to cure this patient or vaccine to prevent this type of disease and finally they succeeded.[32] The governmenttook some preventive measures to control the proliferation of such contagious diseases. Contaminated water was the main source of the outbreak of cholera. So, the major responsibility of the government was to supply pure drinking water.From the very beginning of the nineteenth century, East India Company decided to dig wells for pure drinking water for the people of this district.The first well was dug out around the court premise of Bankura in 1807.[33] During the time of the district magistrate William Blaunt so many wells were dug out at the inns of Arra, Bankura, Ramsagar, and Jaypur respectively in 1815.[34] The existence of such a well was also found at the Shitla Thana area in 1849.[35] Even in Pre-British erathe evidence of wells were found at the Asthal's[36] of Belut-Gobindapur and Dakaisini. Apart from digging out wells the villagers also preserved their drinking water through tanks. The Mahanta's of IndasAsthal preserved a tank for the drinking water for the villagers.[37] Bankura Municipality took such initiatives to preserve water tanks likeLalbandh at Lalbazar Mahalla in 1877[38]andBanerjee Bandh andNabinduttaPukur in 1880[39] respectively for the preservation of pure drinking water for the local community.From the second half of the nineteenth-century quarantine or isolation system was introduced in the Bankura district and also inoculation was started. In 1868, inoculation was started in this district but it was not very much popular among the people of Bankura except Kuchiakol.[40] At the time of the cholera outbreak of 1882-83 district magistrate ordered to separate tanks for drinking or bathing; the excreta and vomit buried. He also ordered to isolate the cholera patient.[41]

Conclusion

Bankura was a remote district of the Bengal province. In the colonial period, most of the time Bankura faces famine or scarcity of food. People of this district were very poor. They could not afford healthy food or

sometimes minimum two times food for their daily survival. So, the physical health of the people of the district was very weak. During the entire colonial period, various deadly diseases such as cholera, smallpox, Malaria made great miserable to the life of the people of Bankura. Although the number of cholera cases in Bankura was less than that of Malaria or Leprosy, but its severity was no less. However, some parts of the district like Khatra Thana or Ranibandh Thana were almost completely cholera free. In Bankura, cholera was more prevail in those places which were closely connected with the Pilgrim Route. The impact of cholera is much less at Khatra or its adjoining areas, probably, because it was far from the Pilgrim Route. Although the colonial government took some necessary steps to prevent cholera attack in Bankura, but it was far from adequate. Most of the people of this district were deprived of pure drinking water. The government was much more concerned about the army and prison inmates than the general population of this district. So even, though a hospital was established in 1809 for the Army and prison inmates it took more 30 years to establish a Charitable Dispensary for the common people of Bankura.[42] Even, at the end of the nineteenth century there were only nine dispensaries all over the district in which two of them were available for treatment for indoor patient.[43] However, the native medical practitioner was also treated cholera patient in the Ayurvedic method of treatment[44] and for that reason Company recruited Kabiraj Ramchandra Sen in 1808 for treating the prison patient in Bankura jail.[45]Finally, Cholera was transmitted to Bankura mainly by the Pilgrims who came from outside and when Bengal-Nagpur Railway was started in 1903 the number of pilgrims were decreased day by day. Consequently, the prevalence of cholera in Bankura has been declining slowly since the beginning of the twentieth century.

Endnote

1. J. N. Hays,Epidemics, and Pandemics: Their Impacts on Human History (California: ABC Clio, 2005),p.193.

2. ArabindaSamanta, Rog RogiRastra: UnishShataker Bangla(Kolkata: Progressive Publishers, 2004), p.13
3. Prabhatkumar Mukhopadhyay, “Kolera: EktiRajnoitik Astra,” inKothaSopan, ed.SusmitaJoaddar Mukhopadhyay, (Kolkata: Sopan), p.79-99
4. ArabindaSamanta, Living with Epidemic in Colonial Bengal 1818-1945(Delhi: Manohar, 2017), p.55
5. L.S.S. O’Malley, Bengal District Gazetteers: Bankura(Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot, 1908), p.2
6. First Annual Report of the Sanitary Commissioner for Bengal for 1868(Calcutta: printed by Willam Jones, at the Alipore Jail Press, 1869), p.237
7. In Bankura Debi Mangal Chandihas been worshiped as the goddess of Cholera and also Small-pox. For Example- Ma Mangal Chandir Than, Maliara
8. Sukumar Sinha &Himadri Banerjee(ed), West Bengal District Records: Bankura District Letters Issued 1802-1869,(office of the Directorate of Census Operations, West Bengal, 1984), Letter No. 163
9. ArabindaSamanta, op. cit. p.56
10. First Annual Report of the Sanitary Commissioner for Bengal for 1868, p.237?
11. W. W. Hunter, Statistical Account of Bengal, vol-IV(Delhi: D.K. Publishing House, first Reprinted in India, 1973)
12. Ibid.
13. Ibid.
14. H. W. Bellew, Cholera in India, 1862-1881: Bengal Province(Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1884)
15. W. W. Hunter, op. cit.p.301
16. H. W. Bellew, op. cit. p.17
17. H. W. Bellew, op. cit. p.40
18. R. Lidderdale, Sixteenth Annual Report of the Sanitary Commissioner

for Bengal, 1883(Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1884), p.16

19. W. H. Gregg, Twenty-Second Annual Report or the Sanitary commissioner For Bengal Year 1880(Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1890) p.18
20. W. H. Gregg, Twenty-Fifth Annual Report of the Sanitary Commissioner for Bengal, Year 1892 (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1893), p.
21. L.S.S. O' Malley, op. cit. p.82
22. E. A. Gait, Census of India 1901 Vol. VIA(Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1902), p.10, 14
23. W. W. Hunter, op. cit.p.301
24. Ibid.
25. Bibek Jyoti Moitra, "BankurarPrachinkalerPathghat", Gautam De (ed), PashimRarhGabeshonaSamaiki, Tritiya Sankha, (Bankura: Paschim RarhItihas o SanskritiCharcha Kendra, 2005), p.36-41.
26. Rani Ahalyabai Holkar built this road for the pilgrim came from northern India approximately 1773-83, by this road the pilgrims came through the Patna-Purulia-Kenjekua-Chhatna and entered Bankura through Kankata. From Bankura, they travelled to puri by the BadshahiFauji Road.
27. Tapas Bandopadhyay, "SriChaitanynerPuriJatra Path", Shoptodina, vol.5 No.3, 27 October 2019 p.54-66
28. Bibek Jyoti Moitra, op. cit. p.36-41
29. Shashanka Sekhar Bandopadhyay, "SanbandaGrameritibritta", 1942, Reprint, Gautam De (ed) PashimRarhGabeshonaSamaiki, Tritiya Sankha, (Bankura: Paschim RarhItihas o SanskritiCharcha Kendra, 2005), p.45-59.
30. for detail, see, Saurabh Mishra, "Beyond the bounds of time? The Haj pilgrimage from the Indian subcontinent, 1865–1920," inThe Social History of Health and Medicine in Colonial India, ed.Biswamoy Pati and Mark Harrison,(London: Routledge, 2009) p.31-44; S A Boyle,

"Cholera, Colonialism, and Pilgrimage: Exploring Global/Local Exchange in the Central Egyptian Delta, 1848-1907,"Journal of World History, September 2015, Vol. 26, No. 3, pp. 581-604

31. Twenty-Fifth Annual Report of the Sanitary Commissioner for Bengal, Year 1892, p.19
32. for detail, see, David Arnold, "Cholera and Colonialism in British India," Past & Present, November, 1986, No.113, pp.118-151; Paolo Palladino, Michael Worboys, "Science and Imperialism," The University of Chicago Press on behalf of The History of Science Society, March 1993, Vol.84, No.1, pp.91-102.
33. Rathindramohan Chowdhury, Naya BankurarGorapattan O Bikas(Bankura: PashchimRarhItihas O SanskritiCharcha Kendra, 2007) p.147
34. Sukumar Sinha &Himadri Banerjee, op. cit. Letter No. 209.
35. Sukumar Sinha &Himadri Banerjee, op. cit., Letter No. 306.
36. Rathindramohan Chowdhury, Bankura Sandhan, (Kolkata: Iskra, 2008), p.9
37. Girindra Sekhar Chakraborti, Anusanga Bankura, December, 2002, p.39
38. Bankura Municipal Board Meeting Proceedings, 26th April 1877
39. Bankura Municipal Board Meeting Minutes, 9th April 1880
40. First Annual Report of the Sanitary Commissioner for Bengal for 1868, p.243.
41. Lidderdale, op. cit, p.16
42. L.S.S. O' Malley, op. cit. p.84
43. Ibid.
44. Interview of KabirajRamanuj Dasgupta,he is a prominent Ayurvedic Medical practitioner of Bankura. Hisgrandfather (also his ancestor) used to treat cholera patient.
45. Rathindramohan Chowdhury, 2007 p.123.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 13. October, 2021

IBX- A Versatile Oxidizing Agent in Multicomponent Reactions

Dr. Kalyan Senapati

Abstract

IBX— A versatile oxidizing agent has experienced an unprecedented development in all aspects in the last couple of decades. Due to environmentally benign attributes, ready availability and nontoxic nature of IBX the synthetic transformation using IBX is very hot area of research. Apart from all other synthetic transformations IBX mediated Multicomponent reactions are also developed.

Introduction

The pentavalent iodine compound namely *o*-iodoxybenzoic acid, popularly known as IBX, has assumed significant prominence as a fantastic oxidation reagent since last couple of decayed.[1] In the year 1893, for the first time Meyer and Hartmann prepared IBX from *o*-iodobenzoic acid.[2] Inspite of the fact that Meyer and Hartmann synthesized IBX over one hundred years ago, its potentials in synthetic organic transformations remained unknown until 1994.[3] In 1983, Dess and Martin transformed IBX to triacetoxy benziodoxole by heating it with Ac_2O at 80 °C and discovered that the resultant triacetate, now popularly known as Dess Martin

Periodinane (DMP), which is soluble in common organic solvent is a very mild reagent for the oxidation of alcohols to the respective carbonyl compounds (Scheme 1).[4]

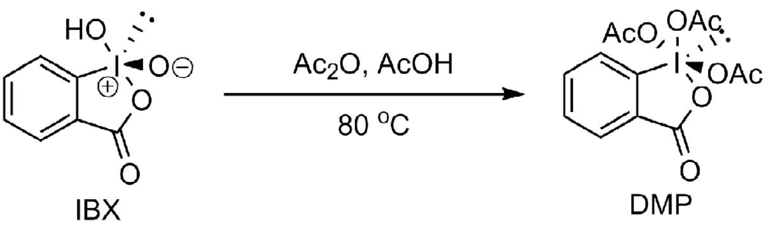

Scheme 1: Preparation of DMP

The insolubility of IBX in common organic solvents was considered as only obstacle for conducting reactions. The turning point in the history of IBX is the discovery of the fact that IBX is nicely soluble in DMSO, and that it has potential to oxidize a variety of alcohols.[5]

Preparation of IBX

In general, IBX can be prepared from *o*-iodobenzoic acid by using oxidant $KBrO_3$ in 2M H_2SO_4 at 60-65 °C temperature (Scheme 2).[6] In the reaction, *o*-iodobenzoic acid first transformed to o-iodosobenzoic acid (IBA), a trivalent iodine compound, which on further oxidation gives IBX in good yield. The main disadvantage of this procedure is the purity of obtained IBX is only 93-95%. In 1999, Santagostino *et al.* developed a new process for the preparation of IBX from *o*-iodobenzoic acid by using oxone ($2KHSO_5{\cdot}KHSO_4{\cdot}K_2SO_4$) as oxidant in water at 70 °C temperature (Scheme 2).[7] The main advantage of this procedure is the purity of IBX, which is more than 99%. The only disadvantage of this procedure is the yield of *o*-iodoxybenzoic acid is 79-81%.

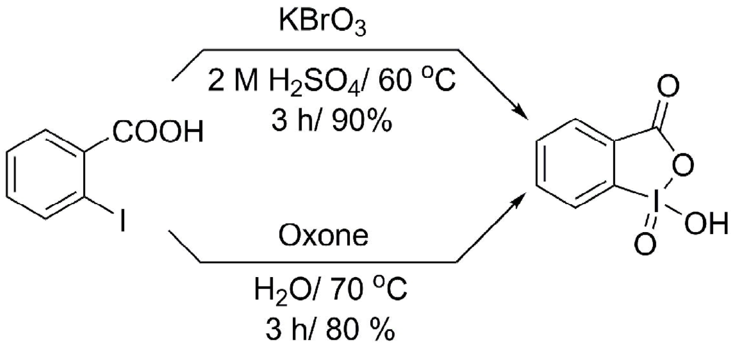

Scheme 2: Preparation of IBX using $KBrO_3$ and Oxone

Synthetic applications of IBX in Multicomponent Reactions

In 2006, Zhu *et al.* demonstrated IBX-mediated multicomponent Passerini reactions (Scheme 3).[8] They effectively demonstrated the utility of such process by taking alcohol as a reaction partner in cases where the corresponding aldehyde is unstable. The possibility of performing these multicomponent reactions (MCRs) with an alcohol instead of aldehyde broadens the scope and versatility of these reactions. They also showed that THF is the best solvent in compared to other solvents like DCM, Diethyl ether, Toluene, DCE, Ethyl acetate and MeCN. They performed the reaction with a variety of alcohols at slightly elevated temperature that is 40 °C due to poor solubility of IBX in common organic solvents.

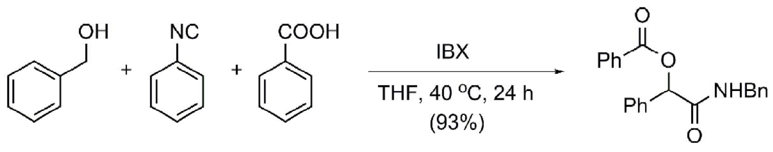

Scheme 3: IBX-Mediated Passerine reaction

Zhu *et al.* later documented IBX-mediated oxidative Ugi-type reaction involving dual acylation of the nitrogen and α-carbon center of tetrahydroisoquinoline by a carboxylic acid and an isocyanide (Scheme 4).[9] In this reaction, electrophilic iminium species is generated by in situ oxidation of a secondary amine using IBX. On solvent screening of the this reaction they showed that at 60 °C temperature THF is the best solvent for this reaction in compare to other common organic solvents like toluene, MeCN, DMF, DCM, diethyl ether, etc.

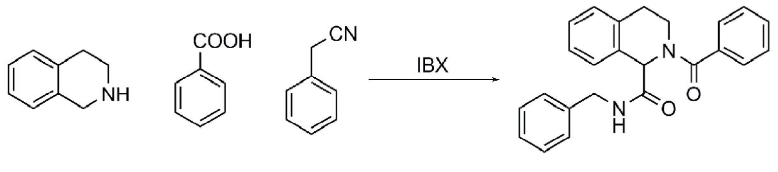

Scheme 4: IBX-Mediated Ugi-type reaction

Further, Zhu et al. reported novel IBX- promoted oxidative Strecker reaction that affords α-iminonitrile in MeCN at ambient temperature (Scheme 5).[10] The reaction occurs sluggishly in absence of additive tetrabutylammonium halide (TBAH). Tetrabutylammonium bromide (TBAB) and Tetrabutylammonium chloride (TBAC) showed the best as well as almost similar efficiency as additive in compare to Tetrabutylammonium Iodide (TBAI).

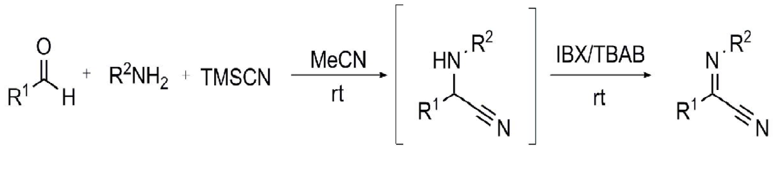

Scheme 5: IBX-Mediated Strecker Reaction

Later Zhu et al. developed IBX–mediated protocol for the preparation of polysubstituted 2-amino-5-cyanopyrroles from α,β-unsaturated

aldehyde in moderate to good yields.[11] The α,β-unsaturated aldehydes in the presence of TMSCN, TBAB and primary alkyl amine undergo oxidize by IBX to give α,β-unsaturated imidoyl cyanide, which undergoes [4+1] cycloaddition reaction with isocyanides in the presence of a catalytic amount of $AlCl_3$ at 90 °C in toluene to yield polysubstituted 2-amino-5-cyanopyrroles, Scheme 6.

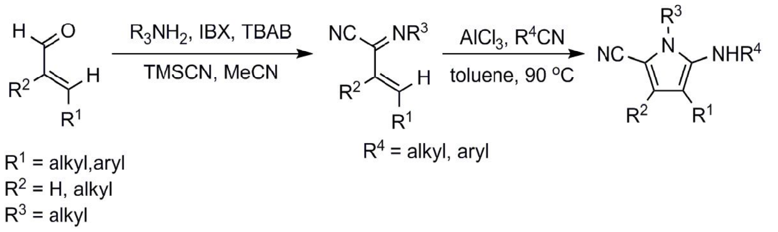

Scheme 6: IBX–mediated protocol for the preparation polysubstituted 2-amino-5-cyanopyrroles

A simple and effective method for the one pot Ugi four component reaction was reported by Zhu *et al.* in 2013.[12] In this multi component reaction Zhu *et al.* used IBX in stoichiometric amount to oxidize various primary alcohols at 70 °C in acetonitile. The produced aldehydes directly engage in reaction with amine, isocyanate and carboxylic acid to afford α-acetamidoamides in good to excellent yield at room temperature (Scheme 7).

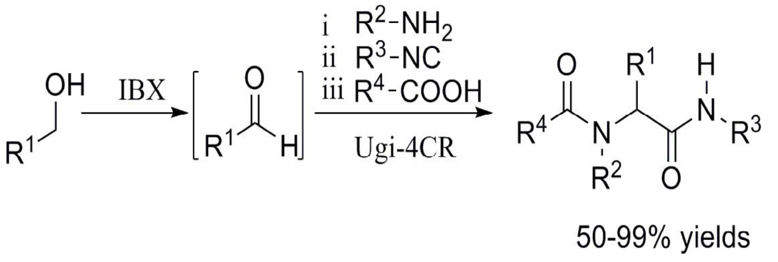

Scheme 7: IBX-Mediated Ugi- reaction

Conclusions

Despite of the fact that IBX is explosive in nature it is highly versatile oxidizing agent in organic synthesis. It's environmentally benign attributes and mild oxidizing nature gives us the opportunity to use IBX in different selective and sensitive organic reactions like multicomponent reations. Due to the discovery of various application of IBX in organic synthesis its importance is increasing day by day.

References

1. Zhdankin, V. V.; Stang, P. J. *Chem. Rev.* **2008**, *108*, 5299.
2. Hartmann,C.; Meyer, V. *Chem. Ber.* **1893**, *26*, 1727.
3. Frigerio, M.; Santagostino, M. *Tetrahedron Lett.* **1994**, *35*, 8019.
4. Boeckman, R. K., Jr.; Shao, P.; Mullins, J. *J. Org. Synth. 77*, 141.
5. Frigerio, M.; Santagostino, M.; Sputore, S.; Palminaso, G. *J. Org. Chem.* **1995**, *60*, 7272.
6. Boeckman, R. K., Jr.; Shao, P.; Mullins, J. J. *Org. Synth. 77*, 141.
7. Frigerio, M.; Santagostino, M.; Sputore, S. *J. Org. Chem.* **1999**, *64*, 4537.
8. Ngouansavanh, T.; Zhu, J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2006**, *45*, 3495.
9. Ngouansavanh, T.; Zhu, J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2007**, *46*, 5775.
10. Fontaine, P.; Chiaroni, A.; Masson, G.; Zhu, *J. Org. Lett.* **2008**, *10*, 1509.
11. Fontaine, P.; Masson, G.; Zhu, *J. Org. Lett.* **2009**, *11*, 1555.
12. Drouet, F.; Masson, G.; Zhu, *J. Org. Lett.* **2013**, *15*, 2854.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 13. October, 2021

Three Generations of Environmental Issues

Mozahid Ansary

Nowadays environmental problems are not a country or regional issue , become a global issue in the world. every country's survive of this issues in the world and these problems are continuously increased by day to life .Environmental issues are harmful effects of human activity as well as biophysical environment ; these are includes both biological and physical aspect of the environment such as air pollution, water pollution, natural pollution, garbage pollution etc. Another environmental issues means as problem with the planets system (air, water, soil etc.) that have developed as a result of human interference or mistreatment of the planet. So environmental issues arise out of the actual apprehended deterioration and degradation of environment traceable to activities by human beings.

Today's many environmental issues to be found by various ways and most of the issues are very critical. According to environmental thinkers, These environmental issues are divided into three generations categories—

1. First Generations Environmental Issues, (after 1900s-1965s)
2. Seccond Generations Environmental Issues, (1965s-1975s)
3. Third Generations Environmental Issues, (late 1975s- present)

There are collectively called of“ThreeGenerations of EnvironmentalIssues (3GEI)”.

First Generations of Environmental Issues

The first generation of environmental issues are primarilyfocusses on the conversations & preservation of nature, species and habitats. First generation environmentalists clearly identified the problems and defined the goal we must reach-a stable climate, greatly increased resource efficiency, sustainable management of biological resources, reduced exposure to dangerous chemicals radioactivity. This environmental issues to be found in the late 19th century to 1965. In thisperiod major environmental issues are- protection of wildlife, habitation, soil erosion, local plantation etc.

Second Generations of Environmental Issues

Second generations of environmental issues widened that focus to include pollution and natural resources, it was concern grew over global threatsand impact on human life or environment .These environmental issues emerged in 1965s to 1975s, but this time table have some controversy. Because some thinkers mention the 2nd generation environmental issues time are 1965s to 1970s,andsome thinkers told the 2nd generation environmental issues time 1965s to 1975s. 2nd generation environmentalists clearly identified the issues such as population growth, technology, land degradation, ocean acidification,desertification, climate change crisis of natural resources etc.

Third Generations of Environmental Issues

Third generations of Environmental issues emerged in late 1975s and it to be found till now. Third generations of environmental issues focusses on

the global environmental issues and priority to engage knowledge and awareness to result of environmental problems. These generations environmentalists to be found within the existing matrices of power and influence. Third generation issues set up an agenda -stabilizing the climate, halting the collapse of ecosystems, building sustainable communities, meeting of long term, need water, energy food, health etc. In this period environmental issues are types of universal.This time major issues are acid rain, ozone depletion, climate change, loss of biodiversity, increased of sea level water, increased of super cyclone, toxic chemicals pollution and cross-border transfer of dengerous waste, genetically modified human organs, resources depletion etc. Third generations environmental Issues as a result serious New environmental problems have emerged on a global scale.

'Three Generations of Environmental Issues' conceptis a good way to understanding of environmental problems and analyze of environmental issues. This concept discuss the every time of environmental problems, issues and negative impact on human life and environment, But not only discuss these concept try to get solutions from these problems. So environmental issues Play a decisive role in determining the scope and content of environmental law,and indeed the substance and direction of environmental policy.At present, a careful solution of this issue emerged by green political ideology in 1993. So this green political ideology tries to focus on reconceptualization of anthropocentrism to human beings. Finally I said environmental issues are very dangerous for our future generations.

References

1. Dobson, A(2007).Green political Thought: Routledge.
2. Kapur K(2016). Natural resourcesand environmental issues: Jecosys ecograph(vol-6)new dehli.

3. Hill, G (1973).2nd Generations environmental issues:New York Times.
4. Romano, U& Garbassi, F(2000).The Environmental Issues -A Challenge for new generation polyoletins:norava research center, Italy.
5. Thanasekaran, K D(2013). Environmental Issues :Anna University Chennai.
6. http://ndl.iitkgp.ac.in
7. Carson, R(1962).silent spring: Houghton Mifflin, United States.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 13. October, 2021

Relevance Of Swami Vivekananda In Education

Dr. Manas Kumar Das

Abstract

Education, in the opinion of Swamiji, remains incomplete until and unless we teach aesthetics or fine arts. He has given example of Japan and points out how the collaboration of art and utility can make a country and its people great. To be religious, in his opinion, means to lead life in such a way that enables us to manifest our higher nature, truth, goodness and beauty, in our thoughts, in our speeches, thoughts and acts. All emotions, feelings, thoughts and actions which take one towards this goal are naturally noble and harmonious, and are ethical and moral in the true sense of the term. He opines, we need, apart from technical education, all the other essential things which may develop industries, making men, earn enough for their survival, and save something for critical situations instead of seeking jobs. He feels the necessity of India's taking all that are good from the western nations for the betterment of its civilization. The whole educational program should be planned in such a way that it makes the youth to contribute to the materialistic prosperity of the country as well as to maintain the supreme value of India's spiritual heritage.

Key Words : Education, Ramakrishna Mission, Religion, Ethics

Introduction

Swami Vivekananda was a great thinker as well as a social reformer of India. He was a prolific orator and writer not only in English as well as in Bengali. Vivekananda was a singer cum bard, who composed a large number of songs and poems including that of Kali the Mother, his favourite. He was born in a very rich family in Kolkata on 12 January in the year 1863. Prior to his monastic life his name was Narendra Nath Datta. Vishwanath Datta, Vivekananda's father, was a renowned and successful attorney and Bhuvaneshwari Devi, his mother, was a lady with deep devotion, strong character and had many virtuous qualities. Vivekananda completed his graduation from Calcutta University and gained vast knowledge in different subjects, especially in Western philosophy and history. He delivered a series of lectures in places of India, and it created a great stir throughout the country. Through his inspiring and highly significant lectures he attempted :

- to rouse the religious consciousness of the people and imbibe in them pride in their cultural heritage;
- to bring about unity in Hinduism by citing the common bases of its sects;

In June 1899 he made his second visit to the West and he stayed most of his time in the Western coast of the USA. After delivering a number lectures in the USA, he came back to Belur Math in December 1900. The remaining part of his life was spent by him in India, by inspiring and guiding monastic as well as laymen. Ceaseless work, especially in delivering lectures and inspiring people his health decayed and his life came to an end quietly on the night of 4 July 1902. Before his Mahasamadhi he had written to a Western follower: "It may be that I shall find it good to get outside my body, to cast it off like a worn out garment. But I shall not cease to work. I shall inspire men everywhere until the whole world shall know that it is one with God.

Association With Sri Ramakrishna

Doubts about the existence of God assailed Narendra. One of his English professors at college told him first about Ramkrishna in November 1881. He paid a visit to the Kali Temple in Dakshineshwar to meet Ramkrishna who had been staying there. Straightaway he asked the Master a question "Sir, have you seen God?" which he put many others but had not got a satisfactory answer. Sri Ramakrishna's unhesitating reply to this question was: "Yes, I have. I see Him as clearly as I see you, only in a much intenser sense." Sri Ramakrishna not only removed doubts from Narendra's mind but also won him over through his pure, unselfish love. Thereafter, Narendra used to pay frequent visit to Dakshineshwar and, under the genial guidance of the Master, he moved rapidly on the spiritual path. There, Narendra got an opportunity to meet several young devotees of Sri Ramakrishna, and all of them became close friends .Diagnosis on Sri Ramakrishna reported him cancer of the throat. On realizing this fact Sri Ramkrishna gave up his mortal body on 16 August 1886. After the demise of the master Sri Ramkrishna, fifteen of his young devotees began to live together in a derelict building at Baranagar in North Kolkata. A new monastic brotherhood was formed under the leadership of Narendra. In 1887 they took the formal oaths of sannyasa, thereby taking new names. Thereafter, Narendra became Swami Vivekananda. Swamiji, however, wished to have an inner certitude and divine call in respect to his mission. He got both of these while he sat in deep meditation on the rock-island at Kanyakumari. After founding the new monastic order, Vivekananda listened to the inner call for a greater mission in his life. Vivekananda realized the crisis mankind had been passing through.

Foundation Of Ramakrishna Mission And Belur Math

After his coming back to Kolkata, Swami Vivekananda undertook another important task of his mission on earth. He founded on 1 May 1897

Ramakrishna Mission, a unique organisation in which monks as well as lay people would jointly undertake propagation of Practical Vedanta, and numerous social services, such as running hospitals, schools, colleges, hostels, rural development centre's etc, and conducting massive relief and rehabilitation work for victims of natural hazards and other calamities, in different parts of India and abroad. In early 1898 Swami Vivekananda acquired a large plot of land on the western bank of the Ganga at a place called Belur to have a permanent dwelling place for the monastic Order originally started at Baranagar, and got it registered as Ramakrishna Math after a couple of years. Here he founded a new, universal pattern of monastic life which adapts ancient monastic ideals to the conditions of modern life, which gives equal importance to personal enlightenment and social service, and which is open to all men without any distinction of religion, race or caste.

Discovery Of Real India

Swami Vivekanand was the pioneer religious leader in India to realise and openly declare that the true reason of India's downfall was paying not due importance to the masses. The immediate demand was to give food and other basic necessities of life to the hungry masses. For this they should be made aware of improved methods of agriculture, village industries, etc. Owing to centuries of oppression, the masses that were lagged behind had lost faith in their capacity to improve their fortune. It was first of all necessaries to bring back into their minds their lost faith. For this they desperately needed a life-giving, inspiring message. Swamiji found this message in the rules of the Atman, the doctrine of the potent divinity of the soul, taught in Vedanta, the ancient system of religious philosophy of India. He noticed that, in spite of poverty, the masses drawn to religion, but they had never been taught the life-giving, ennobling principles of Vedanta and how to practice them in real life.

Vivekananda's Contributions To World Culture

Making an objective assessment of Swami Vivekananda s contributions to world culture, the renowned British historian A L Basham stated that "in centuries to come, he will be remembered as one of the main moulders of the modern world". His contributions to the modern world are mentioned below:

- **Meaning of Religion :** Most important contributions of Swami Vivekananda to the modern world is his illustration of religion as a universal experience of transcendent Reality, common to all human being. He opined that religion is as scientific as science itself. Religion and science are not antithetical to each other but are complementary. This universal conception frees religion from the shackles of superstitions, dogmatism, and intolerance, and makes religion the highest and noblest pursuit – the pursuit of absolute Freedom, absolute Knowledge, and absolute Happiness.
- **View of Man :** In the view of swamiji the present age propagates that man should be the main concern and centre of all activities and thinking. With the help of science and technology man has attained great progress and power, and modern modes and means of communication and travel have changed human society into a „global village . But the degradation of man has also been continuing at a reasonable pace, as noticed by the huge increase in broken homes, immorality, violence, crime, etc. in modern society.

Swamiji has taught Indians how to master Western science and technology and develop spiritually simultaneously. He has also taught Indians how to adapt Western humanism to Indian ethos

Important Teachings Of Swami Vivekananda

Vivekananda was a great philosopher and a great social reformer. The important teachings of Vivekananda include that;

- Education is the manifestation of the perfection already in man.
- We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet.
- So long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor who, having been educated at their expense pays not the least heed to them.
- My ideal, indeed, can be put into a few words, and that is: to preach unto mankind their divinity and how to make it manifest in every movement of life.
- Whatever you think, that you will be.
- If you think yourselves weak, weak you will be; if you think yourselves strong, strong you will be.

The first governor general of independent India, Chakravarti Rajagopalachari, said "Vivekananda saved Hinduism, saved India." According to Subhas Chandra Bose, a major proponent of armed struggle for Indian independence, Vivekananda was "the maker of modern India". Many years after Vivekananda's death, Rabindranath Tagore told the French Nobel Laureate Romain Rolland, "If you want to know India, study Vivekananda. In him everything is positive and nothing negative." Rolland himself wrote that "His words are great music, phrases in the style of Beethoven, stirring rhythms like the march of Handel choruses.

Meaning Of Education

Vivekananda points out that the drawback of the present-day education system is that it has no definite goal to pursue. Sculptors have a definite and clear idea about what he wants to shape out of the marble block;

similarly, painter know what they are going to paint. But a teacher, he says, has no definite and clear idea about the goal of his teaching. Swamiji attempts to establish, through his words and works, that the goal of all education is man making. He forms the scheme of this man-making education in the light of his philosophy of Vedanta. He defines education as "the manifestation of the perfection already in man." The aim of education is to manifest in our lives the perfection, which is the innate nature of our inner self. This perfection is the realization of the power which is infinite and resides in everything and every-where-existence, consciousness and bliss. After understanding the necessity of the nature of this perfection, we should identify it with our inner selves. For reaching this goal, one will have to get rid of one's ego, ignorance and all other false identification, which come in the way. Meditation, built by moral purity and passion for truth, helps man to leave behind the body, the senses, the ego and all other non-self elements, which are perishable. Vivekananda puts great emphasis on physical health because a sound mind dwells in a sound body.

Method Of Teaching

Vivekanand was of the view that knowledge is inherent in every man's soul. What we mean when we say that a man knows is only what he discovers by taking the cover off his own soul. At the same time he draws our attention to the fact that the duty of the teacher is only to help the child manifest its knowledge by removing the barriers in its way. In his words: "Thus Vedanta says that within man is all knowledge even in a boy it is so and it requires only an awakening and that much is the work of a teacher. Vivekananda's method of education is almost similar to the heuristic method of the modern educationists. In this system, the teacher invokes the spirit of inquisitiveness in the pupil who is supposed to find out things for himself under the unbiased guidance of the teacher. He puts too

much emphasis on the environment at home and school for the proper growth and development of child. The parents as well as the teachers should inspire the child by the way they live their lives.

curriculum

According to Vivekanand, the cultural values of the country should form an integral part of the curriculum of education. The culture of India has its basis on her spiritual values. He, in his scheme of education, meticulously includes all those studies, which are indispensible for the all-around development of the body, mind and soul of man. These studies can be brought under the broad heads of physical culture, aesthetics, classics, language, religion, science and technology.

Conclusion

He realizes that it is only through education that the upliftment of masses is possible. Education brings to light its constructive, practical and comprehensive character. He states it emphatically that if society is to be reformed, education has to reach to everyone-high as well as low, because individuals are the very constituents of society. The sense of dignity rises in man when he becomes conscious of his inner spirit, and that is the very purpose of education. He strives to harmonize the traditional values of India with the new values brought through the progress of science and technology. It is in the transformation of man through moral and spiritual education that he finds the solution for all social evils.

References

Acharya, R (1986). India, Review of National Policy on Education. A Perspective paper on Education. New Delhi.

Aggarwal, J. C. (1985). Theory and Principles of Education. New Delhi: Vikas Publishing House.

Aggarwal, J. C. (1997). Theory & Principles of Education. New Delhi: Vikas publishing House.

Avinashilingam.(1967). Education. Coimbatore: Ramakrishna Mission.

Barr, G. and Seates. (1954). Methods of Research. Newyork: Appleton Century's.

Barr, S. Arvili. (1960). Research Methods in Chester. New York: Macmillan (Pub).

Best, John. W. & Khan, James. V. (2002). Research in Education. New Delhi: Prentice Hall of India.

Best, John. W. & Khan, James. V. (2002). Research in Education. New Delhi: Prentice Hall of India.

Best, J. W. and Kahn, J.V. (1995). Research in Education. New Delhi: Prentice Hall.

Bhagavath Geetha. 4.36.

Bhagavatham. 11-17-27.

Blaxter, L. etal. (1999). How to Research. Chennai: Viva Books.

Bose, N.K. (1947). Studies on Gandhism. Calcutta: Indian Associated publishing co.

Boud, D. (1985). Problem based learning for the profession. Sydney: HERDSA.

Buch, M.B. (1972). Second Survey of Research in Education. Baroda: Society for Research and Development.

Burton, N. Brundrett, M. & Jones, M. (2008). Doing your educational research project. Thousand Oaks, CA: Crowin press.

Campbell-Jones, B. & Campbell-Jones, F. (2002). Educating African American Children: Credibility at the cross roads. Education Horizones.

Chandokyopanishad. 6.8.7

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 13. October, 2021

Sustainable Agriculture, Marketing Management & Education Context Of Indian Horticulture

Dr. Partha Pratim Roy

Abstract

The study examines contribution of education and extension services in sustainable agricultural practices and marketing management in the context of sustainable growth and development of Indian horticulture. Disaggregated (unit level) NSSO data are used to analyse the role of education and training to enhance income of Indian farmers with special focus on West Bengal agriculture. Mincer earning function is used to assess the contribution of different levels of general education in income of agricultural community. Income of the members of the agricultural households (mainly from farming) is considered dependent variable and the independent variables are: years of schooling, work experience, gender, training, migration status (dummy variable), and a spatial dummy variable. The study has found that diversification of Indian agriculture towards horticulture is important for sustainable use of agricultural resources and to enhance farm income. Education and extension services are very crucial inputs for development of modern horticulture. Education and training to farmers plays an important role in modern agricultural practices and

sustainable management of agri-business. Education planning and manpower planning should be integrated with economic planning to achieve sustainable economic development and management practices in agriculture. The study also suggests some strategies/policies for increasing employment and sustainable income of Indian farming community.

JEL Classification : Q15, Q16, O13, I26

Key Words : Agricultural Resources, Sustainable Practices, Returns to Education, Horticulture.

Note: The present work is a part of an ICSSR sponsored research programme but we are solely responsible for the research results and views expressed in the paper.

Role Of Education In Sustainable Agricultural Practices And Marketing Management: Context Of Indian Horticulture

I. Introduction

Increasing demand for horticultural products is an opportunity to revitalise agricultural growth and augment income of the farmers through diversification of agriculture towards horticultural crops in India (Birthal et al, 2008). Horticulture-led growth has considerable potential to create employment opportunities for small and marginal farmers to enhance their income from farming. There is also a huge scope of employment generation in the non-farm sectors like transport, retail and wholesale trading, storage and processing industries, packaging and exports etc., particularly for the vast number of unorganised and low skill labourers in India. Due to strong backward and forward linkages of horticulture sector to non-farm sectors, rational use of agricultural resources and sustainable management of both

inputs and outputs of horticulture is very crucial for transforming agricultural growth to sustainable economic development. A very complex and diversified production -distribution - consumption links of agri-products challenges to sustainable management of the system of agricultural production and marketing. Education is one of the most important instruments for sustainable use of natural and human resources in agriculture. It empowers farmers to change the way they think, innovate and work for sustainable agriculture. Education helps people to develop knowledge, skills, values and behaviour which are indispensable for sustainable development. UNESCO aims to improve access to quality education for sustainable development at all levels and in all social contexts. Education and agricultural extension services can play a significant role in the management of human resources, technology and natural resources involved in the system of agriculture towards sustainable future and environment. In this context, the present study is an attempt to assess contribution of education to employment and earnings from agriculture with particular focus on Indian horticulture production and marketing systems.

The rest of the paper is organised as follows: Section II specifies the major objectives of the study. Section III reviews some literature of the subject and highlights some important issues in Indian agriculture. Section IV deals with data and methodology. Section V analyses empirical results and findings of the study. Conclusions and policy prescriptions are given in the last Section VI.

II. Objectives of the Study

The major objectives of the study are as follows:

1) To examine role of education and agricultural extension services in sustainable agricultural practices in West Bengal with special reference to Indian horticulture.

2) To estimate returns to education on earnings of the persons belong to agricultural households in West Bengal.

3) To suggest some policies for sustainable management of agricultural resources and sustainable agricultural growth for sustainable future.

III. Literature reviews and Some issues

The major changes that are taking place in Indian agriculture are: (i) shrinking resource base due to inappropriate and unscientific use of land and water, (ii) changes in demand and consumption pattern in favour of fruits, vegetables, meat, fish, eggs and dairy products, (iii) there is a decreasing trend in per capita cereal consumption, (iv) there is a shift of farming systems from food grains to non-food grains cultivation which needed different types of support systems like training, extension services, problem-solving consultancy, marketing advice etc., (v) public investments in agriculture is declining in real terms, and (vi) country's policy of economic openness results new opportunities as well as new threats to agriculture. Particularly, Indian agriculture faces a big challenge under economic globalisation and liberalization (Sulaiman & Van den Ban, 2000).

Education is one of the most important instruments for sustainable management of agricultural resources for sustainable agricultural growth and development. It is increasingly realized that knowledge is an important input for efficient farming. In the present era of globalisation, agriculture is becoming an increasingly recognised as knowledge and information-driven enterprise. Education in general and agricultural research and extension education in particular are not only important to increase agricultural production, productivity and profitability but also very crucial for improvement of social and economic life of vast rural people associated with the farming system. Agricultural extension education and advisory

services are a vital element of the array of market and non-market entities and agents that provide critical flows of information that can improve farmers' and other rural peoples' welfare (Anderson, 2007). But it is very unfortunate that the existing knowledge and information about how to use optimal combination of inputs, know-how, land management methods, and how to process, and market agricultural commodities remain inaccessible to a vast number of marginal and small farmers in India (Babu & Joshi, 2014). This is a matter of grave concern to the policy makers.

NSSO survey results (2003) regarding situations of agricultural households showed that 60 per cent of the farmer-households did not access any information on modern technologies in India. In a study it is found that: (i) one-third of the farmers obtained extension services from progressive farmers and input dealers, (ii) about 29.3 per cent farmers used radio, television and newspapers, (iii) the contribution of public sector extension system is about 10 per cent, and (iv) only 0.6 per cent of the farmers was accessed private and NGO extension services. The proximity (33.7%), assured quality (21.1%), sole option (20.6%), and timely availability (13.7%) were the main reasons for the choice of such information (Babu et al., 2012). In another study it is also found that the service delivery by public-sector extension workers was lowest for small farmers (4.8%) compared to large farmers (12.4%) (Adhiguru et al., 2009). Particularly, with the development of new technologies our agricultural extension system faces important challenges in the areas of relevance, accessibility, accountability, efficiency and sustainability.

Several studies have been made to establish the relation between the income and education both in India as well as outside India. As far as India is concerned, there are some studies which are based on NSSO data (Duraisamy 2002; Dutta 2006; Kingdon and Theopold 2008; Madheswaran and Attewell 2007). Studies suggest returns to education are higher for lower levels of education (e.g., primary) and decline with the level of

education. This is due to the low cost of primary education relative to other levels of education and considerable productivity differentials between primary graduates and illiterate persons. But in this study an attempt has been made to show the impact of education among the rural people and to substantiate the role of education as well as agricultural training for the improvement of the productivity and earnings among the people engaged in agricultural activities in West Bengal.

The role of education is considered to be important for earning higher income level. But the impact of education is not the same among the agricultural and the non-agricultural sector. So when it comes to education the important thing which is important to understand is that whether it is increasing the earnings for all the sectors or it is paying attention to some specific sector. If education does not increase the earnings of the agricultural workers then investment in education is not viable for the people who are engaged in the agricultural sector. On the other hand, if it is increasing the level of earnings then what level of education is contributing the most is important question. Moreover, not only education but useful and effective training in agricultural practice as well as the management of the sustainability of the same is also very important.

IV. Data and Methodology

The study is based on secondary data collected from different government sources like the National Horticultural Board, National Sample Survey Organisation, Government of India and Bureau of Applied Economics and Statistics, Govt. of West Bengal. To assess the impact of education on income of rural agricultural households in West Bengal we have considered unit level data extracted from the 70th round of NSS on Situation Assessment Survey (SAS) of Agricultural Households, 2013.

We have considered the people engaged in agricultural activities

residing in the districts of Darjeeling, Jalpaiguri, Koochbihar, Uttar Dinajpur, Dakshin Dinajpur, Maldaha, Murshidabad, Birbhum, Barddhaman, Nadia, North 24 Pargana, Hugli, Purba Midnapore, Paschim Midnapore, Bankura, Puruliya and Howrah. The target group of the study is basically the rural people engaged in agricultural activities of West Bengal.

For estimation of the returns to education we have taken two groups where the first group consists of the people who worked in household enterprise (self-employed: own account worker, employer, worked as helper in household enterprise (unpaid family worker), worked as regular salaried/ wage employee, worked as casual wage labour: in public works other than MGNREGA works, in MGNREGA works and the people who worked in other types of work. Since the study is based on the rural people of the districts of West Bengal as a result the study is basically of the agrarian people. The sample size for the first group includes 1609 persons. The second group of the sample includes the people who are regular wage or salaried people only. This is a homogeneous group consisting of people with agricultural background. The sample size is small with a number of observations equal to 477.

For the estimation of rate of returns to education on earnings from the agriculture we have used the earnings function method (Psacharopoulos 1981, 1994). As the elaborate method requires entire information regarding age-earnings as well as cost of education profiles by educational level, the elaborate method (Becker, 1964) is not used. This study estimates returns to education based on the earnings function method, which is also known as human capital earnings function or 'Mincerian' method of the people engaged in agricultural activities. An interesting aspect of Mincer's model is that the time spent during schooling is a key determinant of the earnings. The basic 'Mincerian' earnings function (Mincer, 1974) is given as:

$$\ln Y_{ij} = \beta_0 + \beta S_{ji} + \mu_1 E_i + \mu_2 E^2_i + u_i$$

The dependent variable used in the analysis of the study is log of income and the independent variable incorporating the human capital variable can be extended by levels of education of the rural people where dummy variables are used for different levels of education using standard Mincerian earnings function named after Jacob Mincer.

Model Specification

$\ln Y_{ij} = \Sigma\beta_0 + \text{“}\beta_{ji}S_{ji} + \mu_1 E_i + \mu_2 E^2_i + u_{i,}$

S_{ji}= ith individual completing jth level of education, E= Potential Expererience in the labour market, E^2_i=Squared term of potential experience of the labour market where potential experience is defined by the difference between age and years of schooling less 6 i.e the age at which a person gets enrolled in school.

This model is purely a model of heterogeneous model of returns to education (Stearns, 2000) since the level of earnings is different for different level of education and education is not treated as continuous variable rather discrete. So, with the growth of level of education the benefit of education also goes up.

However, we also want to check the impact of some demographic factors as well as social characteristics and the impact of migratory trend for those who have spent at least 15 days continuously outside their native land, locational effect reflected by region (dummy variable) and finally impact of agricultural training on the level of income. So, the equation becomes

$$\ln Y_{ij} = \beta_0 + \Sigma\beta_{ji}S_{ji} + \mu_1 E_i + \mu_2 E^2_i + \mu_3 G_i + \mu_4 T_i + \mu_5 M_i + \mu_6 R_i + u_{i,}$$

G_i= Gender male or female, T_i= Trained or Untrained, M_i= Migrating outside the native land R_i= Region whether Gangetic West Bengal or Non-Gangetic West Bengal (including terai and Jungle Mahal economy).

The equation shows that the log of income depends on the educational level of individuals, experience, squared experience, Gender, Training obtained, Staying pattern of the individual and finally the Region.

In this context, it is important to understand the geographical diversity of West Bengal since we are concentrating on the rural people and mostly on the households who are engaged in agricultural activities. So, the topography of the area under study is important. As a result a dummy variable is incorporated which is denoted by R_i and it takes the value 1 for the districts which belong to gangetic West Bengal and takes the value 0 for the districts which are under terai, dooars and jungle mahal more precisely non-gangetic part of West Bengal. The gangetic part of West Bengal is fertile and the productivity of agricultural crops is more compared with the non-gangetic part of the state. So the coefficient of R_i represents the differential effect due to location.

Similarly, the co-efficient of gender represents the differential effect of being male or female, the co-efficient of training represents the differential effect of being trained and finally the co-efficient of the variable M_i represents the differential effect of staying outside the native land for more than 15 days.

In the next segment a comparative analysis is done regarding the mean earnings of the people of the representative districts. Also, there is availability of data regarding the individuals training in agricultural activities and motivation towards migration. An attempt has also been made to capture the relationship between training in agricultural activities and motivation towards migration and their impact on income. The table (Table A) below describes the nature of the variables used for regression.

Table A Description of Variables

Variable	Description	Base Category
	Dependent Variable	
Log wage	Natural log of wage in Rs to estimate the earnings function.	None
	Explanatory (Independent) variables	
Human Capital Variables		
Educational Level	An individual belongs to one of the following educational level: illiterate and literate below Primary, Primary, Secondary, Higher Secondary and Graduate & Post Graduate. It is assumed that an individual spends 0, 4, 6, 2, 3 and 2 additional years respectively in these educational levels. (5 Dummies: Primary, Secondary, Higher Secondary, Graduate & Post Graduate)	Illiterate and literate below primary (S_{ji}=0)
Experience (E)	Potential experience (Proxy for actual labour market experience) in years is defined as age minus years of schooling minus 6	None
Experience^2 (E^2)	Square of experience	None
Demographic Variables		
Gender	Sex of Individual (Male or Female) Dummy Variable	Female (G_i =0)
Regional	Place of Residence: Gangetic West Bengal Versus Non-Gangetic West Bengal (Terai, Dooars and Jungle Mahal Economy), Dummy Variable.	Non-Gangetic West Bengal (=0)

Training	Agricultural training taken by individuals versus untrained, Dummy Variable	Untrained (T_i=0)
Stayed outside	Stayed outside for at least 15 days, Dummy Variable	Stayed inside (M_i =0)

Semi logarithmic regression equation is used to estimate annual average compound growth rate of the relevant variables in the study.

V. Results & Discussions

5.1 India's Position in World Horticulture

Horticulture is a subset of agriculture sector which covers wide varieties of crops from vegetables, fruits, and flowers to spices, honey and different plantation, aromatics and medicinal crops and plants. It is a rapidly growing sector in the country. The National Horticulture Mission scheme has been launched in 2005-06 for the holistic growth and development of horticulture sector. The area under horticulture crops in India has increased from 18.5 million hectare in 2005-06 to 24.9 million hectare in 2016-17 with a growth rate of 2.9 per cent per year and the corresponding horticulture production has increased at the rate of 6.7 per cent per year; from 166.9 million MT to 300.6 million MT during the same period. The growth rates of exports of fresh vegetables, fresh fruits and floriculture in value terms are significantly high of 9.03%, 15.31% and 5.64% respectively as compare to the overall growth of India's agri-exports (2.37%) during 2011-12 to 2017-18.

Table 5.1 India's Position in World production of Fruits & Vegetables, 2014

Item	Production (million tonnes)		India's		Country ranked 1st.
	India	World	% Share	Rank	
Vegetables & Melons	**127.0**	**1169.0**	**10.8**	**2nd**	**China**
Okra	6.3	9.5	66.3	1st	India
Potatoes	46.0	382.0	12.0	2nd	China
Tomato	19.0	171.0	11.1	2nd	China
Onion (dry)	19.0	88.0	21.5	2nd	China
Cabbages & other Brassicas	9.0	72.0	12.5	2nd	China
Cauliflower & Broccoli	8.5	24.0	35.2	2nd	China
Brinjal	13.5	50.0	27.0	2nd	China
Fruits excluding Melons	**88.0**	**689.0**	**13.0**	**2nd**	**China**
Banana	28.0	114.0	24.5	1st	India
Mango, Mangosteen & Guava	18.0	45.0	40.0	1st	India
Lemon & Lime	2.8	16.2	17.2	1st	India
Papaya	5.6	12.6	44.4	1st	India
Apple	2.5	84.6	3.0	4th	China
Pineapple	1.7	25.4	6.8	7th	Costa Rica
Oranges	7.3	72.3	10.1	3rd	Brazil
Grapes	2.6	74.5	3.5	8th	China
Major citrus (total) fruits	11.2	139.8	8.0	3rd	China

Source: Horticultural Statistics at a Glance, 2017, DAC & FW, GOI.

An analysis of data in Table 1 shows that the position of India in world horticultural production is the second largest after China. It is proud of us that India has secured 1st position in the production of Okra, Banana, Mango, Mangosteen, Guava and Papaya among the countries in 2014 Therefore, it is a bright side from the production point of view. But, if we examine data on land productivity of vegetables and fruits, it can be said that the Indian horticulture productivity is quite low in compared with that of the other countries (Figure 1). India's vegetables productivity is found to be 14.87 tonnes per hectare while the said productivity in USA is 33.30 tonnes per hectare. In China it is also quite high of 24.04 tonnes per hectare as compared to India. Thus, there is great potentiality to improve productivity of Indian horticulture. So, the prospect of Indian agriculture lies in the improvement in yield rates of different crops. Education, training, agricultural extension services etc. are the crucial inputs for growth and development of modern agriculture in India.

Figure 1 Productivity of Vegetables & Fruits in China, India, USA and World, 2014

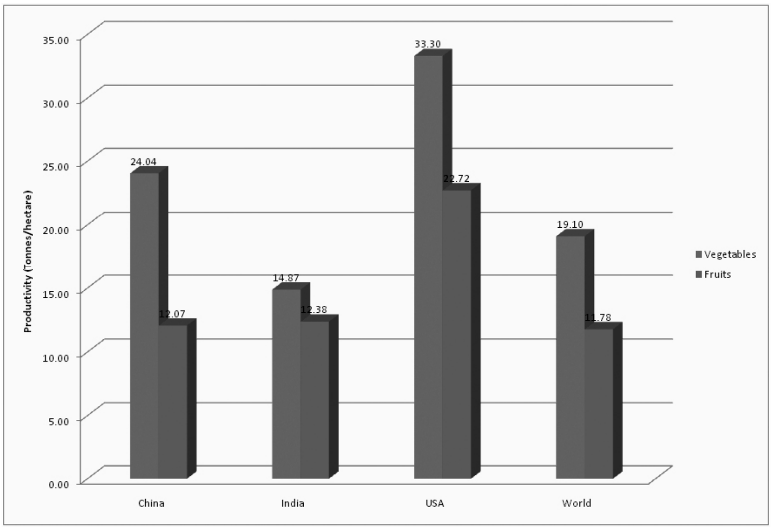

Table 2 shows the growth rates of traditional principal crops and horticulture crops (vegetables and fruits). It reveals that the growth rates of traditional crops are estimated to be less compared with the horticultural crops during 1961 to 2016. Secondly, among the horticultural crops, if we compare the pre- and the post- reform periods, the rate of growth of horticultural crops is observe to be greater in the post-reform period than in pre-reform period which implies prospects of horticulture sector in India.

Table 5.2 Growth rates of Area and Production of different crops in India, 1961-2016.

	AACG	**AACG**	**AACG**
Growth of Area & production	1961-1990	1991-2016	1961-2016
Crops	Pre-reform	Post-reform	Total
Paddy area	0.63	0.06	0.41
Paddy production	2.67	1.43	2.31
Wheat area	2.50	0.93	1.47
Wheat production	6.22	2.03	4.06
Fruits area	1.85	4.01	2.91
Fruits production	2.55	4.57	3.65
Vegetables area	2.05	2.61	1.79
Vegetables production	3.47	3.88	3.43

Note: a=Area in 000 hectare and p=Production in 000 tonnes. AACG = annual average compound growth rate (%).Source: FAO Data base.

Therefore, the major concern is to find out the factors which are responsible for the development of the people engaged in the agricultural economy in India. Diversification of agriculture in favour of horticulture

has great potentiality to proper use and management of agricultural resources. The management of human and physical sources and effective optimisation techniques and policies might increase the productivity. In the present context of knowledge-driven agriculture, the impact of education is therefore needed to be carefully analysed.

5.2 West Bengal in Indian Horticulture

Vegetables occupy a prime place in West Bengal horticulture. The area under vegetables is about 76 per cent of total area of horticulture in West Bengal followed by fruits area (13 per cent), and flowers (2 per cent) in triennium crop year ending of 2016-17. Others horticulture plantations and crops share about 9 per cent of total horticulture area (Figure 1). In India, the shares of vegetables, fruits, and flowers in total area under horticulture are 41 per cent, 26 percent and 1 percent respectively in 2016-17 (Figure 2).

Figure 2 Distribution of Area under horticulture in West Bengal (TE: 2016-17)

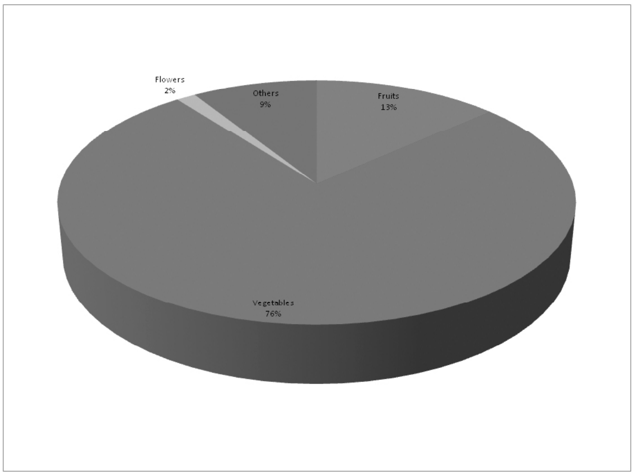

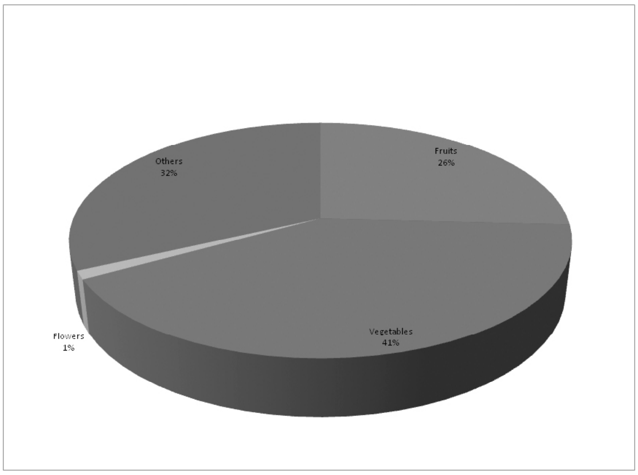

Figure 3 Distribution of Area under horticulture in All India (TE: 2016-17)

Area and production of vegetables, fruits and flowers in West Bengal vis-a-vis India during last six years are depicted in Table 5.3. Total area under horticulture in West Bengal increases from 1720.2 thousand hectare in 2011-12 to 1838.2 thousand hectare in 2016-17; total production increases from 27029 thousand tonnes to 30008.2 thousand tonnes. The annual average compound growth of area and production of total horticulture crops in West Bengal is estimated as 1.43 per cent for area and 1.28 per cent for production during the last six years. The corresponding horticulture growth rates of area and production are 1.14 per cent and 2.84 per cent respectively in India. Growth of area under different horticulture crops in West Bengal vis-a-vis India is shown in Figure 3 and the growth of production of crops are depicted in Figure 4.

Recently, West Bengal has achieved an impressive growth in area and production of fruits. The area under fruits in West Bengal increases monotonically from 216.6 thousand hectare in 2011-12 to 253.0 thousand

Table 5.3 Recent Growth of Area and Production of Horticulture Crops:

West Bengal vis-a-vis India, (2011-12 to 2016-17)

West Bengal		**West Bengal**						**AACG**
Crops		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	(%)
Fruits	A	216.6	220.6	223.5	228.3	249.2	253.0	3.38
	P	3055.4	3172.5	2909.7	3313.7	3516.7	3585.3	3.60
Vegetables	A	1330.9	1348	1380.3	1387.2	1391.4	1387	0.88
	P	23415.7	25466.8	23045	26354.6	22825.4	25505.7	0.67
Flowers	A	23.9	24.4	24.9	25.3	25.6	26.0	1.70
Loose	P	63.9	65.1	66.5	68.2	69.6	71.3	2.22
Cut*	P	25042.1	25429.1	145.2	148	197.1	201.6	13.55
Total Horticulture	**A**	**1720.2**	**1742.1**	**1778.1**	**1790.5**	**1836.9**	**1838.2**	**1.43**
	P	27029	29199.5	26678.5	30398.1	27246.2	30008.2	1.28

West Bengal	West Bengal							AACG
India					India			
Fruits	A	6704.2	6982	7216.3	6109.7	6300.7	6373.4	-2.06
	P	76424.2	81285.3	88977.1	86601.7	90183	92918	3.67
Vegetables	A	8989.5	9205.2	9396.1	9542.2	10106.3	10237.9	2.74
	P	156325.5	162186.6	162896.9	169478.2	169063.9	178172.4	2.37
Flowers	A	253.7	232.7	255	248.5	277.6	306.3	4.22
Loose	P	1651.6	1729.2	1754.5	1658.7	1656.2	1699.4	-0.12
Cut	P	75066	76731.9	542.5	484.2	527.7	692.8	8.54
Total Horticulture	**A**	**23242**	**23694.1**	**24198.5**	**23410**	**24471.7**	**24850.9**	**1.14**
	P	257277.1	268847.5	277352	280986.1	286187.7	300643	2.84

Note: A= Area in '000 Hectare, P=Production in '000 MT, AACG =annual average compound growth rate (%) during 2011-12 to 2016-17, *2013-14 onward Cut Flower Production is being given in '000 MT as compared to earlier reporting (2011-12 & 2012-13) in Lakh Numbers.

Source: National Horticulture Board website.

hectares in 2016-17 with a growth rate of 3.38 per cent per year during 2011-12 to 2016-17, while in all India level there is a negative growth of area under fruits (-2.06 per cent per year) during the same period of time. Among the leading states in respect of fruits, the position of West Bengal is 12th rank in area, 9th rank in production, and 9th rank in land productivity of fruits in 2016-17. Top-3 fruits producing states are Andhra Pradesh, Maharashtra, and Uttar Pradesh.

West Bengal has occupied first position consistently among Indian states in terms of area under vegetables till 2015-16. In 2016-17, West Bengal ranks second next to Uttar Pradesh in terms of both area and production of vegetables. In terms of land productivity of vegetables, the performance of West Bengal is not satisfactory; ranks 10th among the states. High productivity of vegetables states are Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Jammu & Kashmir, and Himachal Pradesh. Vegetables production in West Bengal increases from 23.4 million tonnes in 2011-12 to 25.5 million tonnes in 2016-17. The corresponding figures for India are 156.3 million tonnes in 2011-12 and 178.2 million tonnes in 2016-17. West Bengal has contributed a significant share in all India vegetables; on an average, it shares 15% of production and 14% of area of all India vegetables (Table 5.4). Recent growth rates of area (0.88%) and production (0.67%) of vegetables in West Bengal are found to be lower than that of all India growth of area (2.74%) and production (2.37%) of vegetables during 2011-12 to (Table 5.3).

West Bengal is one of the leading flower producing states in India. It ranks top position in production of cut flowers; more than 30% share is contributed by West Bengal in India. In terms of production of loose flower West Bengal occupies 3rd position after Tamil Nadu and Karnataka. In terms of area under flowers, West Bengal rank is 5th highest (contributed 8.5% of total area under flower in India) in 2016-17 and other leading states are Jammu & Kashmir, Karnataka, Tamil Nadu, and Kerala.

Table 5.4 Percentage share of West Bengal in All India Horticulture Area and Production

		West Bengal's Contribution (%) in All India						**AACG**
Crops		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	**(%)**
Fruits	A	3.23	3.16	3.10	3.74	3.96	3.97	**5.55**
	P	4.00	3.90	3.27	3.83	3.90	3.86	**-0.07**
Vegetables	A	14.81	14.64	14.69	14.54	13.77	13.55	**-1.81**
	P	14.98	15.70	14.15	15.55	13.50	14.32	**-1.66**
Flowers	A	9.43	10.49	9.74	10.19	9.23	8.50	**-2.42**
Loose	P	3.87	3.77	3.79	4.11	4.20	4.19	**2.35**
Cut*	P	33.36	33.14	26.76	30.57	37.35	29.09	**4.61**
Total Horticulture	A	7.40	7.35	7.35	7.65	7.51	7.40	**0.28**
	P	10.51	10.86	9.62	10.82	9.52	9.98	**-1.51**

Note & Source: Same as Table 1.

Figure 4 Annual Growth of area under horticulture in West Bengal & India, 2011-12 to 2016-17

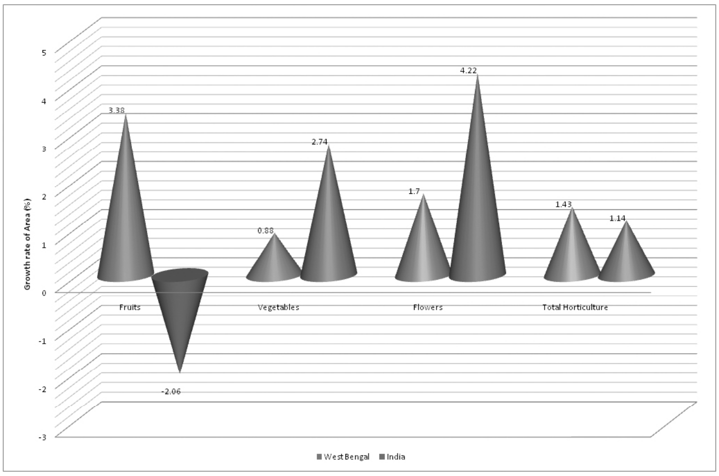

Figure 5 Annual Growth of production of horticulture crops in West Bengal & India (during 2011-12 to 2016-17)

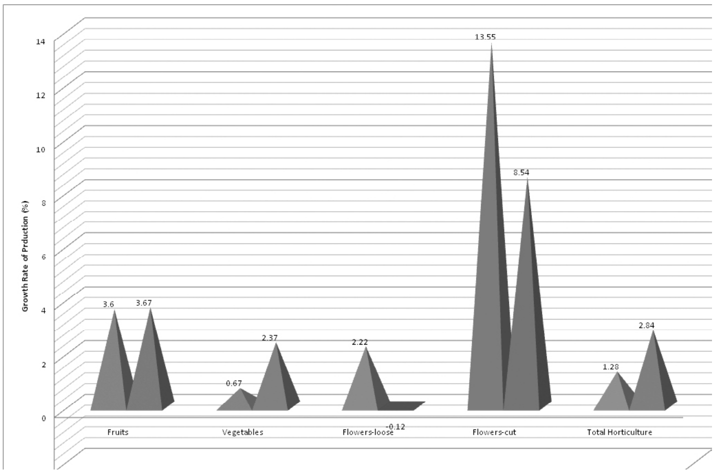

The area under flowers in West Bengal (India) increases from 23.9 (253.7) thousand hectare in 2011-12 to 26.0 (306.3) thousand hectare in 2016-17; annual growth rate is being 1.70 per cent in West Bengal and 4.22 per cent in India. The contributions of West Bengal in production of both loose flowers and cut flowers are increasing significantly at the rate of 2.35 per cent and 4.61 per cent respectively during 2011-12 to 2016-17 (Table 5.4).

Figure 6 Annual Growth of productivity of horticulture crops in West Bengal & India (during 2011-12 to 2016-17)

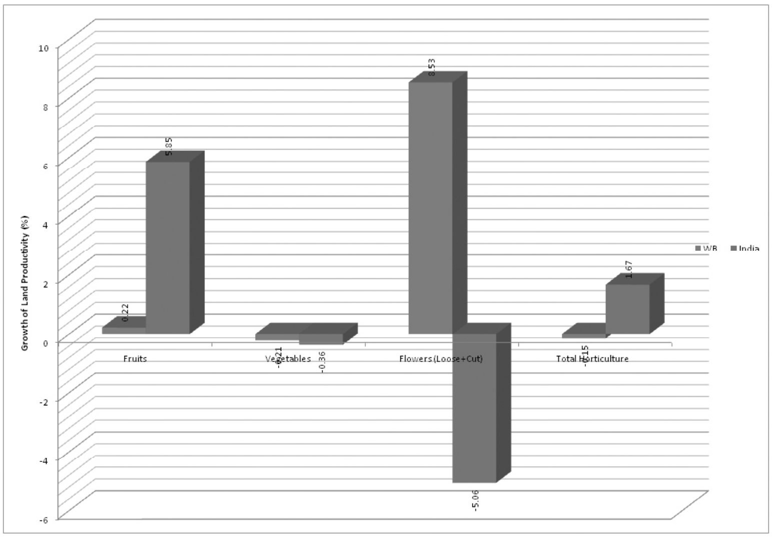

Table 5.5 depicts land productivity differentials in horticultural crops in West Bengal in relation to all India average productivity. It is observed that land productivity of total horticulture in West Bengal is higher than the National average productivity during 2011-12 to 2016-17; value of productivity index for West Bengal is being greater than 100 in each year.

Table 5.5 Productivity (MT/Ha.) of horticulture crops in West Bengal & India

Crops	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
West Bengal			**West Bengal**				**AACG**
Fruits	14.1	14.4	13.0	14.5	14.1	14.2	0.22
Vegetables	17.6	18.9	16.7	19.0	16.4	18.4	-0.21
Flowers (Loose+Cut)			8.5	8.5	10.4	10.5	8.53
Total Horticulture	15.7	16.8	15.0	17.0	14.8	16.3	-0.15
India			**India**				
Fruits	11.4	11.6	12.3	14.2	14.3	14.6	5.85
Vegetables	17.4	17.6	17.3	17.8	16.7	17.4	-0.36
Flowers (Loose+Cut)			9.0	8.6	7.9	7.8	-5.06
Total Horticulture	11.1	11.3	11.5	12.0	11.7	12.1	1.67
Productivity Index= (Yield in West Bengal/ Yield in India)*100							
Fruits	123.7	124.1	105.7	102.1	98.6	97.3	
Vegetables	101.1	107.4	96.5	106.7	98.2	105.7	
Flowers (Loose+Cut)			94.4	98.8	131.6	134.6	
Total Horticulture	141.4	148.7	130.4	141.7	126.5	134.7	

Source : NHB, GOI.

But there are year-wise fluctuations in land productivity both in West Bengal as well as in India. Growth of land productivity is portrayed in Figure 5. As a whole productivity of horticultural crops decreases in West Bengal during 2011-12 to 2016-17; in India it is increasing. Land productivity of fruits and flowers increases and productivity of vegetables decreases in West Bengal. In all India level, fruits productivity increases but productivity of vegetables and flowers decreases during the same period of time.

5.3 Education & Earnings:

5.3.1 Analysis of Descriptive Statistics

An analysis of aggregated NSSO data (Table 5.6) reveals that average monthly income and consumption expenditure per agricultural households are Rs. 6426 and Rs.6223 respectively in India during the latest agricultural survey year of 2012-13. The said figures for West Bengal are found to be lower than the national average. In West Bengal, average monthly income and consumption are estimated as Rs. 3980 and Rs 5888 per agricultural households respectively. Table 5.7 depicts Net attendance ratio for different levels of education by sex in rural West Bengal vis-a vis rural India. It reveals that performance of West Bengal in terms of extent of education (net enrolment ratio and female education) in rural areas is above the national average. Thus, it is very difficult to draw any conclusion regarding the relationship between education and earnings in rural areas based on aggregated data.

Regarding agricultural extension services to farmers it is observed that about 50.6 per cent of the agricultural households accessed technical advices in the field of agriculture from any agencies/ sources in West Bengal, while at the all India level, it is 40.6 per cent of the cultivating households during the period of July, 2012- December, 2012 (Table 5.8). In

West Bengal, the major sources accessed by the agricultural households for access to modern technology and technical advices are Progressive farmers (26.4%), Private Commercial agents (21.3%), and Radio/ TV/ newspaper/ internet (20.4%). Only 3 per cent of them reported that they have accessed technical advice from extension agent in West Bengal which is below the national average figure of 6.2 per cent. The contribution of Krishivigyan Kendra in this respect is only1.5 per cent in West Bengal and 2.7 per cent in India. Private Commercial agents play important role in this regard in West Bengal as compare to all India level. However, farmers' access to modern technology and technical advices in the field of agriculture is a very important aspect for sustainable management of farming practices which positively affects the preferences and practices of the farming community towards better output and income from agricultural activities. As per NSS report more than 90 per cent agricultural households found such technical advices useful in India.

Table 5.6 : Average monthly income (Rs.) and consumption expenditure (Rs) per agricultural household during July 2012-June 2013

Sources of Income	**West Bengal**	**India**
Income from wages (Rs)	2126	2071
Net receipt from cultivation (Rs)	979	3081
Net receipt from farming of animals (Rs)	225	763
Net receipt from non-farm business (Rs)	650	512
Total income (Rs)	**3980**	**6426**
Total consumption expenditure (Rs)	5888	6223
Net investment in productive asset (Rs)	147	513

Source: NSS KI (70/33): Key Indicators of Situation of Agricultural Households in India

Table 5.7 Net attendance ratio for different levels of education by sex and residence in West Bengal vis-a vis India

	Rural Areas	
Level of Education	**West Bengal**	**all-India**
	Net attendance ratio for male	
Primary	85	84
Upper primary	71	64
Primary & upper primary	90	88
Secondary	49	51
Higher secondary	21	36
Above higher secondary	8	12
	Net attendance ratio for female	
Primary	86	82
Upper primary	74	61
Primary & upper primary	90	85
Secondary	55	49
Higher secondary	27	33
Above higher secondary	7	8

Source: NSS report, 71st Round Survey on Education, NSS KI(71/25.2), June 2015

Table 5.8 Per 1000 distribution of agricultural households having accessed technical advice by source.
(during July, 2012- December, 2012)

Source	**West Bengal**	**Al India**
Extension agent	30	62
Krishivigyankendra	15	27
Agricultural university/college	4	12
Private commercial agents (including drilling contractor)	213	74

Source	**West Bengal**	**Al India**
Progressive farmer	264	200
Radio/tv/newspaper/internet	204	196
Veterinary department	59	80
NGO	6	12
Any agent	**506**	**406**

Source: NSS Report No.573: Some Aspects of Farming in India, 2012-13

We have used NSSO unit (individual) level data to examine the relationship between education and earnings from farming in West Bengal. We have estimated returns to education in rural areas. The Figure 7 shows the estimated average earnings of the rural people engaged in agricultural activities. It varies greatly across districts in West Bengal. It can be said that the income of the agrarian people in these regions differ considerably. The districts which fall under gangetic part are Maldaha, Murshidabad, Nadia, Birbhum, Hooghly, Barddhaman, Howrah, North 24 Pargana and South 24 Pargana. These districts are adjacent to the river Bhagirathi flowing toward the Bay of Bengal. The districts which are less productive and suffer from low productivity of agriculture are: Purulia, Bankura and Paschim Midnapore (belong to Jungle Mahal), Dakshin Dinajpur, Darjeeling, Koochbihar and Jalpaiguri (belong to terai and dooars). The districts with lower productivity have mean earnings below the state average level of income and those with higher average earnings have higher productivity.

Figure 7 Mean earnings of the Rural West Bengal people (District Wise) in Rs.

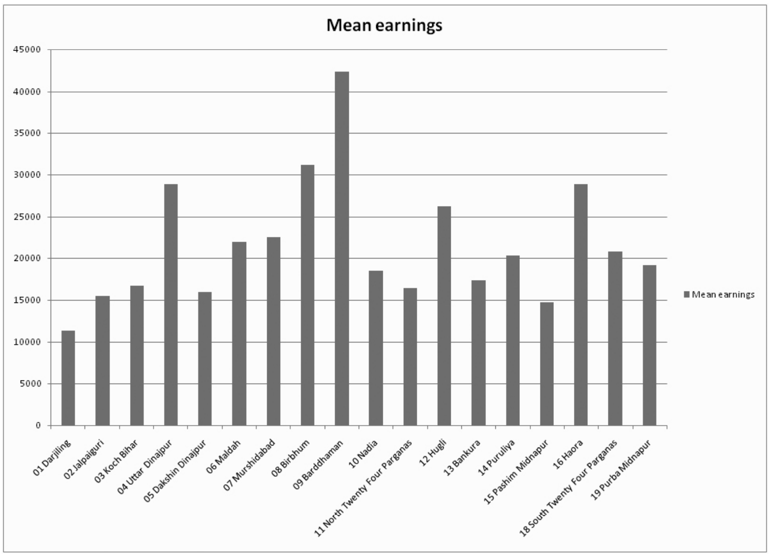

Source: NSSO data (SAS, Visit 1, 2012-13)

Table 5.9 Mean and standard deviation (SD) of the variables used for regression analysis

Variables Used	Mean and(S.D) (for Total Rural Workers) N= 1609	Mean and (S.D) (for Regular Rural Workers) N=477
Earnings	20997.1 (29992.29)	43502.58 (46223.41)
Years of Schooling	6.13 (5.14)	9.42 (5.33)
Primary	0.28 (0.45)	0.16 (0.37)
Secondary	0.27 (0.44)	0.28 (0.45)

Variables Used	Mean and(S.D) (for Total Rural Workers) N= 1609	Mean and (S.D) (for Regular Rural Workers) N=477
Higher Secondary	0.06 (0.23)	0.13 (0.34)
Graduate	0.07 (0.26)	0.21 (0.41)
Post Graduate	0.02 (0.14)	0.06 (0.24)
Stayed outside	0.12 (0.32)	0.54 (0.22)
Trained	0.02 (0.15)	0.02 (0.16)
Spatial	0.66 (0.47)	0.71 (0.45)
Gender	0.84 (0.36)	0.77 (0.41)
Experience	24.25 (14.22)	22.11 (12.81)
Experience Square	790.53 (805.54)	653.05 (630.42)
Age	36.39 (12.65)	37.54 (11.41)

Calculated on the basis of the unit level NSSO data (2012-13)

It is observed from the analysis of descriptive statistics shown in Table 5.9 that the mean earning is higher (more than double) for those who are regularly employed in comparison with the total rural workers. The average years of schooling is less for the total workers (6.13 years) in comparison with the regular rural workers (9.42 years). The human capital variables used in the model for both the categories interestingly shows that the mean values for the total workers decrease with level of education but the mean values of the regular workers rise with level of education in comparison with the total workers. About 28% people of the total worker are primary educated whereas about 16% people of the regular workers are primary educated. If we consider the Secondary education, 27% people are educated in the total worker category whereas out of the regular workers

28% people fall in this category. Moreover, for the educational level of Higher Secondary education, only 6% are in the total workers category but 13 % fall in the regular workers. Similar pattern is observed for Graduate and Post Graduate category. Out of the total workers 7% are Graduate and 2 % are Post Graduate whereas in the regular workers category 21 % are Graduate and 6% are Post Graduate. So, it can be said that the regular workers have higher propensity to invest in education and as a result increase the probability of being employed round the year even in the unorganised sector like agricultural economy in West Bengal. The mean value of the persons in the total workers category who have migratory trend is less than the regular worker category but the proportion of people taking training related to agriculture is same for both the categories. More regular workers reside in the gangetic West Bengal than the total workers. The mean value of experience is less for the regular workers in comparison with the total workers but the mean age is less for the total workers in comparison with the regular workers.

5.3.2 Analysis of regression results

The table 5.10 shows the OLS estimates of the regression equation mentioned above. The OLS estimation shows that the value of R^2 is higher for the people who were regular wage employed. The first sample consists of the explained variables such as level of schoolings like primary education, secondary education, higher secondary education, graduate, post graduate all are positive and statistically significant at 1% level of significance for almost all the level of education both in the overall rural people category and the people who were regular wage employed. The difference is that for the later the estimate is robust because it consists of a homogenous group. Moreover, the estimates of the variables like experience and squared experience also show the desired sign. A positive sign on experience implies that income goes up with years of experience which is the proposition that skill increases dexterity and thereby

productivity. Moreover, the squared experience negative implies that there is monotony in the same work and thereby productivity goes down. In both the samples the desired signs are observed and are statistically significant. It is observed that the earnings reach maximum when the experience is 31 years. The gender dummy captures the wage differential between male and female which also shows the desired sign i.e male workers are paid more than the female workers.

Table 5.10 Ordinary least Square Estimates of the Regression equation

Dependent Variable:- Log Income	**All Workers**	**Regular Workers**
	R^2=0.25	**R^2=0.34**
	N=1609	**N=477**
	F=(11,1597)=49.19	**F=(11,465)=22.12**
Explanatory Variables	**Co-efficient**	**Co-efficient**
	(p-value)	**(p-value)**
Primary	0.105	0.36
	(-0.100)	(-0.010)
Secondary	0.391	0.88
	(0.000)	(0.000)
Higher Secondary	1.11	1.33
	(0.000)	(0.000)
Graduate	1.53	1.63
	(0.000)	(0.000)
Post Graduate	2.01	2.01
	(0.000)	(0.000)
Experience	0.05	0.05
	(0.000)	(-0.004)

Dependent Variable:- Log Income	All Workers	Regular Workers
	R^2=0.25	R^2=0.34
	N=1609	N=477
	F=(11,1597)=49.19	F=(11,465)=22.12
Explanatory Variables	**Co-efficient**	**Co-efficient**
	(p-value)	**(p-value)**
Experience^2	-0.0008	-0.0008
	(0.000)	(-0.029)
Gender	0.33	0.33
	(0.000)	(-0.001)
Trained	-0.15	0.27
	(-0.320)	(-0.270)
Stayed outside Native land	0.14	0.16
	(-0.050)	(-0.030)
Regional	0.13	0.18
	(0.000)	(-0.040)
_Cons	8.06	7.758
	(0.000)	(0.000)

Calculation is Based on NSSO data 2012-13

In both the samples the results are statistically significant. The dummy variable capturing the effect of obtaining training is negative insignificant indicating that formal training is not sufficient to increase the earnings of the individual. Also, the dummy variable staying outside captures the indirect effect of increasing wages. The indirect effect of staying outside the native land for more than 15 days creates the opportunity for gaining some quality in earning more. However, the direct impacts of basic skills should not be underestimated. Under certain circumstances, just being

able to calculate, read and write provides opportunities for the performance of a more lucrative work. However, if the young generation starts to move towards city or migrate towards other areas then the earnings tend to increase which is observed for those who have stayed outside their villages for more than 15 days or like that implying that these labour force has alternative usage to increase the overall productivity of the economy rather than remaining idly in the rural areas. Thus, regression results summarise the following observations:

1 The overall model is significant as the “F” pertaining to each category is significant. The value of R^2 is 0.25 for the total workers and it is 0.34 for the regular workers.

2. The human capital variables are positive and highly significant indicating a direct relationship between education and earnings for both the total workers in the rural area and the regular workers in the rural area. Moreover, as the level of education goes up, the magnitude of the co-efficient also goes up for both the categories though the impact of education on earnings increases with level of education more for the regular workers category.

3. The variable gender is positive and significant indicating that the income of the male workers is upward biased for both the category of workers with same magnitude.

4. The variable for training is not significant for both the category of workers. In case of total workers, the co-efficient is negative. However, for the regular workers it is positive but insignificant. So, the training of the agricultural workers is not up to the mark.

5. The variable representing migratory trend from rural area is positive and highly significant for both the category of workers but the impact of migration increases income for the regular workers more compared to the total workers. In fact, those who get employment opportunity

more have a propensity to stay outside the native land in compared to those who are occasional employment.

6. The most important variable is the regional variable in the context of agriculture in West Bengal and it is positive and highly significant for both the category of workers. However, the magnitude for the regular workers residing in gangetic West Bengal is higher in comparison with the total workers.
7. The income of the people belong to rural workers is maximised when the experience is 31 years. This can be calculated by using the formula $-(\mu_1/2\mu_2)$ following the study by Agarwal (2011).

The Table 5.11 shows the differential effect of the dummy variables used in the model. According to Halvorsen and Raymond (1980) for the interpretation of dummy variables in a semi-logarithmic equation, the differential effect is captured, since the dependent variable is in the logarithmic form, the coefficient of dummy variable is adjusted by $\{e^{(co\text{-}efficient)} - 1\}$. The estimates shown in the table 5.11 suggest that a person (belong to the group total rural worker category) who is primary educated earns 11.07 % more than the illiterate people for the same category. Similarly, with the increase in level of education a person belonging to secondary education earns 47.84 % more than primary educated and so on. A male worker earns 39.09 % more than a female worker. If a worker is staying outside then he is earning 15.02 % more than the person living in the native land. Finally, a person living in the Gangetic West Bengal is getting 13.88 % more than the people living in non-Gangetic West Bengal. The same comparison can be done for the regular workers also. The same trend is observed for the regular workers also but the only difference is that they earn more than the total workers category.

Table 5.11 Differential effect of dummy variables in Semi logarithmic regression equation

Level of Education	Total Rural Workers	Regular Rural Workers
Primary	0.11	0.43
Secondary	0.47	1.41
Higher Secondary	2.03	2.78
Graduate	3.61	4.10
Post Graduate	6.46	6.46
Sex	0.39	0.39
Trained	-0.13	0.30
Stayed outside Native land	0.15	0.17
Regional	0.13	0.19

Calculated on the basis of the estimates of the OLS estimation in Table 5.10

5.3.3 Private Returns to Education

From the OLS estimation mentioned above we will see the private returns to education which is the per year returns to education from individual point of view for investing one more year in education can be calculated by the following formulae Psacharapolous (1994): $r_2 = (â_2 - â_1)/Än2$ is the marginal rate of returns to education per year. Here $â_2$ is the estimate of the co-efficient of 2nd level of education $â_1$ is the estimate of the co-efficient of the 1st level of education and Än2 is the additional year of schooling for completing level 2. Finally, r_2 is the private returns to education for 2nd level of education. Thus, the marginal returns to education can be calculated using the above formulae for each level of education. The table below shows that the private returns to education has increased from primary

education to secondary education and from secondary education to higher secondary education in an increasing rate for both the all rural workers (taken together) and for the regular rural workers. But thereafter, the marginal return to education for graduate level has fallen and finally it has increased for post graduate level. The interesting thing is that it has happened for both the type of workers. The only difference is that the returns are higher in lower level of education for the workers who are regular workers as compared with the all rural workers. The returns to higher secondary onwards the returns have drastically fallen for the regular workers in comparison with the all rural workers. The estimates are upward biased for the people in the overall category and even lower for the regular wage salaried people since they get work on regular basis their urge of studying more gets down as they have to forego the present earnings and there is uncertainty regarding job in the future in the rural area. This also leads to higher drop out ratio for higher education in rural West Bengal.

The marginal returns to education per year of education are higher for regular salaried workers in comparison with all workers for primary and secondary level only. Thereafter with the increase in level of education from Higher Secondary to Post Graduate it is less for the regular workers in rural West Bengal. The possible reason behind this might be those who are regular workers find it difficult to continue education as well as work. Alternatively, it is also true that since the all workers are heterogeneous, outcome changes with level of education. Therefore, as far as policy prescription is concerned, on the job training as done in the organised sectors does not cope up with the same yield in the unorganised sector. So the impact of training on farm income of the people engaged in agriculture is insignificant in rural West Bengal. Moreover, it is observed that only 2.3 % of the regular workers and 2.7 % of the total workers have taken training. Therefore, more and more people have to be trained in the agricultural sector so that with proper training they come under an umbrella of equity.

Table 5.12 Private Rate of Returns to education (%)

Level of Education	All Rural Workers	Regular Rural Workers
Primary	2.63	9.00
Secondary	4.76	8.66
Higher Secondary	35.95	22.50
Graduate	14.00	10.00
Post Graduate	24.00	19.00

Calculated on the basis of the OLS estimation based on NSSO data (2012-13)

Figure 8 Marginal Rate of returns to education (%) for the people living in Rural Area.

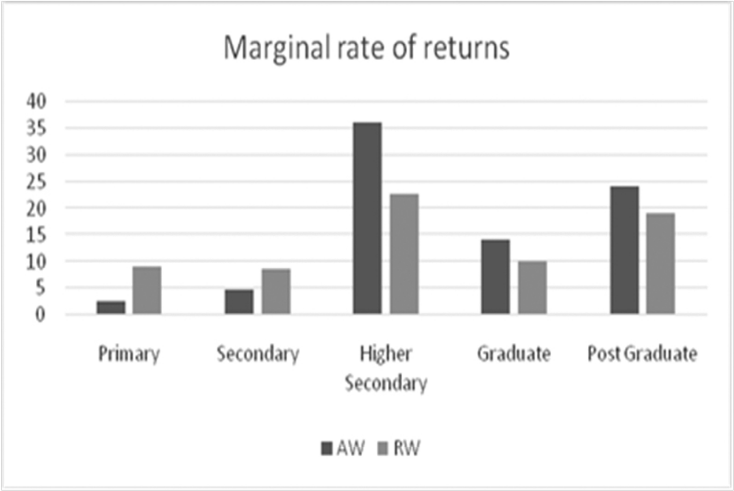

Calculated on the basis of the OLS estimation based on NSSO data (2012-13)

VI. Conclusions and Policy prescriptions

Diversification of agriculture towards horticulture is important for sustainable use and management practices of agricultural resources in India. India has occupied 2nd position in the production of world horticulture. In production of some horticultural crops like banana, mango, papaya and Okra the position of Indian horticulture is the highest in the world. Indian horticulture has great potentiality to absorb labour force and to enhance income from farming. Compared to the production of traditional principal crops (paddy- wheat), the production of horticulture crops has been growing faster annually. Moreover, the rate of growth of horticultural products has been accelerated in the post reform era. The contribution of West Bengal horticulture in all India level is very significant. The rate of growth of production is highest for fruits in comparison with the vegetables and flowers in West Bengal. So, diversification of crops in favour of horticultural crops is required in India and for West Bengal; more emphasis should be given towards the production as well as marketing of fruits, vegetables and flowers to ensure management sustainability and profitability of Indian agriculture. Education, training and extension services are the crucial inputs of modern agriculture. Role of education in agricultural sector has significantly positive impact in West Bengal. The study reveals that education has positive impact on the level of earnings from agriculture for both the categories of workers i.e., the total workers and the regular workers. The level of education along with the other explanatory variables explains the Mincerian model more precisely for the homogenous group of workers who are regular. There is wage disparity in favour of male workers as compared with the female workers. So, policies should be taken to empower the female workers for sustainability in agrarian economy. Training in agricultural activities shows desired sign for the homogeneous group i.e., training increases the farm income though it is statistically insignificant. There is regional disparity in the income of agricultural households in West Bengal may be due to diversified agro-

climatic conditions and differences on farming practices across districts. People who have migratory trend earn more than others. An adoption of appropriate labour management practices in Indian agriculture is also required. Therefore, as a whole it can be concluded that education and training plays an important role in modern agricultural practices and sustainable management of agri-business. Education planning and manpower planning should be integrated with economic planning to achieve sustainable economic development and management practices in agriculture. The following suggestions are important for increasing employment and sustainable income of Indian farming community.

1. There is an urgent need of educational reforms to change the system of education and training in favour of work conditions and increase productivity.
2. Farmers accessibility to Government Agricultural extension services should be improved for sustainable management and farming practices in India.
3. Farm and non-farm employment opportunities should be created through diversification of agriculture in favour of horticultural crops and marketing management of horticultural products.
4. Emphasis should be given on efficient use of agricultural resources, particularly on land and water.
5. A system should be developed to improve agricultural labour management information for manpower planning and sustainable agricultural development.

References

1. Adhiguru, P., Birthal, P.S., & Ganesh Kumar, B. (2009). Strengthening Pluralistic Agricultural Information Delivery Systems in India. Agricultural Economics Research Review, 22, January-June, 71-79.

2. Agrawal, T. (2011). Returns to Education in India: Some Evidence, IGIDR. Retrieved from http://www.igidr.ac.in/pdf/publication/WP-2011-017.pdf

3. Anderson, J. R. (2007). Background Paper for the World Development Report 2008: Agricultural Advisory Services, Agriculture and Rural Development Department, The World Bank, Washington DC, USA.

4. Babu, S.C., & Joshi, P. K. (2014). Knowledge-Driven Agricultural Development: Policy Options for revitalizing Extension and Advisory Services in India. Inter Conference Symposium of International Association of Agricultural Economists (IAAE) on Revisiting Agriculture Policies in the light of Globalisation Experience: The Indian Context. India. October, 12-13.

5. Babu, S.C., Glendenning, C.J., Asenso-Okyere, K. & Govindarajan, S.K. (2012). Farmers' Information Needs and Search Behaviours — A Case Study in Tamil Nadu, India. IFPRI Discussion Paper 01165, International Food Policy Research Institute. Washington DC, USA.

6. Becker, Gary S. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. University of Chicago Press, Chicago.

7. Birthal, P.S., Joshi, P.K., Chauhan, S., & Singh, H. (2008). Can Horticulture Revitalise Agricultural Growth? Indian Journal of Agricultural Economics, 63(3), July-September.

8. Duraisamy, P. (2002). Changes in Returns to Education in India, 1983–94: By Gender, Age-Cohort and Location. Economics of Education Review, 21(6), 609-22.

9. Dutta, P. V. (2006). Returns to Education: New Evidence for India, 1983– 1999. Education Economics. 14(4), 431-51.

10. Halvorsen, R. & Raymond, P. (1980). The Interpretation of Dummy

Variables in Semi-logarithmic Equations. American Economic Review, 70(3), 474-75.

11. Kingdon, G. G., & Theopold, N. (2008). Do Returns to Education Matter to Schooling Participation? Evidence from India. 329-350. Retrieved from https://doi.org/10.1080/09645290802312453.
12. Madheswaran, S., & Attewell, P. (2007). Caste Discrimination in the Indian Urban Labour Market: Evidence from the National Sample Survey. Economic and Political Weekly, 42(41), 46-53.
13. Mincer, J. (1974). Schooling, Experience and Earnings. New York. National Bureau of Economic Research.
14. Psacharopoulos, G. (1981). Returns to Education: An Updated International Comparison. Comparative Education, 17(3), 321-341. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/3098688.
15. Psacharopoulos, G. (1994). Returns to investment in education: A global update. World Development, 22(9), 1325-1343.
16. Sulaiman, R., & Van den Ban, A. W. (2000). Agricultural Extension in India – The Next Step, ICAR Policy Brief (9).

Pancha kanya in Indian literature: in the perspective of contemporary Indian society

Bapi Mondal

Abstract

The five kanya or the five women in ancient Indian literature are too prominent for their quality as well as for their virginity. The main two epics in Indian literature Ramayana and the Mahabharata carried out these five characters, they are Ahalya,Tara, Mandodori, Kunti and Draupadi. Among these five first three characters belong to Ramayana and the rest two belong to Mahabharata. Since the Mahabharata and Ramayana period to present time we respect them. The concept of sati or virgin determines who never ploughed and who had no physical relation. Here we express the meaning of virgin little bit bigger sense, a girl who never had any intercourse except her husband. This word virgin carries the sense of infinite devotion to the husband.

But, the problem I deal with that, for which type of quality they were called as virgin and is it acceptable in the present society? In this paper I want to discuss that, what kind of good quality they had by which they are famous. In this particular session I shall concentrate on feminism's perspective. From the feminism point of view I shall discuss whether these

five virgin's lifestyle is acceptable or not for our present life. The whole content will be discussed by two sections in this paper. In the first section I would like to discuss from these two epic's point of view and in the second section it will be discussed from the feminism point of view.

Introduction

The abolition of sati by the British in 1829 was a founding moment in the history of women in 19th century. The lawgiving prohibition of sati was the climax of a debate during which 8,134 instances of sati had been recorded mainly. Though, it was not exclusively, among the upper Hindu caste, with a high concentration-63% in the area around Calcutta. After the Bengal renaissance the abolition of widow was stopped. But in the ancient time of India, specially in Indian scriptures like Ramayana and Mahabharata sati was a central point for discussing about the chastity. The modern concept of sati was come from ancient period of Indian literature. In these two famous epic we found five women are known as Pancha Kanya. These five Kanya are famous as virgin. Virgin is a person who has not had sexual intercourse ever. But for us the sense of virgin is little bit brief. Here we explain the meaning of virgin, a person who never had any intercourse without her husband. So, virgin is known to female those who never had in a relationship without her husband. It is the relation of love among husband and wife. A relation which never ends, even after the death of husband. It is a pure love relation where woman has to sacrifice herself by burn her own body on the pyre of husband. Burning women's body is called sati, a custom for testing the chastity of women. Sati was a historical Hindu practice where widow sacrificed herself by sitting or lying on her husband's funeral pyre. Here the five Kanyas or better to say Pancha sati were tested whether they were chaste or not.

I shall explain the life of Pancha Kanya and their chastity in this paper. And I would like to explain why they are famous to us. The other thing is, I shall try to convey an opinion as a feminist would thinks.

First section

A famous Sanskrit shloka runs as —

Ahalya, draupadi, kunti,Tara, mandodari tatha,

Panchakanya svaranityam mahapataka nashaka.

"All the dangerous sins were destroyed by these five virgin Ahalya, Draupadi, Kunti, Mandodari, and Tara in that particular time."[1]

In the context of sati or virgin in Indian literature we can see many other women excluding these Pancha kanya those who were mostly powerful as some of them we can say the name of Sita, Sati, Savitri, Shakuntala etc. Really to say, not only they were powerful but also were very great, because of that still now they are living in our mind. Each of the character is a sign of love, a true love for others, not for her-self; and a sign of renunciation where some of them had not stopped to kill own self. They had have lot of sacrifices for the sake of society and for the sake of kingdom, especially when we shall look at Sita and Sati those who accepted their death by burning herself in the fire.

And, the life of Pancha kanya was also full of austerity, which we shall discuss now—

Ahalya— Ahalya is known as Ahilya the wife of sage Goutama and the most beautiful women in the universe was created by Brahma. Ahalya itself has two meaning one is flawless or we can say to whom we can't blame and the other who is not ploughed. Ahalya was care by Goutama until her gaining of puberty, and finally Goutama made her spouse for his entire life. But one day the king of God Indra called her to infatuate with disguise his real look when Goutama was away. And, Ahalya the mother of Shatananda because of chaste undoubtedly was agree with Indra, but in this mean time the sage Goutama came back and cursed both of them. But, Ahalya requested to Goutama that she was totally unaware about Indra's cheating then she became a stone until it will be touched of Rama's footstep.

So, serially the first kanya Ahalya's nobility, extraordinary beauty, chaste is incredible. And she had been true to her independent nature, fulfilling her womanhood in a manner that she found appropriate, although unable to assert herself finally. But she was not failed, absolutely she was succeed in her battle.

Tara— chronologically the second kanya Tara the wife of Bali in Ramayana was too much powerful woman. She advised her husband not fight to his brother Sugriva for the alliance of Rama, but Bali did not heed to her and then he died. But the time of death Bali realized that she is very powerful, due to that he commanded to Sugriva to follow her all advices. Because of having an owner of exceptional wisdom, self-assurance, foresight and chaste Tara was able to curse to lord Rama for killing her husband. However, after that Tara married to Sugriva and became supporter of Rama. She not only consolidate her own position but also she rescued her son from ruin. So, she did performs many rolls in one life.

Mandodari— Mandodari the queen of lanka was a beloved mother and along with the supporter of truth. Ravana the king of lanka has three sons, according to some Ramayana adaptations, Mandodari is also the mother of Sita, who is infamously kidnapped by Ravana. Because of truthfulness she said Ravana return Sita to Rama but, Ravana never concentrated on Mandodari. And on the other hand due to chaste she tolerated many pains the loss of sons again and again when she lost her all sons. The arrogance of Ravana, Mandodari lost her all sons and she could go away form lanka but only because of chaste she did not do that. And, after death of Ravana she got married to Vibhishana in Rama's advice. But, Tara and Mandodari never be described shadows of such personalities as Bali and Ravana. So, she determines that being a wife of a demon someone can be the follower of truth and can have tolerance.

Kunti— "The wife of Pandu the king of Hastinapur and mother of three eldest Pandavas Kunti was the daughter of Shurasena and was

adopted by the childless Kuntibhoja, king of Kunti kingdom."[2] Before marriageby Durvasa sage's boon she got a child a child with an inter relation of surya deva. After marriage with impotent Pandu she bears three sons and she shared her nuptial with Madri the second wife of Pandu and mother of Nakul and Shadev. As a step mother of Nakul and Sahdeva she was great because never she behaved badly to both of them. "When Arjuna wins Draupadi, Kunti instructs the brothers to share the prize."[3] It was a transition in Draupadi's life as well as in all Pandava's life. As we see Kunti and her five children driven out from her own kingdom but by her intelligent she was able to get her kingdom after Kurukshetra fight.

"Kunti displays admirable self-control, strength of mind and independence of spirit in refusing to submit herself to further relationships with other 'gods' to give Pandu more sons."[4] She is remarkably noble mother as well as a good master of Pandava because of which she is famous as a virgin in Indian literature.

Draupadi— The world's most famous fight Kurukshetra was arranged mainly because of harassment to the powerful lady Draupadi. Born from fire- sacrifice of king Panchal, Draupadi promised to destroy Drona and Kauravas. The middle Pandava Arjuna win her in a swayamvara and married her, the tragedy was started when Arjuna came to home. Because Kunti ordered them to share to Kunti between each other, but because of chaste she did not refused the order. Then the other tragedy is she was sold to Kaurava as a wealth in the disc (pasa) playing. But she was able to tolerate all kind of sorrow, she never failed because of all these qualities still now she is living in our mind smoothly.

Section - 2

On the above section we have discussed all these nobilities in Pancha kanya's life but now we need to clarify how contemporary Indian society will take these nobilities. Mainly it is that what feminists will say about

these virgins. “The Pancha Kanyas may be taken to be representative of the essential femininity of the Indian woman – compassionate, tender and acquiescent on the one hand, while being strong and self-assured on the other hand, able to take practical and independent decisions in a constantly changing, turbulent society. This accounts for the sustained appeal of the Kanyas to the twenty-first century woman.”[55]

But the feminism’s most important principle as we know that everybody has Why women will be suffer, why they have to be deprive from their own right. In this context of feminism it can be said that, all the virgins suffered because of that man ruled society where all decisions were taken by male. There was no queen who was ruling her kingdom but all of them were king. The Ramayana and Mahabharata both were written by men Valmiki and Vyasadeva, but no one is female writer. In the context of Draupadi who’s entire married life was full of suffering. She was won by Arjuna or we can say she was donated by her father and was sold as a wealth to Kaurava but, why one man is not being sold as a wealth, and why man is not being donated by his father? From the feminism’s point of view this question can be raised. For Kunti, she is blamed still now for Karna’s birth, but who is responsible for that, can be raised another relevant question.

Conclusion

In the conclusion I would like to say that everything has good and bad both, It is right that no one among these five kanya were very happy and as well as free in the society. Any how everyone suffered in their life and deprived from their happiness. But we cannot say that there was no love between Arjuna and Draupadi, and can’t say that Ravana did not love to Mandodari. As our life is changing then we also need to be changed as required. We need to have sacrifice in our life from man and women both side then our life can be happy.

Reference

1. Bhattacharya Pradip. Pancha kanya: women of substance. Journal of south Asian literature, Vol. 35, No. 1/2, Miscellany (2000). p 13.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Panchakanya
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Panchakanya
4. http://www.boloji.com/index.cfm?md=Content&sd=rticles&Article ID= 7381
5. Niyogi Ralla Ghuha. The "magic suggestiveness" of pancha kanya. 24.04.2010.

Towards Achieving Open Defecation Free Status in Bihar: Observations from the Field

Rajeev K. Kumar

Abhijit Ghosh

Abstract

Lohiya Swachh Bihar Abhiyan (LSBA) is a combination of Swachh Bharat Mission-Gramin (SBM-G) - a centrally sponsored scheme and Lohiya Swachh Yojana (LSY) - a state sponsored scheme, which aimed to make the state of Bihar Open Defecation Free (ODF) by 2nd October 2019. This study is part of a larger survey on ODF, but for this paper the data for six districts namely Gopalganj, Supaul, East Champaran, Vaishali, Bhojpur and Purnea are analyzed. In light of the findings of the present study, it could be concluded that the ongoing sanitation programme has a huge impact on the sanitation scenario of the state. Prior to the launch of LSBA and SBM (G) in the state, the sanitation status of the state, especially in rural areas, was very poor. A lot has been done by the government so far, but still, it has to go a long way to achieve the total sanitation in the state. The government has been able to construct a number of latrines in mission mode, but it still has not covered the entire population.

Key words: Open defecation Free (ODF), Lohiya Swachh Bihar Abhiyan, Sanitation, Health, Swachh Bharat Mission

1. Introduction[2]

Lohiya Swachh Bihar Abhiyan (LSBA) is a combination of Swachh Bharat Mission-Gramin (SBM-G)-a centrally sponsored scheme and Lohiya Swachh Yojana (LSY) - a state sponsored scheme, which aimed to make the state of Bihar Open Defecation Free (ODF) by 2nd October 2019. LSBA aims to achieve ODF by improving the cleanliness of rural areas with special focus on Behaviour Change Communication (BCC) among the community members. The objective is to make 8404 Gram Panchayat (GPs) of 534 blocks in 38 districts of rural Bihar ODF by constructing a total of 1.6 crores Individual Household Latrines (IHHL). The implementation responsibility is with the Rural Development Department, which further delegated the task to Bihar Rural Livelihoods Promotion Society (BRLPS).

The sanitation situation of Bihar is a matter of concern, as it is the fourth lowest (73.17 percent) ODF coverage of the country (source: http://sbm.gov.in/sbmdashboard/odf.aspx). The state has been struggling to improve the sanitation indicators for years but so far it has not been able to achieve the target. As the state is divided into various geographical regions and heterogeneous socio-cultural populations, the challenges are compounded to achieve the ODF status. The suitability, sustainability and usage pattern of toilets need to be assessed. Even after achieving the ODF status, the post experiences show that attainment of one-time ODF status may not be sustained unless stopping open defecation is adopted as a social norm by every member of the community.

Health is considered as one of the most important indicators of development. The health of an individual is mainly dependent upon two factors, i.e. heredity and environment, which also includes social and cultural environment along with physical environment (Kumar 2019). According to Basu (1992), health is a function- not only of medical care

but of the overall integrated development of society i.e. cultural, economic, education, social and political. Each of these aspects has a deep influence on health, which in turn influences all these aspects.

In India, the open defecation rate is still very high. But at the international level, many countries are making lots of improvements in cleanliness and sanitation and eliminating open defecation. In rural sub-Saharan Africa, where people are poorer, only about 35 percent population defecate in open. Even in rural Bangladesh, only five percent of people defecate in open, and in rural China, two percent of people defecate in the open (Coffey et. al 2015). In India, access to toilets is still a huge problem, especially in rural India. Census 2011 found that 70 percent of rural households do not have a toilet in their houses in Bihar. At all India level, 53.1 percent of households have no latrine facility. Open defecation is not driven by poor economic conditions. They found that open defecation is common even in those households who own assets, such as television, mobiles, etc. Open defecation is not a result of a lack of access to water also. Every third household that has water in the premises, its members also defecate in the open. In India, inexpensive pit toilets are relatively rare, instead people either use an expensive toilet with a large tank or they defecate in open (Coffey and Spears, 2018). Ghosh and Mukesh (2019) argue that in India, open defecation is not compatible with the economic performance of the country.

Rationale of the Study

There are many secondary data reported on Integrated Management Information System (IMIS) on toilets construction, but there is little data available on how those are being used - hygienic practices, availability of water and programme management issues that may contribute a lot to the sustainability of ODF. Therefore, there is a need for capturing ground reality through primary survey, and the same needs to be analyzed to gain

insights into the factors creating bottlenecks in attaining the goal of ODF status and its sustainability.

Objectives of the Study

- To know the toilet coverage in the state, especially after the inititave of the state government to make the state ODF, and
- To identify the current bottlenecks in the ODF implementation and determining how to address those bottlenecks through intervention.

2. Methodology & Study Area

The main focus of the survey was to understand the coverage rate of the toilets. For this, a purposive random sampling procedure is used to determine the total number of households. From each district, three blocks have been selected and from each block, four villages have been selected randomly. As a whole, 72 villages from 18 blocks of six districts have been covered. For the selection of the households, every fifth household of the village has been selected. In this way, a total of 1536 households were surveyed from these six districts. Of this, 893 households were with toilets and remaining 643 households were without toilets. For the survey, the year 2014 has been chosen as a benchmark year for being the year when Swachh Bharat Mission was launched by the Central Government. The methodological approach adopted for the data collection is mixed in nature (both quantitative and qualitative data). Separate study tools were developed for the collection of quantitative and qualitative data. The study is mainly focused on the sanitation coverage and implementation of the LSBA programme, being run by the government.

Six districts namely Gopalganj, Supaul, East Champaran, Vaishali, Bhojpur, and Purnea have been surveyed. The first district Gopalganj consists of two sub-divisions and 14 blocks. The total

population is 256012, and the sex ratio is 1021 which is the highest in the state. The literacy rate of the district is 65.47 percent. As per census 2011, only 20 percent of households in this district have toilets. Four villages from each of the three blocks (Thawe, Phulwaria and Manjha) are selected for the survey. The second district under the study is Supaul, which has four sub-divisions and 11 blocks. The total population of this district is 2229076. The literacy rate is 57.67 percent and the sex ratio is 929. Three blocks namely Supaul, Nirmali and Saraigarh Bhaptiyahi are selected. The third district, East Champaran comprises 27 blocks and 1270 villages. The total population of the district is 5099371. The literacy rate is 55.79 percent and the sex ratio is 902. There are 18.2 percent of households in this district having toilets as per census 2011. Three blocks of the district namely Narkatia, Paharpur and Kalyanpur are selected for the study.

Vaishali, the fourth district is divided into three subdivisions, 16 blocks, 290 Gram Panchyat and 1572 villages. The total population of the district is 3495021. The literacy rate is 66.6 percent and sex ratio is 895. The blocks selected are Bhagwanpur, Patepur and Bidupur. Bhojpur has three sub-divisions and 14 blocks, consisting of 228 Gram Panchayats and 1244 villages. The total population of the district is 2728407 with a sex ratio of 907. The total literacy rate of the district is 70.47 percent which is the third highest in the state. Three blocks selected for the survey are Koilwar, Arrah and Charpokhari. The last district selected under the survey is Purnea. The district has four sub-divisions and 14 blocks, 246 GP and 1450 villages. The district had a total population of 3264619 with a 921 sex ratio. The total literacy rate of the district is only 51.08 percent. Three blocks selected for the survey are Bhawanipur, Srinagar and Baisa.

Sample Characteristics

Following tables from 1 to 3 present the sample characteristics of respondents in terms of caste, religion, occupation, educational level, etc.

It is found above 88.74 percent sample households follow the Hindu religion and the rest comes from the Muslim religion. The maximum Muslim households were found in Purnea (36.19 percent) and Supaul (20 percent) districts and minimum in Vaishali (0.72 percent) and Bhojpur (1.35 percent) districts. About 16.67 percent belongs to General Caste, 3.84 percent ST, 18.62 percent comes from SC and rest belongs to either OBC or EBC (Table 1).

The most striking feature of the sample respondents is a low level of literacy rate, i.e., more than 47 percent of respondents is illiterate. The primary educated is 14.87 percent, while graduation and above is only 4.17 percent. Approximately 47.40 percent of respondents are daily wage earners and 35.94 percent are farmers. The monthly income for 50.45 percent HH ranges from Rs. 5,000 to 10,000 and for more than 29 percent of households, it is less than Rs. 5000 (Table 2).

More than 48 percent of households of the sample belong to the BPL category. Overwhelmingly 99.54 percent of sample households have their own houses, but only 23.18 percent of houses are pucca. The important feature of sample families is that 54.5 percent are nuclear; while 45.90 percent are joint families. The majority of respondents (87.5 percent) own and use mobiles. At the same time, it also came out during the survey that only a few households own a TV set and read daily newspapers (Table 3).

3. Results and Discussions

It may be observed from the following Fig.1 that only 58 percent of the surveyed households are having toilets. District wise data shows maximum availability of toilets in houses in Supaul (68.5 percent) and Gopalganj districts (67 percent); while minimum availability in Bhojpur (49.3 percent) and Purnea (49.8 percent) districts. It has also come out in the survey that most of the households without toilets belong to weaker section of the society.

Table: 1 Religion and caste wise distribution of respondents in Sample Districts (%): Round-II

	Gopalganj	Supaul	E. Champaran	Vaishali	Bhojpur	Purnea	Total
Religious status							
Hindu	85.56	80	97.96	99.27	98.65	63.81	88.74
Muslim	14.44	20	2.03	0.72	1.35	36.19	11.26
Caste groups							
General	25.67	12.5	9.92	20.29	18.38	18.29	16.67
OBC	36.36	41	31.3	41.3	43.5	51.75	40.17
EBC	14.44	18	43.51	8.69	8.52	15.96	20.7
SC	17.65	28.5	10.18	27.89	28.7	5.84	18.62
ST	5.88	0	5.09	1.81	0.9	8.17	3.84

Table: 2 Educational attainment, occupation & monthly income in sample districts (%): Round-II

Educational level	**Gopalganj**	**Supaul**	**E. Champaran**	**Vaishali**	**Bhojpur**	**Purnea**	**Total**
Illiterate	37.97	56.5	52.92	43.11	31.84	57.58	47.53
Primary	12.3	12	13.49	19.57	17.94	13.22	14.84
Middle	18.18	12.5	17.03	13.77	15.25	12.06	14.91
Matric	16.04	6	9.66	11.23	18.39	9.72	11.52
Inter	10.16	9.5	4.33	6.15	8.97	4.66	6.77
Graduation and above	4.81	2	2.55	6.16	7.63	2.73	4.17
Main occupation							
Wage	39.57	50.5	203	40.58	43.5	54.86	47.4
Farmer	42.25	31	154	30.8	39.01	33.07	35.94
Business	6.42	8.5	11	8.33	2.24	3.89	5.08
Govt. Job	2.67	0.5	6	5.43	3.59	0.39	2.34
Pvt. Job	9.09	9.5	19	14.86	11.66	7.78	9.24

Educational level	Gopalganj	Supaul	E. Champaran	Vaishali	Bhojpur	Purnea	Total
Monthly Income of HHs							
Below 5000	27.27	30	36.89	19.56	31.88	26.07	29.16
5001 to 10000	52.94	51	49.61	54.34	50.67	45.13	50.45
10001 to 15000	13.36	14	9.92	17.02	16.14	26.07	15.75
15001 to 20000	3.2	2.5	1.27	3.62	0	1.16	1.88
Above 20001	3.2	2.5	2.29	5.4	1.34	1.55	2.73

Table: 3 Ration cards, house ownership, type of family and ownership of mobile by respondents (%)

Availability of ration cards	Gopalganj	Supaul	E. Champaran	Vaishali	Bhojpur	Purnea	Total
APL	9.62	9.5	1.78	7.24	8.52	13.23	7.62
BPL	36.36	56	55.72	51.81	39.91	42.02	48.11
Antyodaya	2.67	2.5	5.34	5.07	2.24	6.23	4.3
No Card	38.5	20.5	17.3	23.55	29.14	14.01	22.59

Availability of ration cards	Gopalganj	Supaul	E. Champaran	Vaishali	Bhojpur	Purnea	Total
Khad Surksha	5.88	5.5	5.59	8.69	4.48	19.07	8.27
APL &Khadh Surksha	2.13	0.5	1.01	0	2.24	0	0.91
BPL &Khadh Surksha	3.74	5.5	11.95	3.62	11.21	5.06	7.36
Types of houses							
Straw & reeds Hut	9.63	41	31.55	18.48	14.8	33.85	25.72
Kacha	20.32	16	17.56	11.23	18.38	34.24	19.47
Semi-Pucca	24.6	29.5	28.24	44.57	38.57	23.74	31.64
Pucca	45.45	13.5	22.65	25.72	28.25	8.17	23.18
Types family							
Nuclear	44.92	62	46.06	57.61	44.84	70.82	54.05
Join Family	55.08	37.5	53.94	42.39	55.16	29.18	45.9
Mobile ownership status							
Yes	92.51	87	84.98	88.04	88.78	86.38	87.5
No	7.48	13	15.01	11.95	11.21	13.61	12.5

Figure: 1 District wise availability of toilet in HH (%)

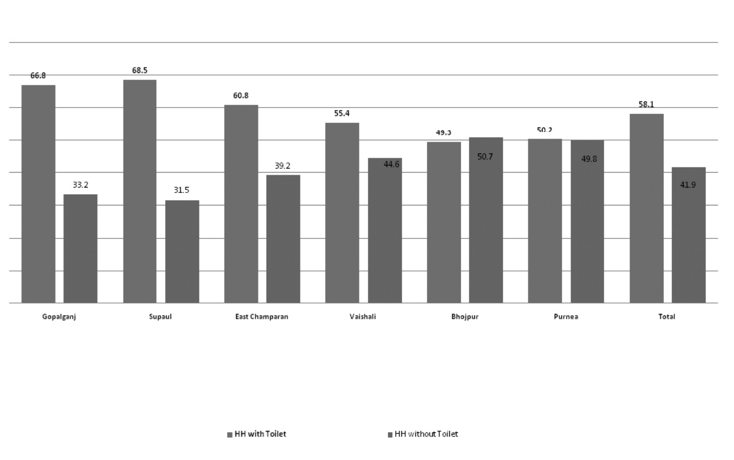

Type of Toilets and Technical Specification

This section shows types of toilets and their different dimensions, including technical specifications. Two pit stands and septic tanks are dominant categories of toilets, constituting together around 74 percent of toilets. There is no household with Eco-san and Bio-digester toilets. The distance between the two pits is one meter (29.34 percent) or less than one meter. However, the depth of the pits is almost equal among different categories of toilets. More than 48 percent of toilets in Supaul and Vaishali districts have a depth of more than two meters. The general pan is mostly (76.26 percent) used in the toilet. The standard norm of the distance between toilets and source of drinking water has largely been ignored during the construction of toilets. The distance recorded is less than 10 meters for around 64 percent of households. Among districts, East Champaran, Gopalganj and Bhojpur recorded maximum households (above 70 percent) with toilets breaching this norm. The most cited reasons for less distance are attributed to the lack of land available to the households (Table 4).

Table 4: District wise types of toilets and technical specifications (%)

Specifications	**Gopalganj**	**Supaul**	**E. Champaran**	**Vaishali**	**Bhojpur**	**Purnea**	**Total**
One Pit Stand	14.40	24.82	16.32	30.07	25.45	48.84	25.53
Two Pit Stand	53.60	13.14	53.56	22.88	30.00	43.41	37.74
Septic Tank	32.00	62.04	30.13	47.06	44.55	7.75	36.73
Type of Pan							
Rural Pan	34.40	11.68	32.22	16.99	29.09	11.63	23.40
General Pan	65.60	88.32	67.78	81.70	70.00	88.37	76.26
Western Pan	0.00	0.00	0.00	1.31	0.91	0.00	0.34
Distance between two pits							
1 mtr.	49.60	5.84	43.93	12.42	22.73	33.33	29.34
2 mtr.	0.80	0.00	0.84	0.00	0.00	0.78	0.45
Less than 1 mtr.	3.20	7.30	8.79	10.46	7.27	9.30	7.95
NA*	46.40	86.86	46.77	77.12	70.00	56.59	62.26

Specifications	Gopalganj	Supaul	E. Champaran	Vaishali	Bhojpur	Purnea	Total
Depth of the pits							
1 mtr.	39.20	7.30	39.20	11.76	28.18	42.64	32.03
2 mtr.	28.80	38.69	28.80	21.57	47.27	21.71	30.12
More than 2 mtr.	27.20	49.64	27.20	48.37	20.00	35.66	32.14
Don't know	4.80	4.38	4.80	18.30	4.55	0.00	5.71
Distance between toilets and source of drinking water							
Less than 10 mtr.	71.20	57.66	74.06	50.33	76.36	48.84	63.72
10 to 15 mtr.	20.80	28.47	12.97	35.95	14.55	41.09	24.64
More than 15 mtr.	8.00	13.87	12.97	13.73	9.09	10.08	11.65
More than 15 mtr.	9.60	18.25	13.81	21.57	11.82	24.81	16.57

Two major limitations are clearly revealed. First, most of the toilets do not have any tap connected with the tank inside and outside the toilets. Second, the availability of wash basin was not recorded. However, this is not very surprising given the poor economic conditions of the households and scarcity of the land.

Construction and Functional Status of Toilets

Regarding the status of construction and functional status of existing toilets are also inquired from the respondents. It can be obseserved from Table 5 that the households having toilets are built recently with the assistance of the Government. More than 41 percent toilets have been constructed under the LSBA programme. Other than this, people also constructed the toilets on their own (27.10 percent), maximum in Gopalganj (36.8 percent) and minimum in Purnea (9.3 percent). Some of the respondents (28.78 percent) are also not aware of this. Among the districts, Purnea is the highest (58.14 percent) in the construction of toilets under the LSBA; while the minimum in Vaishali (33.3 percent) and East Champaran (38 percent).

Table 5: District wise programmes under which toilets are constructed (%)

Districts	LSBA	SBM	Indira Awas	Self	Don't Know
Gopalganj	41.60	0.00	0.00	36.80	21.60
Supaul	40.15	4.37	0.00	15.33	40.15
East Champaran	38.08	0.42	2.09	35.15	24.26
Vaishali	33.33	3.27	0.00	23.53	39.87
Bhojpur	46.36	0.91	0.00	39.09	13.64
Purnea	58.14	0.78	0.00	9.30	31.78
Total	41.99	1.57	0.56	27.10	28.78

Table 6: District wise source of information about the construction of toilets (%)

Districts	**Gopalganj**	**Supaul**	**E. Champaran**	**Vaishali**	**Bhojpur**	**Purnea**	**Total**
PRI Representative	70.40	85.40	88.28	75.16	73.64	89.92	81.52
Swachagrahi	3.20	4.38	1.67	10.46	0.00	0.00	3.36
ASHA/ANM	1.60	2.19	0.84	0.65	4.55	0.00	1.46
Govt. Officers	16.00	8.03	5.02	12.42	7.27	10.08	9.29
SHG members	3.20	0.00	0.42	1.31	13.64	0.00	2.46
Multiple Source	5.60	0.00	3.77	0.00	0.91	0.00	1.9

Table 7: District wise reason for not receiving toilet facility (%)

Reason for not constructing toilets	**Gopalganj**	**Supaul**	**E.Champaran**	**Vaishali**	**Bhojpur**	**Purnea**	**Total**
Not received govt. assistance	9.67	6.34	25.32	8.13	16.81	12.50	14.61
Lack of land	17.74	7.93	7.79	4.87	3.54	3.12	6.53
Poor economic condition	51.61	74.60	48.05	78.86	45.13	81.25	62.98
Don't want to construct	0.00	4.76	0.00	0.81	1.77	0.00	0.93
Multiple reasons	20.96	6.34	18.83	7.31	32.74	3.12	14.93
Reason for not receiving government assistance							
Lack of awareness	6.45	19.04	18.18	14.63	11.50	17.96	15.24
Lack of departmental support	43.54	19.04	35.06	35.77	26.54	46.87	35.30
Lack of support from representative	11.29	52.38	14.93	43.08	6.19	27.34	24.57
Amount received after construction	4.83	4.76	5.19	5.69	9.73	1.56	5.28
Lack of land	9.67	3.17	1.94	0.00	0.00	0.00	1.71
Multiple reasons	24.19	1.58	24.67	0.81	46.01	6.25	17.88

Panchayat representatives have been playing an important role in providing information to the villages regarding the scheme of toilets constructions. During the survey, respondents express their dissatisfaction over the delay in receiving financial assistance. This also discourages households to take initiative for the construction of the toilets. Most of the respondents were aware of the amount to be received for the construction of a single unit from the government. However, more than half of respondents still have not received financial assistance even after the construction of toilets (Table 6).

Non- Availability of Toilet

The households without toilets (41.86 percent) are also included in the sample. The respondents from the household without the toilet facility were also asked from the respondents. Almost two-third (63 percent) respondents cited poor economic conditions for not having toilets. Not receiving governmentsupport, lack of land are also some other reasons behind this. However, all these reasons are not mutually exclusive. Among surveyed districts, maximum respondents (81.25 percent) from Purnea have cited poor economic condition and more than 17 percent respondents in Gopalganj district have cited lack of land. In East Champaran district, 25.32 percent respondents cited reasons for not constructing toilets as non-receipt of government assistance (Table 7).

Monitoring and IEC Mechanism

At the beginning of the launch of LSBA programme in the state, the monitoring committees were constituted at every level. The main role of these committees is to monitor the open defecation in the villages and panchayats and also to motivate people to use toilets. This also facilitates the villagers in getting the benefits of LSBA. However, it has been found

from the survey and discussions that monitoring committees are not much active now, as only 19.44 percent of respondents report that monitoring committees are functional in their villages. However, there are large variations recorded among the surveyed districts with the highest (45.45 percent) in East Champaran district and the lowest (6.50 percent) in Vaishali district (Table 8).

Similarly, the status of the information, education and communication (IEC) mechanism is also not very satisfactory in the surveyed districts. Some of the respondents informed that some IEC activities, such as meeting, nukkad natak, wall painting, miking, etc., are being carried out in the villages from time to time, but it has lost pace. It was very frequent in the beginning. For the sustained use of toilets, a major change in behaviour of the people is required. This can take a longer period of time. Therefore the IEC activities should be a continuous process.

Table 8: District wise effectiveness of monitoring committee (%)

Districts	Yes	No
Gopalganj	14.52	85.48
Supaul	14.29	85.71
East Champaran	45.45	54.55
Vaishali	6.50	93.50
Bhojpur	18.58	81.42
Purnea	6.25	93.75
Total	19.44	80.56

4. Conclusion and Suggestions

LSBA aimed to make the state of Bihar Open Defecation Free (ODF) by 2nd October 2019 by constructing a total of 1.6 crores Individual Household

Latrines (IHHL). The state has been struggling to improve the sanitation indicators for years but so far it has not been able to achieve the target. As the state is divided into various geographical regions and heterogeneous socio-cultural populations, the challenges are still compounded to achieve the ODF status. Even after achieving the ODF status, the post experiences show that attainment of one-time ODF status may not be sustained unless it is adopted as a social norm by every member of the community.

In light of the findings of the present study, it could be concluded that the ongoing sanitation programme of the government has a huge impact on the sanitation scenario of the state. Prior to the launch of LSBA and SBM (G) in the state, the sanitation status of the state, especially in rural areas, was very poor. A lot has been done by the government so far, but still, it has to go a long way to achieve the total sanitation in the state. The government has been able to construct a number of latrines in mission mode, but it still has not covered the entire population. Although some of the districts have been declared as ODF, the ground reality is quite different. All the households of the ODF district are not covered by IHHL also.

In general, the sanitation status has improved hugely after the launch of the sanitation programme (LSBA) in the state, but somehow it has also lost its vigour in course of its implementation. This is also reflected in the fact that most of the village level monitoring committees are now dormant and also lack IEC and BCC activities in the villages. The government should also take proper care of the sanitation status of the public institutions, such as schools and AWCs.

References

❒ Basu, S. K. (1992). Health and culture among the underprivileged groups in India, In Alok Mukhopadhyay (Ed.), State of India's Health (pp. 175-186). Delhi: Voluntary Health Association of India.

- Coffey, Diane, Gupta, Aashish, Hathi, Payal, Spears, Dean,Srivastav, Nikhil and Vyas, Sangita(2015), Working paper: Culture and the Health of Transition: Understanding Sanitation Behaviour in Rural north India. (file:///E:/LSBA%20Article/Coffey-et-al-2015-Working-Paper-1.pdf).
- Coffey, Diane, Gupta, Aashish, Hathi, Payal, Spears, Dean,Srivastav, Nikhil and Vyas, Sangita (2016), Working paper: Understanding open defecation in rural India: Untouchability, pollution, and latrine pits. (file:///E:/LSBA%20Article/coffey-et-al-2016-working-paper.pdf).
- Coffey, Diane, Gupta, Aashish, Hathi, Payal, Spears, Dean Srivastav, Nikhil and Vyas, Sangita (2017), Understanding Open Defecation in Rural India: Untouchability, Pollution, and Latrine Pits. Economic & Political Weekly, January 7, 2017 vol. no 1, pp. 59-66.
- Coffey, Diane and Spears, Dean (2018). Open Defecation in Rural India, 2015–16: Levels and Trends in NFHS–4. Economic & Political Weekly, March 3, 2018 vol. no. 9 pp. 10-13.
- Esrey, S. A., Potash, J.B., Roberts, L. and Shiff, C. (1991), Effects of improved water supply and sanitation on ascariasis, diarrhoea, dracunculiasis, hookworm infection, schistosomiasis, and trachoma.
- Fewtrell, Lorna andColford, John M. Jr. (2004), Water, Sanitation and Hygiene: Interventions and Diarrhoes. A Systematic Review and Meta-analysis.
- Geruso&Spears (2014).Sanitation and health externalities: resolving the Muslim mortality paradox..
- Ghosh, Abhijit and Mukesh (2019), Factors behind access to Latrine in India: An Application of Multinomial Logistic Regression Model. ArthaVijnana Vol. LXI, No. 2, June 2019, pp. 189-203.
- Hathi, Payal, Coffey, Daine, Khalid, Nazar, Khurana, Nidhi and Thorat, Amit (2018). Experiences and Perceptions of Discrimination among Dalits and Muslims. Economic & Political Weekly, October. 20, 2018 vol.42, pp. 14-17.

❒ Kumar, Rajeev K. (2019), Status of public health services: availability and utilization in Bihar. Man & Development June 2019, pp. 89-102.

❒ Mondal and Kanwal (2006), Working paper: Addressing Key Issues in the Light of Structural Adjustment Programme (SAP) in Health and Family Welfare Sector in India.).

Footnotes

1 **Acknowledgement**

This article is based on the project study 'Sanitation Situation in Bihar Concurrent Monitoring of Lohiya Swachh Bihar Abhiyan/SBM (G)', conducted by A N Sinha Institute of Social Studies, Patna sponssored by UNICEF. Sincere acknowledgment is expressed towards UNICEF for assigning this study to the Institute. The authors are also the Project Directors.

2 **Declaration**

The views expressed in this article are of the authors. None of the organization, sponsoring or implementing partner will be held responsible.

THE PRISM
Vol. 13   October, 2021

Journal of Mahatma Gandhi College
Lalpur, Daldali, Purulia- 723 130
West Bengal, India
Contact : + 91 94342 46198
E-mail : prismmgc@gmail.com

Cover Design : Prof. Rahul Chakrabarti

Publisher : Teachers' Council
Mahatma Gandhi College, Lalpur, Purulia

Printed at : Kabitika, Midnapore. Mob : +91 98321 30048

Price : 250.00 $ 12

THE PRISM
2229-7537